বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র; ১৯৯১-২০০৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে এম.ফিল
ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই ২০১৪

আহম্মেদ শরীফ
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র; ১৯৯১-২০০৮

আহম্মেদ শরীফ
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে এম.ফিল
ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জুলাই ২০১৪

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আহম্মেদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে আমার তত্ত্বাবধানে ‘বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র; ১৯৯১-২০০৮’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। আমার বিবেচনায় এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির আমি পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দানের সুপারিশ করছি।

(ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন)
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

আমি ঘোষণা করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে দাখিলকৃত 'বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র; ১৯৯১-২০০৮' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ কোনো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার জন্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে আমি উপস্থাপন করি নি।

আহম্মেদ শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদন

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য 'বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র; ১৯৯১-২০০১' শিরোনামে গবেষণার রূপরেখা জমা দেওয়ার পর ইতিহাস বিভাগ প্রথমে অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও পরে অধ্যাপক মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুনকে তত্ত্বাবধায়ক করে অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক আমার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি আমাকে সাহস দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণার সার্বিক বিষয়ে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার তত্ত্বাবধায়ক আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণার প্রয়োজনে আমার জন্য উন্মুক্ত করেছেন তাঁর দ্বার। তিনি নিজের লেখা বই, সংগৃহিত বই ও প্রবন্ধ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমার জমা দেওয়া অধ্যায়গুলো তিনি যত্ন সহকারে পড়েছেন এবং আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর সদয় সহযোগিতা ও সর্বদা অনুপ্রেরণায় আমার অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গবেষণার শুরু থেকে অভিসন্দর্ভ জমা দানের পূর্ব পর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য সহযোগিতা আমি পেয়েছি। ইতিহাস বিভাগের আমার শিক্ষকমণ্ডলী বিভিন্ন সময় যাঁরা মূল্যবান পরামর্শ ও গবেষণার খোঁজ-খবর নিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছে অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক মোঃ গোলাম সাকলাইন সাকী।

আমার পূর্বের কর্মস্থল নীলফামারী সরকারী কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মোঃ শওকত আলম মীর ও বর্তমান কর্মস্থল সরকারী আজিজুল হক কলেজ বগুড়ার বিভাগীয় সহকর্মীবৃন্দ গবেষণা কর্মটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বদাই উৎসাহিত করেছেন। এ ছাড়া অধ্যাপক মোঃ সেলিম, মুর্শিদা বিন্‌তে রহমান, ইকবাল জাফর খন্দকার ও এটিএম যায়েদ হোসেন তথ্য, পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

এম.ফিলে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ জমা দানের পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা, কর্মচারীর আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বিশেষ করে মোঃ নূরুল ইসলাম ও রতন কুমার দেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণার প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই তাদের সহযোগিতার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

আমার বন্ধুরা সব সময় গবেষণার অগ্রগতির খোঁজ-খবর নিয়ে উৎসাহিত করেছেন আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। গবেষণাকালে অনেকে আমাকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আমার সেই সব শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমি অত্যন্ত ঋণী।

আমার গবেষণার কাজে সব সময় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন মা-বাবা, ভাই-বোন ও মামারা। বিশেষ করে এই গবেষণা কর্মের প্রতিটি পাতায় আমার বাবার ছোঁয়া রয়েছে। তিনি আমার গবেষণার প্রথম পাঠক। আমি আমার পরিবারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আহম্মেদ শরীফ

সূচীপত্র-i

অধ্যায় বিভাজন **পৃষ্ঠা নং**

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ১-২০

দ্বিতীয় অধ্যায় : পটভূমি ২১-৮৪

তৃতীয় অধ্যায় : ১৯৯১ সালের নির্বাচন ও খালেদা জিয়ার সময়কাল ৮৫-১২৩

চতুর্থ অধ্যায় : ১৯৯৬ সালের নির্বাচন এবং শেখ হাসিনার সময়কালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয় ১২৪-১৫৬

পঞ্চম অধ্যায় : ২০০১ সালের নির্বাচন ও খালেদা জিয়ার জোট সরকার ১৫৭-১৯২

উপসংহার : ১৯৩-২০৭

সূচীপত্র-ii

সারণী **পৃষ্ঠা নং**

সারণী-১.১ .... ২৪
সারণী-১.২ .... ২৪
সারণী-১.৩ .... ৩৮
সারণী-১.৪ .... ৪১
সারণী-১.৫ .... ৪২
সারণী-১.৬ .... ৪৬
সারণী-১.৭ .... ৫২
সারণী-১.৮ .... ৫৩
সারণী-১.৯ .... ৬১
সারণী-১.১০ .... ৯৪
সারণী-১.১১ .... ১৩১
সারণী-১.১২ .... ১৪৩
সারণী-১.১৩ .... ১৬০
সারণী-১.১৪ .... ১৬৫-১৬৬
সারণী-১.১৫ .... ১৮৫

গ্রন্থপঞ্জি ২০৮-২১৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

গণতন্ত্রের অন্যতম এক স্তম্ভ নির্বাচন। বস্তুত গণতন্ত্রে উত্তরণে নির্বাচন নামক প্রতিষ্ঠানের কোনো বিকল্প নেই। এর কারণ হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি তথা নেতৃবৃন্দ বাছাইয়ের স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটে এবং সে সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠান সরকারের বৈধতা প্রদান করে ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অবদান রাখে। নির্বাচনকে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হিসেবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে জনগণ তথা ভোটার প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রার্থী বাছাই করে। এ ব্যবস্থায় আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ, কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা হয়। গণতন্ত্রায়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং জন প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এভাবে সমষ্টির ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে সমাজে, রাষ্ট্রে। সে জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মৌলিক উপাদান নির্বাচন।

আমার গবেষণার শিরোনাম– 'বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র; ১৯৯১-২০০৮'। এ শিরোনামটি বিশ্লেষণ করলে প্রধান দু'টি অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। এক. নির্বাচন এবং দুই. গণতন্ত্র। এই দু'টো অনুষঙ্গের সঙ্গে আবার জড়িত হয়েছে আরও একটি বিষয় তা হল– বাংলাদেশ। অর্থাৎ নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে আমার এই গবেষণা বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সংসদীয় নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কিছু পূর্ব ধারণা নেওয়া যাক–

এক. বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সমস্যা পাকিস্তান আমল থেকে। অনির্বাচিত সরকার দ্বারা দেশ পরিচালিত হয় দীর্ঘ দিন। নির্বাচন নিয়ে সংশয়, অনিশ্চয়তা, বিলম্ব ইত্যাদি পাকিস্তান আমলেও বিরাজমান ছিল। বিভিন্ন অজুহাতে নির্বাচন দিতে বিলম্ব হতো। নির্বাচন সুষ্ঠু হয়ে সরকার গঠন হলেও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্নভাবে বাঁধার সৃষ্টি করত। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চললেও পরে তা আর স্থায়ী হয় নি। এরপর যে নির্বাচনগুলো হয়েছে তা নিয়ন্ত্রিত। নির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেও নির্বাচনের সময় সমস্যার উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীকালে নির্বাচন হয় সেনা বাহিনী নিয়ন্ত্রিত। ফলে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হয় নি।

দুই. ১৯৭৫-১৯৯০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের যে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠার কথা ছিল তা হয় নি। বিশেষ করে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়ে উঠতে দেন নি। উদাহারণস্বরূপ– নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আন্দোলন করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন যে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয় তা জনগণ ও দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও রাজনৈতিক দলগুলো 'সূক্ষ্ম কারচুপি'র অভিযোগ উত্থাপন করে। কিন্তু জনগণ নির্বাচনী ফলাফলকে স্বাগত জানায় এবং গ্রহণ করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সেনা পরিবেষ্টিত পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছর কাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা নিয়েই জনমনে এবং রাজনৈতিক দলের কাছে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

চার. নির্বাচন, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে খুব বেশী লেখালেখি হয় নি। যা কিছু হয়েছে বা হচ্ছে তার বেশীর ভাগই বিভিন্ন গোষ্ঠীর অথবা দলীয় মনোভাব থেকে। খুব কম লেখাই নিরপেক্ষ আঙ্গিকে হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে গবেষণামূলক লেখালেখিও তেমন হয় নি। যদিও সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক অথবা টক-শো হয়ে থাকে। এ কারণে রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা হলেও বিশদভাবে নির্বাচনী সংস্কৃতি আলাদাভাবে চর্চিত হয় নি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির যেমন গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তেমনি নির্বাচনী সংস্কৃতির একই গুরুত্বে আলোচিত হওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

গণতন্ত্র : গণতন্ত্র শব্দটি এসেছে 'Demokratia' শব্দটি থেকে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসে শব্দটির উৎপত্তি। 'Demokratia' এসেছে 'demos' শব্দ থেকে । এর মাধ্যমে প্রাচীন গ্রিসের একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হতো, যারা যৌথভাবে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। অন্যদিকে 'kratos' বলতে বোঝায় শাসন। অর্থাৎ 'Demokratia' থেকে জনগণের শাসনকেই বোঝানো হতো।[১] গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'democracy'। ইংরেজি এই শব্দটির প্রথম প্রয়োগ হয় ষোল শতকে। ফরাসী শব্দ 'democratie' থেকে এসেছে ইংরেজি শব্দ 'democracy'।[২]

প্রাচীন গ্রিসে জনগণের শাসনই আধুনিক যুগে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। জনগণের এই শাসনের কথা বলতে গিয়ে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রিক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) বলেছিলেন, এটা এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা, যেখানে শাসন ক্ষমতা কোনো শ্রেণীর হাতে থাকে না, বরং সমাজের সবার ওপরে ন্যস্ত হয় ব্যাপকভাবে। তবে প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল। নগর-রাষ্ট্রে বসবাসকারী সবার ভোটদানের অধিকার ছিল না। মহিলা, দাস, শিশু এদের কোনো ভোটাধিকার ছিল না। জনগণের মাঝে শতকরা ১০ ভাগের মাত্র ভোটের অধিকার ছিল। সেখানে কোনো আইনসভা ছিল না। ছিল না সরকারের কোনো শ্রেণী বিভাগ। জনগণ হাত তুলে তাদের মতামত দিত। এমনকি লটারির মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করা হতো। সুতরাং এ ধরনের একটি ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব পুরোপুরি কখনো নিশ্চিত হয় নি এবং জনগণের পুরো অংশের মতামত কখনোই প্রতিফলিত হয় নি

কিংবা সংখ্যাধিক্যের শাসন কখনও নিশ্চিত হয় নি।[৩] এথেন্সের খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ পেরিক্লিস বলেছেন : 'আমাদের শাসনকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করি এ জন্য যে, শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে বহুজনের ওপর, কতিপয় ব্যক্তির ওপর নয়' (`We are called a democracy because the administration is in the hands of the many and not in the few.')। একই সুরে এরিস্টটল তাঁর 'Politics' গ্রন্থে চতুর্থ অংশের ষাট অনুচ্ছেদে বলেন : 'সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে তা গণতন্ত্র' (`We may lay down generally that a system which does not allow every citizen to share is oligarchical and that system which does not is democratic.')। আব্রাহাম লিঙ্কনের সংজ্ঞার্থও অনেকটা তেমনি। তিনি ১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বরে প্রদত্ত তাঁর দু'মিনিট-কাল স্থায়ী গেটিসবার্গ বক্তৃতায় বলেন : 'জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার এবং জনগণের স্বার্থে পরিচালিত সরকার পৃথিবী থেকে মুছে যাবে না' (`That government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.')।[৪] এ সব সংজ্ঞার্থ ছাড়াও, বিভিন্ন লেখক গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন বিভিন্ন রূপে। কেউ বলেছেন গণতন্ত্র 'সম্মতির সরকার' (`Government by consent')। কেউবা বলেছেন, গণতন্ত্র 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' ('sovereignty of people')। কারো মতে গণতন্ত্র 'সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন' ('ruled by the majority')। কেউ আবার গণতন্ত্রেকে চিহ্নিত করেছেন 'সীমিত সরকার' রূপে (`limited government')। এ সবই গণতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার্থ। অতি সংক্ষেপে, গণতন্ত্র এমন এক সরকার ব্যবস্থা যেখানে জনগণ নিজেদের শাসন করে।[৫] অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেন, "গণতন্ত্র অবশ্যই একটা আদর্শ ব্যবস্থা। গণতন্ত্র অর্থ কেবল ভোট নয়। কিংবা নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ নয়। গণতন্ত্রের মূল কথাটা হল অধিকার ও সুযোগের সাম্য। এটা এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে সব মানুষেরই সমান অধিকার থাকবে, সুযোগও থাকবে, কিন্তু বৈষম্য থাকবে না।"[৬] তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি* শিরোনামে এক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধীর একটা বাণী উদ্ধৃত করেছে, তাঁর ভাষায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সকলে ক্ষমতার অংশীদার হয়ে না ওঠে, সে অবধি গণতন্ত্র অসম্ভব।[৭]

ডেভিড হেল্ড বলেন, গণতন্ত্র সম্পর্কে দু'টি ঐতিহাসিক সত্য সর্বজনগ্রাহ্য। গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্রকে 'মূর্খের শাসন' বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, যে-কোনো সমাজে তাদের সংখ্যাই বেশী। গ্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের মতে, গণতন্ত্র 'নিম্নস্তরের' শাসন ব্যবস্থা। এমিল ফাগুয়ে গণতন্ত্রকে বলেছেন, 'অক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ'। উনিশ শতকে ট্যালির্যান্ড গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন 'মন্দ লোকদের সরকার' রূপে (government of the blackguards)।

গণতন্ত্র যে উৎকৃষ্ট সরকার ব্যবস্থা, এ সম্পর্কে ঐকমত্য হওয়া গেছে, মাত্র চার-পাঁচ দশক আগে, এবং তাও এমনভাবে যে, গণতন্ত্র না হলে কোনো সরকার বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃত হবে না। আজকাল ডান, মধ্য, এমনকি বাম থেকেও গণতন্ত্রের প্রশংসায় সবাই মুখর। সকলেই এখন

গণতন্ত্রের সমর্থক। সবাই গণতন্ত্রী। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারাও এখন গণতন্ত্রকে সেরা ব্যবস্থা বলতে শুরু করেছেন। গণতন্ত্রী হওয়াই এখন কাম্য পদক্ষেপ। বিধি-বিধান, নীতি-সিদ্ধান্ত সবই বৈধ যদি তা গণতন্ত্রীদের দ্বারা প্রণীত হয়। বর্তমানে গণতন্ত্র হয়েছে চমকপ্রদ এক আবরণ। এ আবরণে ঢাকা পড়লে নিয়মহীনতা, এমনকি নীতি-বিগর্হিত কাজকর্মও বৈধ হয়ে ওঠে।

আর একটি ঐতিহাসিক সত্য হল, আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রের প্রাচীনতা। মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষায় গণতন্ত্র বরাবর বিদ্যমান। আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রিসের প্রাজ্ঞ লেখকদের লেখায় গণতন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য তাঁদের লেখায় সমাজতন্ত্রের কথাও রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল মাত্র সেদিন, ১৯১৭ সালে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার কিছুদিন পূর্বে। রবার্ট ডালের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকেও গণতান্ত্রিক বলতে চান, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র ছিল অসম্পূর্ণ, এর অন্যমত কারণ মহিলাদের ভোটাধিকার কোনোটিতে স্বীকৃত হয় নি। তা ছাড়া, আমেরিকায় নিগ্রোদেরও তখন ভোটাধিকার ছিল না।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবস্থা গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত হলে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশ শতকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে (১৮৯৩ সালে) শুধুমাত্র নিউজিল্যান্ডে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়ায় মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় ১৯০২ সালে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে, ব্রিটেনে ১৯২৮ সালে। ফ্রান্সে এবং বেলজিয়ামে নারীর এই অধিকার লাভ করেন ১৯৪৭ সালে। সুইজারল্যান্ডে এ অধিকার স্বীকৃত হয় ১৯৭১ সালে। এদিক থেকে বলা যায়, রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র প্রাচীনতম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিন্তু সাম্প্রতিকালের, এক অর্থে বিশ শতকের।[৮]

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ঐতিহ্য অনেক সমৃদ্ধ। খ্রিষ্টীয় ৭৫০ সালে পালবংশের শাসনের শুরু থেকে বাংলার রাজনৈতিক বিকাশের সূচনা। এর আগের এক শ' বছর ছিল চূড়ান্ত অরাজকতার সময়। সে সময় সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "গৌড় বঙ্গ সমতটে তখন কোন রাজার আধিপত্য নেই। রাষ্ট্র ছিন্নভিন্ন; ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ নাগরিক যে যার ঘরে সবাই রাজা। আজ যে রাজা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব দাবী করছে কাল তার কাটা মুণ্ডু ধুলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। এই নৈরাজ্যের নাম দেওয়া হয়েছে মাৎস্যন্যায়। রাজা নেই অথচ সবাই রাজার গদিতে বসতে চায়। এক শ' বছর ধরে চললো এই অবস্থা।"[৯] পরিস্থিতির পরিবর্তন এল একটি ঘটনার মাধ্যমে। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বলেন, "প্রজাবৃন্দ যাঁহাকে গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াছিল তাঁহার নাম গোপাল দেব।"[১০] অবশ্য বিতর্ক আছে গোপলের ক্ষমতারোহণ প্রক্রিয়া নিয়ে। অনেকে মনে করেন গোপাল কূটকৌশলের মাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করে সিংহাসন লাভ করেন। খলিমপুর তাম্রলিপির একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, "মাৎস্যন্যায় অবস্থার অবসানের জন্যে 'প্রকৃতিগণ গোপালকে রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল'।" 'প্রকৃতিগণ' শব্দটির বিশেষ অর্থ 'জনগণ' বা 'প্রধান কর্মচারী'

বোঝায়। সেই অরাজক সময়ে বা সেই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের ঐকমত্য বা নির্বাচন অনুষ্ঠান করানো অস্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, ব্যাপক জনসমর্থনের ভিত্তিতে গোপাল ক্ষমতারোহণ করেন এবং জনসমর্থনের ভিত্তিতে তাঁর বংশ চার শ' বছর রাজত্ব করে। প্রসঙ্গক্রমে রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ্য, "এই চরম দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তি লাভের জন্য বাঙালী জাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।" জনমতের সক্রিয় ভূমিকা যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা হয় তা হলে পাল রাজত্বের এমনি সূচনাকে সব বিতর্ক মেনে নিয়েও গণতান্ত্রিক বলার মতো যুক্তি রয়েছে। অবশ্য এটাও ঠিক যে রাজতন্ত্র গণতন্ত্র নয়। কিন্তু এটাও বোধহয় অনস্বীকার্য যে, সম্প্রতি People power বলতে যা বোঝায় বাংলার ইতিহাসে তার প্রথম সীমিত সূচনা পাল রাজত্বের শুরুতে। সুতরাং নব্বইয়ের অভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের ক্ষমতাগ্রহণের মতো দৃষ্টান্ত বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যেই আছে। ঘটনাটি নতুন কিছু নয়। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের ক্ষমতার উৎস ছিল People power; যেমনটি ছিল গোপালের।[১১]

বাংলায় সুলতানী আমল থেকে এমন আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ১৪৮৬ থেকে ১৪৯৩ পর্যন্ত চারজন হাবশি সুলতান বাংলায় রাজত্ব করেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, হত্যা ও প্রজাপীড়ন ছিল হাবশি শাসনের মূল বৈশিষ্ট্য। গোপাল-পূর্ব মাৎস্যন্যায় না হলেও সেই সময়ে সার্বিক পরিস্থিতি ছিল অরাজক। এমনি পরিস্থিতিতে জনসমর্থনপুষ্ট হয়ে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯) বাংলার সিংহাসন দখল করেন। মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে হুসেন শাহ্র বাল্যকাল শুরু হয় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখালের কাজ দিয়ে। কিন্তু নিজ-গুণে ও অধ্যবসায়ে কারণে তিনি হাবশি সুলতানদের উজিরের পদ পেয়েছিলেন। শেষ হাবশি সুলতান মুজাফ্ফর শাহ্র মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে হুসেন শাহ্কে সুলতান মনোনীত করেন।[১২]

সুতরাং যত সীমাবদ্ধ অর্থেই হোক না কেন এটা অনস্বীকার্য যে, আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যে People power এর দৃষ্টান্ত আছে; এবং যা ব্যাপক অর্থে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি সূচকও বটে। কাজেই বর্তমানে গণতন্ত্রের লক্ষ্যে আমাদের যে প্রয়াস, তা শুধু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নয়, বরং গণতান্ত্রিক মূলে ফিরে যাবারও। কিন্তু এটাও সত্য যে, গণতন্ত্র আমাদের জন্যে পেয়ে হারানোর মতো ব্যাপার। এবং সাম্প্রতিককালে গণতন্ত্র ফিরে পেয়ে তার যথার্থতা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।[১৩]

এমাজউদ্দীন আহমদ, তাঁর *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ* গ্রন্থে বলেন, গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তির মূলে রয়েছে মূলত দু'টি কারণ :

(এক) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করার শর্তকে অনেক সময় এক ও অভিন্ন করে দেখা হয়, যদিও দু'য়ের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন বলে সংজ্ঞায়িত করা সহজ হলেও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে সমাজ ব্যবস্থায় যে সব

শর্তের প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা তেমন সহজ নয়। একটি আদর্শ, অন্যটি বাস্তবতাভিত্তিক। আদর্শ হিসেবে যুগ যুগ ধরে গণতন্ত্র মানব মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাস্তবে কিন্তু খুব কম সমাজই গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছে। তাই আদর্শের সাথে সাথে বাস্তবতার যে অসঙ্গতি গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় তাই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

(দুই) আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাই সব সময় কোনো না কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো কাঠামো নেই। নেই তার সর্বজনস্বীকৃত কোনো রূপ। গণতন্ত্র সম্পর্কে তাই জানতে হলে গবেষকদের তাকাতে হয়েছে পুরোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে, হয় ব্রিটিশ ব্যবস্থার দিকে, নয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতির দিকে। এ সব কারণে কোনো কোনো গবেষক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র না বলে উল্লেখ করেছেন বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা রূপে (polyarchy)। বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থার রূপরেখা নির্দেশ করা সম্ভব। তাঁদের মতে সম্ভব নয় গণতন্ত্রের আদর্শ কাঠামো বিনির্মাণ।[১৪] গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হিসেবে রবার্ট ডাল সাতটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিবরণ দিয়েছেন। শাসন ব্যবস্থায় এদের উপস্থিতি ঘটলে সে ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করা যায়। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. সরকার পর্যায়ে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করা থাকে।

২. কর্মকর্তা নির্বাচন এবং অপসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান।

৩. নির্বাচনে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।

৪. শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তির নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ।

৫. বাক্‌স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কার্যধারা পর্যালোচনা ও সমালোচনা তথা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনায় নাগরিকদের স্বীকৃত অধিকার।

৬. রাষ্ট্র এবং সমাজ-সংক্রান্ত তথ্য এবং তথ্যের উৎস এমনভাবে পরিচালিত যে তার ওপর সরকার বা বিশেষ সুবিধাভোগী কোনো গ্রুপের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

৭. সংঘ, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান রচনায় নাগরিকদের অধিকারের স্বীকৃতি, যার মাধ্যমে তারা বিকল্প সরকার গঠনে অথবা বর্তমান সরকারকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়।[১৫]

এ সব প্রক্রিয়া কোনো সমাজে কার্যকর থাকলে বুঝতে হবে ঐ সমাজ গণতন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরী করেছে। গণতন্ত্রের পথে চলতে শিখেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করার মানসিকতা অর্জন করেছে। অভিজ্ঞতার পসরা সাজিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করেছে।

তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বর্তমান সংকট : একটি বিশ্লেষণ* নামক প্রবন্ধে কলকাতার 'The Stateman' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, একজন আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভারতের গণতন্ত্রের সাফল্য সম্পর্কে গবেষণা করতে আসেন। গবেষণা শেষে তিনি বলেন যে, ভারত সফরের পর তিনি গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত সম্পর্কে আর কোনো বক্তৃতা দেবেন না। কারণ গণতন্ত্রের যে-সব পূর্বশর্তের কথা বলা হয়ে থাকে, যেমন– সর্বজনীন শিক্ষা, উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক সাম্য, সহনশীলতা– এ সব অনেক কিছুই ভারতীয় সমাজকাঠামোতে অনুপস্থিত।[১৬] কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় গণতন্ত্রের এ সব পূর্বশর্তের অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে কার্যকর রয়েছে। ভারতের রাজনীতির প্রবীণ বিশেষজ্ঞ W. H. Morris-Jones ভারতের এই `Political miracle'-এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ব্রিটিশ-ভারতে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্নভাবে একটি শিক্ষিত ও শাসনকার্যে মোটামুটি অভিজ্ঞ Political class সৃষ্টি করেছিল যাঁরা শুধু মুখেই গণতন্ত্রের কথা বলেন নাই বরং গণতন্ত্রের মূল্যবোধগুলোকে আত্মস্থ (internalize) করতে পেরেছিলেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যেবোধকে সর্বতোভাবে বাস্তবায়নে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলে।[১৭] Morris-Jones-এর মতে এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন একটি Political class-ই 'স্বল্পোন্নত ও অশিক্ষিতের দেশ' ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

যদিও অনেকে ভারতের লোকসভাকে 'জওহরলাল নেহরুর দরবার' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, বাস্তবে নেহরু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংসদীয় গণতন্ত্রের সব নীতিমালা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করতেন। তিনি লোকসভার আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং সংসদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নির্দেশ দেন এবং সংসদে উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলেন। সার্বিকভাবে বলতে গেলে অন্তত নেহরুর আমলে ভারতের নির্বাচনগুলো নিরপেক্ষভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সাফল্যের কারণ নেহরু এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন Political class-এর গণতন্ত্রের প্রতি আন্তরিক Commitment . নেহেরু বলতেন: "All of us should maintain a high level of propriety and decorous behavior. Our propaganda by speech and writing should not be personal but should deal with policies and programmes. The manner of winning or losing is more important than the result."[১৮]

Almond and Verba Civic Culture পাঁচটি দেশের (ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি, মেক্সিকো ও আমেরিকা) ওপর তুলনামূলক Civic Culture এ দেখিয়েছেন যে গণতান্ত্রিক দেশসমূহে গণতন্ত্রের

সাফল্যের প্রধান উপাদান ছিল সেই সব দেশের Political class-এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর Commitment.[১৯]

আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং তাত্ত্বিকরা সবাই স্বীকার করেন যে, এ দেশের সাধারণ ভোটার নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তই দিয়ে থাকেন। ১৯৪৬, ১৯৫৪, ১৯৭০, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮-এর নির্বাচনগুলোকে আমরা এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করি। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের দেশের গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান অন্তরায় এদেশের অশিক্ষিত জনগণ নয়। আমাদের গণতন্ত্রের প্রধান অন্তরায় হল– এ দেশের Political class-এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আত্মস্থীকরণ (internalization) ও কার্যকরণের ব্যর্থতা। ১৯৯১-এর নির্বাচনের পর দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল এখন থেকে দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে। কিন্তু নির্বাচনের পর থেকেই রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। অবশ্য এইসব নেতার দীর্ঘদিন রাজনৈতিক অনুশীলনের অভাবহেতু এই গণতান্ত্রিক পদচ্যুতি ঘটতে থাকতে পারে। জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অধিক দিনের অনুপস্থিতি প্রথম থেকেই সংসদকে প্রাণহীন করে তোলে। সরকারী পক্ষের নেতাদের অনেকেই তাদের আচরণের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, যেহেতু তাঁরা ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন সে জন্য তাঁরা যা খুশি করার mandate পেয়ে গেছেন। ঢাকার মিরপুর এবং মাগুরার উপ-নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের বাড়াবাড়ি বিরোধী দলসমূহের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। এর ফলে দেশের দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মধ্যে অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা অধিকতর দানা বেঁধে ওঠে। দুই পক্ষই মনে করতে থাকে যে-কোনো প্রকারে পরবর্তী নির্বাচনে জয় লাভই বিপরীত দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সংকটের প্রধান কারণ তোফায়েল আহমেদ অত্যন্ত সরল ও স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "আমরা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি যে দলই ক্ষমতায় যাই না কেন আমরা যে-কোনো প্রকারে পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হবার চেষ্টা করে থাকি।"[২০] অর্থাৎ আমাদের Political class গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন; বিশেষ করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অসৎ উপায় অবলম্বন করতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেন না। তোফায়েল আহমেদ আরও বলেছেন, নির্বাচনে অসৎ পন্থা অবলম্বন আমাদের দেশের 'রাজনৈতিক Culture'-এ পরিণত হয়েছে। তোফায়েল আহমেদ আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংকটের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, "Lack of commitment of our political class to the rules of the game of democracy."[২১] এই পরিপ্রেক্ষিতেই নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নটা অনেকেরই সমর্থন লাভ করেছে। বলা হয়েছিল যে, পরপর তিনটা নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হলে দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।[২২] অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন, "গণতন্ত্রের মূলভিত্তি যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সে সম্বন্ধে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নাই। কিন্তু তার জন্য যে অনির্বাচিত (Non-elected) লোকদের দিয়ে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনই একমাত্র সমাধান তা মনে হয় না। বরং আমার মনে হয় রাজনীতিবিদদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

ধারণা রাজনীতিবিদদের প্রতি তাঁদের নিজেদের অনাস্থাজ্ঞাপনের সমতুল্য। কীভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন করা যায় সে দায়িত্ব পালন গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদদের প্রাথমিক দায়িত্ব। রাজনীতিবিদরা তাঁদের এই প্রাথমিক দায়িত্ব ১৫ বছর বা অনির্দিষ্টকালের জন্য অনির্বাচিত লোকদের হাতে তুলে দিতে পারেন না। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিবিদরা মেনে নিচ্ছেন তাঁরা তাঁদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করতেই ব্যর্থ।"[২৩] গণতন্ত্রের পথ সবদেশেই অন্ত্যন্ত বন্ধুর। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংকটের সৃষ্টি হয়। এ সব সংকটকালে গণতান্ত্রিক দেশের রাজনীতিবিদরা আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে নতুন ঐকমত্য সৃষ্টি করেন। এই নতুন ঐকমত্য সৃষ্টি করতে দেশের প্রত্যেকটি প্রধান দলেরই অন্য প্রধান দলগুলোর মনোভাবের প্রতি কিছুটা সম্মান দেখানো প্রয়োজন হয়। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বলতেন, "Democracy does not mean only members. In democracy you will have to give and take. Democracy means agreement between people and friendship and cooperation." তাই অনেক গণতান্ত্রিক দেশে একটা প্রথা গড়ে উঠেছে যে জাতীয় কোনো গভীর সংকটের সময় সব দল মিলে সে সংকট উত্তরণের চেষ্টা করে।[২৪] অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন, "রাজনীতিকদের দ্বারা গঠিত কোনো জাতীয় সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এ দেশের রাজনীতিবিদদের ক্ষয়িষ্ণু মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি গণতান্ত্রিক convention সৃষ্টি হবে। আমাদের রাজনীতিবিদদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের Challenge গ্রহণ করতেই হবে। তাঁরা যদি সবাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে পারেন, তাঁরা যদি নিজেরা নির্বাচনে অবৈধ হস্তক্ষেপের চেষ্টা না করেন তা হলে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান আমাদের সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে অসম্ভব কোনো কাজ নয়।"[২৫]

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিন্তু অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র। কোনো একটি আর একটির হুবহুব নকল নয়। প্রত্যেকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, আপন আপন আলোকে ভাস্বর। কোথাও রয়েছে আইন পরিষদের প্রাধান্য, কোথাও-বা নির্বাহী বিভাগের। কোথাও নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংগঠিত মন্ত্রিপরিষদ, কোথাও রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ। কোনো কোনো রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত। কোথাও তিনি সংসদ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত। কোথাও-বা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত। সবগুলোই কিন্তু গণতান্ত্রিক। কোনোটির ধরন সংসদীয়, কোনোটি রাষ্ট্রপতিক। কোনোটি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত, কোনোটি এককেন্দ্রিক। গণতান্ত্রিক নীতির ক্ষেত্রে কিন্তু তারতম্য নেই। কোনোটি বেশী গণতান্ত্রিক এবং কোনোটি কম এ প্রশ্ন অবান্তর।[২৬]

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ঠিক করতে না পারার কারণেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকটের তৈরী হয়। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল দু'টিতে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। বাংলাদেশে প্রধান দু'টি দলই দলের নামে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। বিদ্যমান এ অবস্থায় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল তৃতীয়ধারার

রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুদয়ই দেশকে রক্ষা করতে পারে বলে মনে করি। কিন্তু বাংলাদেশে তৃতীয় শক্তির আগমন ঘটেছে সশস্ত্র বাহিনী থেকে যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নির্বাচনই গণতন্ত্রের প্রতিশব্দ হয়ে গেছে। নির্বাচন বলতে তাঁরা ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় টিকে থাকা বোঝে। তবে এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই নির্বাচনই হল সরকার পরিবর্তনে একমাত্র গ্রহণযোগ্য উপায়। বাংলাদেশে যে সব মাইল ফলক আন্দোলন হয়েছে তার মূল দাবী ছিল গণতন্ত্র এবং স্বচ্ছ নির্বাচন।[২৭] একটি গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে সব রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া আর ক্ষমতায় আরোহণের একমাত্র সোপান একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, যার মাধ্যমে ভোটারদের ইচ্ছার সঠিক প্রতিফলন ঘটবে। এ ধরনের ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্বের প্রায় সব দেশে, বিশেষ করে, গণতান্ত্রিক দেশে একটি প্রতিষ্ঠান থাকে যার আধুনিক নাম 'নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা সংস্থা' (Electoral Management Body, সংক্ষেপে EMB) যা আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশন হিসেবে পরিচিত।[২৮]

গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে সুষ্ঠু নির্বাচনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল–

(ক) একটি স্বচ্ছ এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা,

(খ) নির্বাচন পরিচালনা এবং সুস্থ সংস্কৃতি বজায় রাখতে বাস্তবধর্মী নির্বাচনী আইন ও বিধি,

(গ) গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন পরিচালনা সংস্থা বা নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতি।

একটি স্বচ্ছ এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা একটি গ্রহণযোগ্য এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভোটার তালিকা শুধু স্বচ্ছ হলেই হবে না এ তালিকা প্রস্তুতে যেমন ভোটার তথা আপামর জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে তেমনি নিশ্চিত করতে হবে প্রয়োজনে ভোটার কর্তৃক নিরীক্ষণের। ভোটার তালিকা তৈরী নিয়েই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নানা ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দিতে পারে। তালিকায় নিশ্চিত করতে হবে প্রতিটি বৈধ ভোটারের অন্তর্ভুক্তি। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে দেশের সংবিধানে উল্লিখিত আইনের প্রতিফলন থাকতে হবে। আমাদের দেশের সংবিধানে ভোটার হওয়া এবং তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। ১৮ বছরের যে-কোনো নাগরিক, যদি তিনি যথাযথ আদালত কর্তৃক মানসিক প্রতিবন্ধী সাব্যস্ত না হন, সমঅধিকারে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সংখ্যালঘুর অথবা নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তেমনি দেশের কোনো বৈধ ভোটারকে কোনো অজুহাতে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। অবশ্যই ভোটারকে এ দেশের নাগরিক হতে হবে। সাংবিধানিকভাবে ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শুধু নির্বাচন কমিশনকে। কাজেই ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও

গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।[২৯] অতীতে আমাদের দেশের ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নিয়ে একাধিক সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অতীতে একাধিকবার পক্ষপাতদুষ্টের অভিযোগ ওঠে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে।

ভোটার তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতি অবশ্যই আইনসিদ্ধ হতে হবে। তবে পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হলে আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন। অতীতে আইনের এবং পদ্ধতির দুর্বলতার জন্য ভোটার তালিকা প্রতিবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ১৯৯১ সালকে গণতন্ত্রের পুনর্বহালের সময় চিহ্নিত করলেও সে সময় হতেই ভোটার তালিকা প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। ক্রমেই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নিয়ে সরগরম হতে থাকে। ২০০৬ সালে এ বিতর্ক চরমে ওঠে। দেশের আপামর জনসাধারণ ভোটার তালিকার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এরই ফলশ্রুতিতে নির্বাচন কমিশন হয়ে ওঠে প্রশ্নবিদ্ধ। রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে দাবী ওঠে স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের। দাবী করা হয়, সে সময় ভোটার তালিকায় এক কোটির উপরে ভূয়া ভোটারের অন্তর্ভুক্তি ছিল। ওই সময় প্রায় সাড়ে ১২ কোটি জনসংখ্যার বিপরীতে ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে নয় কোটি। বিভিন্ন সংগঠন এবং বিরোধী দলগুলো দাবী করে, প্রায় দেড় কোটি ভোটার ছিল অতিরিক্ত। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় যখন একটি দেশী এবং একটি বিদেশী সংগঠন নমুনা জরিপের মাধ্যমে নিশ্চিত করে যে, প্রায় এক কোটি ২০ লাখ অতিরিক্ত নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নে এর সত্যতা পাওয়া যায়। ২০০৬ সালের তালিকায় ভোটার ছিল ৯,১৩,১০,০০০ কোটি আর ২০০৮ সালের ছবিসহ ভোটার তালিকায় ভোটার তালিকায় ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮,০৮,৫০,০০০ কোটি।[৩০] এ অবস্থায় বাংলাদেশের ভোটাদের ভোটার তালিকার উপর আস্থা নষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। শুধু ভোটার তালিকার উপরই নয় এরই সূত্র ধরে নির্বাচন কমিশনও পড়ে আস্থার সংকটে।

ভোটার তালিকা বা এহেন অবস্থার কারণ ছিল প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা। ওই সময়কার বিদ্যমান আইনকেও সঠিকভাবে প্রতিপালিত করা হয় নি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত করে সবার উপস্থিতিতে নাম লিপিবদ্ধ করার মতো দুরূহ কাজে গাফেলতি, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের ছত্রছায়ায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত এবং মৃত ব্যক্তিদের নাম কর্তনের মতো কার্য সম্পাদন না করাতে ভোটার তালিকায় অসঙ্গতি থেকে যায়। এক কোটির উপরে অতিরিক্ত নামের অর্ধেকের বেশী ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক যাদের ভোটার তালিকা জনসাধারণের নিরীক্ষণের জন্যও উন্মুক্ত থাকত না।[৩১]

সুষ্ঠু নির্বাচনই পরিবর্তন আনে রাজনৈতিক তথা নির্বাচনী সংস্কৃতিতে। রাজনৈতিক তথা নির্বাচনী সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল নির্বাচন আইন ও বিধি এবং এর সুষ্ঠু প্রয়োগ। বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালিত হয় একটি মূল আইন দ্বারা যেটি 'The Representation of the people order 1972'। এ আইনটি প্রবর্তিত হয়েছিল ডিসেম্বর ২৬, ১৯৭২ সালে।[৩২] অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এ আইনটি প্রণীত হয়েছিল। এর কিছু কিছু সংস্কার অথবা সংশোধনী হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন অতীতে এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে নি। কঠিনভাবে

প্রয়োগ না করার কারণে নির্বাচনী সংস্কৃতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে। এ আইনটি বহুভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। আনা হয় নি বাস্তবসম্মত সংস্কার। আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগ না করার কারণে মাগুরার মতো উপ-নির্বাচন হয়েছিল। ওই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে আসে অবিশ্বাসের সংস্কৃতি। আইন প্রয়োগ না করার কারণে নির্বাচন কমিশনে যেভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় সেখানে থেকে আর বের হতে পারে নি নির্বাচন কমিশন। ফলে নির্বাচন সংস্কৃতিতে যুক্ত হয় অব্যবস্থা।

সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার এ প্রধান উপাদান প্রয়োগে ব্যর্থতার জন্ম দেয় আইনের সংস্কার এবং সেই সঙ্গে প্রয়োগের বিষয়টি। আইন প্রয়োগে শিথিলতা এবং অবজ্ঞা দু'টোই নির্বাচনী সংস্কৃতিতে ধস নামায়। তবে এ কথাও সত্য যে, শুধু আইন তৈরী করাই যথেষ্ট নয় এর প্রয়োগ করতে না পারলে সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে আস্থার সংকটের সৃষ্টি হয়। তেমনি দৃশ্যমান ছিল ২০০৬-২০০৭ সালে। ওই সময়ের রাজনৈতিক পটভূমিই সহায়তা করেছিল দু'বছরের জরুরী অবস্থার তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় আনতে।

অন্যদিকে এ শিথিলতার কারণে নির্বাচন কমিশন আস্থাহীন হয়ে পড়ে যার খেসারত দিতে হয়েছিল নির্বাচন কমিশন এবং গোটা রাজনীতিবিদদের। শুধু তাই নয়, দেশে গণতন্ত্রিক ব্যবস্থায় নেমে আসে একটি বড় ধাক্কা। কাজেই নির্বাচনী সংস্কৃতিতে সুস্থধারা ফিরিয়ে আনতে আইনের যথাযথ সংস্কার এবং প্রয়োগ অত্যাবশাকীয়। যাতে দেশের জনগণ এবং সকল শ্রেণীই আস্থাশীল হয় কমিশনের উপর।

তৃতীয় উপাদান হল গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন কমিশন। দেশে উন্নত নির্বাচনী সংস্কৃতির, সুষ্ঠু নির্বাচনসহ সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা এ সংস্থাটির দায়িত্ব। তার ব্যর্থতার কারণে ভোটার তথা সাধারণ মানুষের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থার সংকটের সৃষ্টি হয়।

নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে প্রথমতঃ সদস্য নির্বাচনে স্বচ্ছতা এবং নির্বাচিত সদস্যদের ব্যক্তিগত সততা ও স্বচ্ছতা, দ্বিতীয়তঃ নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সর্বোপরি নির্বাচন কমিশন সংস্থা হিসেবে কতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে তার উপর। অতীতে বাংলাদেশে কমিশন সচিবলায় আইনগতভাবেও স্বাধীন ছিল না।

অর্থাৎ কমিশন স্বাধীন হলেও এর সচিবালয় স্বাধীন ছিল না। এহেন অবস্থায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে জনগণ সরকারের আজ্ঞাবাহকই মনে করে আসছিল বহু বছর ধরে। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে আস্থাহীন সংগঠন হয়ে পড়ে ২০০৩ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে। ব্যাপক আস্থার সংকটের মধ্যে ওই সময়কার নির্বাচন কমিশনাদেরকে পদত্যাগ করতে হয়।[৩৩] নির্বাচন কমিশনাদের নির্বাচন নিয়ে বিরোধী দলসমূহ সব সময় অনাস্থা প্রকাশ করেছে। ফলে যিনিই নির্বাচন কমিশনার

হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তিনিই বিতর্কিত হয়েছেন। তাই আমাদের নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের একটি সর্বজনীন পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।

নির্বাচন সংস্কৃতির উন্নতির সর্বশেষ উপাদান প্রতিনিধিমূলক নির্বাচন পদ্ধতি। আমাদের সংবিধানে যে পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে 'ফাস্ট পাস্ট দ্য পোস্ট'।[৩৪] এর অর্থ নির্বাচনে একটি আসনে প্রদেয় ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাপ্ত ভোটের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন। গণতন্ত্র যেহেতু বহুদলীয় এবং দলভিত্তিক নির্বাচন কাজেই ভোটাররা দলভিত্তিক প্রার্থীতে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে দলকেই ভোট দিয়ে থাকে। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে প্রার্থীর গুণাগুণ বিচার্য তাও বেশ নগণ্য। বেশীর ভাগ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়, দলের পক্ষে মোট প্রদত্ত ভোটের অনুপাতে সংসদীয় আসনসংখ্যা প্রাপ্ত হয় নি। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন, 'ফাস্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' পদ্ধতি গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে বহু দলের বিকাশের জন্য সহায়ক নয়। এ পদ্ধতি দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকেই পাকাপোক্ত করে এবং সে কারণেই সংসদে বহু মতবাদের সদস্য নির্বাচিত না হওয়ার কারণে সংসদ এক দলের দখলে থাকে। এমনটাই বিগত কয়েক সংসদে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ পদ্ধতিতে প্রায়ই গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের পর্যায়ে পৌঁছে বলে অভিযোগ করা হয়। এ সব কারণেই এ পদ্ধতির বিপরীতে আনুপাতিক হারে প্রার্থী নির্বাচনের পদ্ধতি পৃথিবীর বহু গণতান্ত্রিক দেশে চালু রয়েছে। আনুপাতিক হারের (Proportional Representation) নির্বাচন পদ্ধতিতে ছোট ছোট এবং বহুমাত্রিক মতাবলম্বী দলের বিকাশ সম্ভব। অনেক দেশে মিশ্র পদ্ধতি চালু রয়েছে।

ওপরে যে উপাদানগুলোর কথা আলোচনা করেছি এ সব উপাদান সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের মাঝে নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ ছাড়াও চলমান সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দেশে নির্বাচন সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব এবং তা বৃহত্তর পরিসরে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিস্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর সব সময় হামলা হয়েছে। কীভাবে আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি ও সেবকরা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদরা নিজস্বার্থে নির্বাচন বানচাল করেন তার কয়েকটি উদাহরণ দিই। নির্বাচন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখার ব্যাপারে যদি রাজনীতিবিদরা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তাহলে দেশের রাজনীতিতে তাদের অধঃস্তন ভূমিকা পালন করতে হতো না, এতগুলো আন্দোলনের সম্মুখীনও আমাদের হতে হতো না, রাষ্ট্রের নীতি অন্য রকম হতো। খন্দকার মোশতাকের পর প্রেসিডেন্ট আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম চেয়েছিলেন সময়সূচি অনুয়াযী নির্বাচন হোক। দেখা গেল, জিয়াউর রহমান তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন। বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে এ জন্য বিশেষ সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু দেখা গেল এ ব্যাপারে তিনি উৎসাহী নন। উপদেষ্টা পরিষদও উৎসাহী ছিল না। কারণ, তাহলে তাদের চাকরিও আর থাকে না। বিচারপতি আব্দুস সাত্তারও তাদের হয়ে কাজ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট সায়েম লিখেছেন, "আশ্চর্য এই যে,

বিশেষ সহকারী যিনি শুধু হাইকোর্ট নয়, সুপ্রীম কোর্টেরও বিচারক ছিলেন, অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ঐ দলে। বিষয়টি আরও খারাপ লাগলো এই ভেবে যে, তিনি জানতেন যে, নির্বাচন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্যই আমি তাঁকে নিয়োগ করেছি ঐ পদে।”[৩৫]

পুরো সময়টি ছিল জেনারেল জিয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের সময় এবং বিচারপতি সাত্তার সে সময় তাঁর হয়ে কাজ করছিলেন– যাতে সম্পূর্ণভাবে দেশের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণের আগে জিয়া ক্ষমতা খানিকটা সংহত করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট সায়েম উল্লেখ করেছেন, জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে চাচ্ছিলেন এবং উপদেষ্টারা সেটা সমর্থক করছিলেন। বিচারপতি সাত্তার তাঁকে বলেছিলেন, “ভাই, তিনি যখন সিএমএলএ হতে চাচ্ছেন তখন তাঁকে তা হতে দিন।”[৩৬] অবশেষে ১৯৭৬ সালের ২৯শে নভেম্বর বিচারপতি সায়েম বাধ্য হলেন পদত্যাগে এবং নিজেই একটি ফরমান জারী করে জিয়াকে উত্তরাধিকারী রূপে অর্থাৎ সিএমএলএ হিসেবে ঘোষণা করলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকদের[৩৭] কর্মকাণ্ডও বিচার্য। প্রেসিডেন্ট সায়েম লিখেছেন, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ছাড়া বাকী রাজনীতিবিদরা ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া আসা করতেন। বিচারপতি সাত্তারও।[৩৮] তিনি আরও লেখেন, “এতে বোঝা যায়, ঐ সময়ে আসল রাজনৈতিক নেতারা হয়তো খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছেন অথবা মরে গেছেন। শুধু তাই নয়– মনে হয়, রাজনৈতিক নেতারা সেনাধ্যক্ষদের নেতৃত্ব ছাড়া চলতে পারেন না, তা তিনি অবসরপ্রাপ্ত হোন বা না হোন, ক্ষমতায় তাদের থাকতেই হবে।”[৩৯] প্রেসিডেন্ট সায়েম আরও লেখেন, “যখন তিনি নির্বাচন নিয়ে তোড়জোর করছেন তখন দেখলেন রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনে যেতে চাচ্ছেন না। তারা সবাই জিততে চান এবং সমর্থন লাভের আশায় যাচ্ছেন ক্যান্টনমেন্ট কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঐকমত্যে পৌঁছচ্ছেন না।”[৪০]

এ প্রসঙ্গে দু’টি উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রেসিডেন্ট সায়েমের সময় নির্বাচন নিয়ে যখন কথাবার্তা চলছিল তখন বামপন্থী নেতা [তৎকালীন ইউ.পি.পি.র নেতা] কাজী জাফর ঘোষণা করলেন, যেখানে দুই বছর ধরে দেশে রাজনীতি বেআইনী এবং যেখানে এখন পর্যন্ত ভালোভাবে রাজনীতি শুরু করতে দেওয়া হয় নি সেখানে এত দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠান আমরা বাস্তবসম্মত ও গণতন্ত্রসম্মত মনে করি না।[৪১]

মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন, “দেশে বৃহত্তর স্বার্থের তাগিদেই নির্বাচন স্থগিত রাখা দরকার। যদি নির্বাচন স্থগিত রাখা না হয় তাহলে তিনি নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করবেন।”[৪২] সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেন ‘তিনি সামরিক না বেসামরিক সরকার চান?’ এর উত্তরে তিনি বললেন, “বর্তমান সরকারই সাময়িকভাবে চলুক। তবে, এর জন্য ভালো মানুষ সংগ্রহ করা দরকার।”[৪৩] এর পর তিনি আরও ঘোষণা করলেন, “কোনোমতেই নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না।”[৪৪]

এ ছিল সিভিল সমাজের স্বার্থের বিনিময়ে সামরিক শাসকদের হাত শক্ত করার প্রচেষ্টা। সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি জিয়াউর রহমানও সে মুহূর্তে নির্বাচন চাচ্ছিলেন না। কোনো সামরিক শাসকই

চান না। পরবর্তীকালে আমরা তাই দেখি, নিজের ভিত্তি সংহত করার পর জেনারেল জিয়া নির্বাচন দিয়েছেন।

গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ

দীর্ঘ ১৬ বছর পর ১৯৯১ সালে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত ৫ম সংসদে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিনজোটের রূপরেখার আলোকে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হয়। বিগত পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম সংসদ এই তিনটি মেয়াদে পনের বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ব্যবস্থায় দেশ পরিচালিত হয়েছে। অষ্টম সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর দেশে পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সংসদীয় সরকার হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয় ক্ষতিগ্রস্ত। সামরিক কর্তৃপক্ষ দুই বছরের অধিক সময় ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। আবার ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সব নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। নির্বাচন কমিশন হয় ব্যাপকভাবে বিতর্কিত। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনকে করতে হয় পুনর্গঠন। এরপরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নির্বাচনে পরাজিত হয়ে প্রত্যেক বিরোধী দল নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে নির্বাচনী ফলাফল অস্বীকার করে। তবে দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে নির্বাচন মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হওয়ায় বিরোধী দলসমূহ প্রাথমিকভাবে সংসদে গেলেও কিছু দিন পরেই তারা সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয় অস্থিতিশীল, গণতন্ত্র হয় ক্ষতিগ্রস্ত এবং দেশের অর্থনীতির হয়েছে ব্যাপক ক্ষতি। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো গ্রহণযোগ্যতা পেলেও রাজনৈতিক নেতারা নিজেরা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধারক হতে পারে নি। বরং তারা বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে জনগণের কাছে আস্থা হারিয়ে ফেলে। রাজনৈতিকগণ তারা একে উপরের উপর বিশ্বাস করতেও পারে নি। ফলে তত্ত্বাবধায়কের মতো একটা ব্যবস্থা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। গণতন্ত্র বাংলাদেশে তার স্থায়ী ও টেকসই আসন এখনও করতে পারে নি এ দেশে রাজনীতিবিদদের দায়িত্বশীল আচরণের অভাবে। আর এ প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি, বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিশেষ করে নির্বাচনকেন্দ্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১৯৭২ সালের পর থেকে বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তি, সামরিক ও বেসামরিক শাসন, নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন অতিক্রম করে ১৯৯১ সালে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় পুনরায় প্রবর্তিত হয়। ১৯৯১-২০০৮ সাল পর্যন্ত সংসদীয় ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এ সময় ধরে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে আমরা খেয়াল করলে দেখতে পায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, হরতাল, অবরোধ, নাগরিক নিরাপত্তহীনতা, সংসদ বর্জন, সংসদীয় কমিটি গঠনে দীর্ঘসূত্রিতা, কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি অবজ্ঞা, জাতীয় নির্বাচন বয়কট, নির্বাচনকেন্দ্রিক জনগণের মধ্যে উৎকণ্ঠা, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিহিংসামূলক

ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভেদ, দলীয় কোন্দল, বংশানুক্রমিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং পুনরায় জরুরী অবস্থা জারী ও নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন বিলম্বিত হওয়া– রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের কাঙ্ক্ষিত সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পরও কেন এ রকম হচ্ছে? কেন নির্বাচনকেন্দ্রিক সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে? আমাদের এ ব্যর্থতার কারণ কী? এ সকল প্রশ্ন বিবেচনায় গবেষণা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ও সংসদীয় নির্বাচনের বর্তমান বৈশিষ্ট্যসমূহ কেমন? বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি– বিশেষ করে নির্বাচন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপসমূহ বর্ণনা করা। যার মাধ্যমে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের প্রকৃতরূপ অনুধাবন করা যাবে।

২. বর্তমান বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাঁধা সৃষ্টি করছে কিনা?– তা নিরুপণ করা।

৩. এ পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ইত্যাদি অনুসন্ধান করা।

অর্থাৎ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বর্ণনা পূর্বক সমস্যা উদ্‌ঘাটন। কেন সব সময় সমস্যা নির্বাচন ঘিরেই হয়ে থাকে? এবং তার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টাই হবে এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি

সাধারণ অর্থে গবেষণা হল সত্য ও জ্ঞানের প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধান। গবেষণা পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হল গবেষণার বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা। সুতরাং সামাজিক ও রাজনৈতিক গবেষণা করতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণ, ঘটনাবলী বা সমস্যা সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করতে হয়। অতএব, সমাজ-গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক আচার-আচরণ উপলব্ধি করার প্রয়াস চালিয়ে যাই। সামাজিক সমস্যাবলী পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য কিছু কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ গবেষণায় আমি কোনো ধরা-বাঁধা পদ্ধতি অনুসরণ করি নি। এ গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি ও কার্যধারা অবলম্বন করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং বর্ণনামূলক প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্র সাময়িকী ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক গবেষণার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের আচরণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং সংশ্লিষ্ট নানাবিধ সমস্যাসমূহ পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুক্তিভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করা। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন, পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, সেমিনার ও

সিম্পোজিয়ামে প্রকাশিত ও উত্থাপিত প্রবন্ধ প্রভৃতি মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ওয়েবসাইটের ব্যবহার করা হয়েছে এই গবেষণার প্রয়োজনে। এই গবেষণা কর্মটি অনেকখানি বিশ্লেষণাত্মক ও ঐতিহাসিক রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি, সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এ বিষয়ে গবেষণাকে করে তুলেছে জটিল। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞজনের মতামত উপস্থাপনের জন্য এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সেমিনার বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে পেশকৃত তাঁদের মতামত গবেষণা কর্মে ব্যবহার করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের সময়কাল

অভিসন্দর্ভের সময়কাল হল ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত। এই সময়কালে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচনই এই অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু। তবে গবেষণার প্রয়োজনে পটভূমিকা হিসেবে এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯৪৭-১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ১৯৯১ সাল বেছে নেওয়ার কারণ দীর্ঘদিন পর নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে মতৈক্য ও মোটামুটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে ঐ বছর এবং ধরে নেওয়া হয় ১৯৭৫ সালের পর আবার ১৯৯১ সাল থেকেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০০৬ সালে আবার নির্বাচন নিয়ে সমস্যা হলে ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় এবং তা সব মহলে প্রবলভাবে প্রশংসিত হয়।

অধ্যায় বিভাজন

গবেষণা কর্মটি মোট ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে : নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা, গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি ও অধ্যায় বিভাজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে : পটভূমিতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচন, নির্বাচনের প্রতিবন্ধকতা, নেতৃত্বের ব্যর্থতা, গণতন্ত্রের সংকট ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে : ১৯৯১-এর নির্বাচন ও খালেদা জিয়ার সময়কাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে : ১৯৯৬-এর নির্বাচন এবং শেখ হাসিনার সময়কালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে : ২০০১-এর নির্বাচন ও খালেদা জিয়া সরকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে : গবেষণার ফলাফল ও উপসংহার।

উপসংহার

বাংলাদেশে সমস্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা নির্বাচনকেন্দ্রিক। নির্বাচন ব্যবস্থা সঠিক না হওয়া পর্যন্ত এই অস্থিরতার অবসান হবে না। ১৯৯০ সালে গণ-অভুত্থান হয়েছে। এটা মূলত এরশাদের সময় অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোর অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, হত্যা, খুন ইত্যাদি ঘটনা– যা জনগণকে নিজেদের পছন্দ মতো সরকারকে বেছে নেওয়ার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে। ১৯৯০-এর পর বাংলাদেশের নির্বাচনসমূহ সুষ্ঠু হচ্ছে কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নির্বাচনকেন্দ্রিক সমস্যার জন্য অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে মনোযোগী নন। ফলে নির্বাচন পরবর্তী সময় তারা বেমালুম ভুলে যান তাদের নির্বাচনী ওয়াদার কথা। রাজনৈতিক দলসমূহে গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল করে এমন কার্যক্রমগুলো প্রতিনিয়ত চর্চা হচ্ছে। উদাহরণ হরতাল, সহিংস আন্দোলন, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ইত্যাদি– যা বাংলাদেশকে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ফেলছে। মোটকথা সরকারী দল ও বিরোধী দলসমূহ জাতির কাছে দায়বদ্ধ ও অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়। এই বিষয়গুলো মধ্যেই মূলত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সমস্যা নিহিত। সাংবিধানিক ঐকমত্যের মাধ্যমে একমাত্র বাংলাদেশের নির্বাচনকেন্দ্রিক গণতন্ত্রের একটি ভিত্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন। তা না হলে দেশ গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

[১] মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৭৪-৭৫

[২] এমাজউদ্দীন আহমদ, *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৮

[৩] তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১২

[৪] *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, পৃ. ২৮-২৯

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

[৬] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'গণতন্ত্রের ইতরবিশেষ', মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৬৬

[৭] *যুগান্তর*, ২৮শে মার্চ ২০১২

[৮] *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, পৃ. ৩০

[৯] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রচর্চা : প্রতিষ্ঠানিক রূপ', মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৮৮-৮৯

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

[১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০

[১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

[১৪] *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, পৃ. ৩০-৩১

[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[১৬] তালুকদার মনিরুজ্জামান,'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বর্তমান সংকট : একটি বিশ্লেষণ',মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৮

[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

[২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২২

[২৬] *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, পৃ. ৩২

[২৭] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রক্রিয়া ও ঐকমত্যের উপাদান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৩

[২৮] *যুগান্তর*, ২৮শে মার্চ ২০১২

[২৯] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৩-৪৬

[৩০] *যুগান্তর*, ২৮শে মার্চ ২০১২

[৩১] *প্রাগুক্ত*

[৩২] *প্রাগুক্ত*

[৩৩] *প্রাগুক্ত*

[৩৪] *প্রাগুক্ত*

[৩৫] *বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রক্রিয়া ও ঐকমত্যের উপাদান*, পৃ. ৩৪

[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

[৩৭] 'কারক' বলতে এখানে শ্রেণী বা স্তর বুঝানো হয়েছে। রাজনৈতিক কারকের তিনটি ভাগ করা সম্ভব এক. **প্রাথমিক কারক :** প্রাথমিক কারকের অন্তর্ভুক্ত হলেন– রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী এবং ভূ-স্বামী। এঁরা সরকার পরিচালনা করছে কিনা বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কর্ণধার কিনা তার সঙ্গে জড়িত এদের প্রভাব। দুই. **মধ্যবর্তী কারক :** মধ্যবর্তী কারকের অন্তর্ভুক্ত হল মূলত শিক্ষিত পেশাজীবীরা যাদের অন্তর্গত হল– মূলত শিক্ষিত পেশাজীবীরা যাদের অন্তর্গত আইনজীবী, ডাক্তার, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক প্রভৃতি এবং ছাত্র। ছাত্রদের এই বিভাগের অন্তর্ভুক্তির কারণ তারাও অচিরে সদস্য হয়ে ওঠে শিক্ষিত পেশাজীবী বা প্রাথমিক কারকের। তিন. **প্রান্তিক কারক :** প্রান্তিক পর্যায়ে আছেন গণমানুষ, এই শ্রেণীর মধ্যে কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, রাস্তার মানুষ, বিশেষ করে শহরের।

বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, পৃ. ১

[৩৮] *বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রক্রিয়া ও ঐকমত্যের উপাদান*, পৃ. ৩৪

[৩৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

[৪০] *প্রাগুক্ত*

[৪১] *প্রাগুক্ত*

[৪২] *প্রাগুক্ত*

[৪৩] *প্রাগুক্ত*

[৪৪] *প্রাগুক্ত*

দ্বিতীয় অধ্যায়

পটভূমি

বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র; ১৯৯১ থেকে ২০০৮-এর পটভূমিকে আমি দুই ভাগে ভাগ করেছি।

এক. ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত। এবং দুই. ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত।

এই সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচন, নির্বাচনের প্রতিবন্ধকতা, নেতৃত্বের ব্যর্থতা, গণতন্ত্রের সংকট ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরব এবং পরবর্তীকালে এই সময়ের সাথে ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ের নির্বাচন ও গণতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।

নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্বকরণ

স্বাধীনতা লাভের পর নব্য পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছিল ১৯৩৫ এবং ১৯৪৭ সালের যথাক্রমে 'ভারত শাসন আইন' এবং 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন'-এর সমন্বয়ে। দীর্ঘ নয় বছর পর নানা জটিলতা এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অবশেষে ১৯৫৬ সালে দেশে পার্লামেন্টারি ধাঁচের সংবিধান প্রণীত হয়। সংবিধান প্রণয়নে প্রথম এবং দ্বিতীয় গণপরিষদ ভূমিকা রাখে।[১] শুরুতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক উত্তর ভারত থেকে আগত মোহাজের ও পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের উর্দু-ভাষী রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে চলে যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ এই সময়ে পাকিস্তানের আটজন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একমাত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছাড়া সবাই ছিলেন অবাঙালী স্বার্থের প্রতিনিধি। চারজন রাষ্ট্রপ্রধানের সকলেই ছিলেন অবাঙালী ও উর্দু-ভাষী।[২] পূর্ববঙ্গের শাসক দলকে নিয়ন্ত্রণ করেছে পাঞ্জাবী শাসক চক্র। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার হলেই তারা খুশি থেকেছেন এবং পরিণামে বাঙালীদের কাছে অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। মুসলিম লীগের নেতারাও তা উপলব্ধি করেন এবং এ কারণেই ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন তারা বারবার পিছিয়েছেন।[৩] ১৯৪৯ সালে এই প্রদেশের উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের পর তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযান আরম্ভ করেন। বাংলার যে সব মুসলিম নেতা পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তাঁদেরকে ভারতের দালালরূপে চিহ্নিত করে তাঁদের উপর জেল-জুলুম চালানো হয়। অপরদিকে প্রদেশের অন্যান্য উপ-নির্বাচনও স্থগিত রাখা হয়। এমন কি এই প্রদেশের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্তও স্থগিত রাখা হয়। ফলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশে প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।[৪] মূলত কয়েকটি উপ-নির্বাচনে সরকারী দলের বিপর্যয় দেখে নির্বাচনের দিন পিছানো হয়েছিল।[৫] অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, একটা সময় দেখা গেল প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে চৌত্রিশটি আসন শূন্য পড়ে আছে।[৬] শেষ পর্যন্ত ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে।[৭]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকরা সর্বজনীন ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফল তাদের পক্ষে সন্তোষজনক হবে এ ভরসাও তারা করতে পারছিলেন না। এ সমস্যাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণ, পাকিস্তানের শাসক আমলাদের অধিকাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী যাদের কোনো রকম সমর্থন ছিল না পূর্ববঙ্গে অথচ পূর্ববঙ্গবাসীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। শাসকদের মধ্যে আবার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পাঞ্জাবীরা যারা সামরিক-বেসামরিক দু'ক্ষেত্রেই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক, যে সব রাজনৈতিক কারকরা সাধারণ নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিলেন তাদের সঙ্গে কোনো যোগ ছিল কিনা লিয়াকত হত্যায়? পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হন ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর। ঐ সময় লিয়াকত পরিকল্পনা করেছিলেন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে নির্বাচনের। উচ্চপদস্থ আমলারা কখনই লিয়াকত হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটনে অগ্রসর হয় নি। বরং বলা যেতে পারে, লিয়াকতের মৃত্যু সুযোগ করে দিয়েছিল উচ্চপদস্থ আমলাদের ক্ষমতা সংহতকরণে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতারাও যোগ দিলেন এ খেলায়। ঐ সময় পূর্ব বাংলায় তিনজন রাজনীতিবিদের পক্ষে ছিল জনসমর্থন। তাঁরা হলেন– আবুল কাশেম ফজলুল হক যিনি পরিচিত ছিলেন 'শেরে বাংলা' নামে, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তাঁরা তখন কিছুই করেন নি। ক্ষমতা ক্ষুধার্ত আমলাদের অবৈধ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের তারা বিরোধিতা করেন নি।[৮]

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সংকট পথ প্রশস্ত করেছিল দু'টি রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টিতে, যে দু'টি সংগঠন অচিরেই পূর্ববঙ্গের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। এ দু'টি দল হল আওয়ামী মুসলিম লীগ– যা গঠিত হয় ১৯৪৯ সালে এবং কে এস পি– যা গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক। কে এস পির নেতা ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। নব গঠিত দল দু'টি সহজেই পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের বৈষম্য তুলে ধরতে পেরেছিল। মূল বিষয়গুলো ছিল শাসন করছে অবাঙালী বিশেষ করে পাঞ্জাবী আমলারা। পূর্ববঙ্গের পাট বিক্রি করে অর্জিত হয় বৈদেশিক মুদ্রা আর তা ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নে। যে ভোগ্যপণ্য আমদানী করা হয় তা প্রথমে আসে করাচীতে তারপর ফের রফতানী করা হয় পূর্বাঞ্চলে। দাম তখন তার বৃদ্ধি পায়। সরকারী নথিপত্রেই এর প্রমাণ ছিল ভূরি ভূরি।[৯] জাতীয় পরিষদের নির্বাচনগুলো ১৯৫০-১৯৫১ সালে নিষ্পন্ন হলেও পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচন ১৯৫৪ সালের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নি। পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগের দুর্বল নেতৃত্বের স্বার্থেই যে এই নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছিল তা অতি স্পষ্ট। ১৯৫৪ সালেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো কিনা সে সম্বন্ধে অনেকের মনে সংশয় ছিল। একটি বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই এই নির্বাচন ত্বরান্বিত হয়।

কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন চক্র খাজা নাজিমউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে অপসারণ করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে মনে করেছিলেন যে, এই পরিবর্তনের পরে পূর্ব-পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে মুসলিম লীগ জয়লাভ করবে; কারণ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে খাজা নাজিমউদ্দীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। স্মর্তব্য যে, ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় চক্রের প্ররোচণায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে ঘোষণা দেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এক রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি বরকত-সালাম-রফিক-জব্বারসহ নাম না-জানা আরও অনেকে পুলিশের গুলোতে নিহত হন এবং মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, মওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, শামসুল হকসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। খাজা নাজিমউদ্দীনের দুর্বল নেতৃত্ব এই ধর-পাকড় ও রক্তারক্তির ফলে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তায় একদম ধ্বসে পড়ে; তা ছাড়া, পূর্ব-পাকিস্তানে শেরে বাংলা ফজলুল হক, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীর যুক্ত নেতৃত্বে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে, এই ধারণা কেন্দ্রীয় চক্রের ছিল না। কারণ সেই সময় শেরে বাংলা ফজলুল হক পূর্ব-পাকিস্তানে এ্যাডভোকেট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি বৃদ্ধ বয়সে এই পদ ত্যাগ করে আবার রাজনীতিতে অবতীর্ণ হবেন এবং শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আঁতাত করবেন, এটা ছিল তাদের কল্পনাতীত।[১০] ১৯৫৪ সালে, নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছিল মুসলিম লীগের কপালে কী আছে। গঠিত হল যুক্তফ্রন্ট যার প্রধান শরিক ছিল আওয়ামী লীগ (মুসলিম শব্দটি তখন বাদ গেছে) ও কে এস পি। ফ্রন্টে আরও ছিল ডানপন্থী নিজাম-ই-ইসলামী ও বামপন্থী দল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার হল 'একুশ দফা' যা রচনা করেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ এবং যা তাঁর ভাষাই "পরবর্তীকালে পূর্ব-বাংলার ছাত্র-জনতার জীবন-বাণী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট তুলে ধরেছিল বাঙালীদের ওপর পাঞ্জাবীদের আধিপত্যের কথা। বাংলা ভাষার অবমাননার কথা, বৈষম্যের কথা। সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হল মুসলিম লীগ। ৩১০ সদস্যের আইন সভায় মুসলিম লীগ পেল মাত্র ৯টি আসন এবং শতকরা আড়াইভাগ ভোট।"[১১] মার্চ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১২]

১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪-এর নির্বাচনে মুসলমান আসনে ৩৭.৬০% ভোট পড়ে।[১৩] তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দুররস্থা, মহিলাদের ভোটকেন্দ্রে আসতে অনীহা প্রভৃতি কারণে ভোটদানের হার কম ছিল। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা শুরু হয় ১৫ মার্চ (১৯৫৪) থেকে। সরকারী ফলাফল ঘোষিত হয় ২রা এপ্রিল।

সারণি ১.১ : ৭২টি অমুসলমান আসনের ফলাফল[১৪]

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪টি আসন
তফশিলী ফেডারেশন	২৭টি আসন (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ)
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১৩টি আসন (এর মধ্যে গণতন্ত্রী দল ৩টি)
কম্যুনিস্ট পার্টি	৪টি আসন
বৌদ্ধ	২টি আসন
খ্রিষ্টান	১টি আসন
স্বতন্ত্র	১টি আসন
মোট	৭২টি আসন

সারণি ১.২ : ২৩৭টি মুসলমান আসনের ফলাফল[১৫]

যুক্তফ্রন্ট	২১৫টি আসন
মুসলিম লীগ	৯টি আসন
খেলাফতে রব্বানী পার্টি	১টি আসন
স্বতন্ত্র	১২টি আসন
মোট	২৩৭টি আসন

মুসলমান আসনের স্বতন্ত্র সদস্যদের ৮জন যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন, ফলে যুক্তফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা ২২৩-এ উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করলে ঐ দলের সদস্য সংখ্যা ১০ হয়।[১৬] মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন এবং আরও চারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং কমপক্ষে ৫০জন মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। নূরুল আমিন নিজ আসনে খালেক নেওয়াজ খান নামক ২৫ বৎসর বয়সী এক আইনের ছাত্রের নিকট প্রায় ৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।[১৭] তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির আব্দুল মান্নান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র তাজউদ্দীন আহমদের নিকট প্রায় ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। মুসলিম লীগ সমর্থিত তফশিলী জাতি ফেডারেশন (বারুরী গ্রুপ)-এরও ভরাডুবি ঘটে।

মুসলিম লীগের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ও ফলাফল বিশ্লেষণ

নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়-বরণ করে মুসলিম লীগ দল ও সরকার নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করে। স্বয়ং নূরুল আমিন সাংবাদিকদের নিকট বলেন, ‘পূর্ববঙ্গের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় নি।’ পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি গিয়াসুদ্দিন পাঠান ৯ই মার্চ (১৯৫৪)

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গের গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে মুসলিম লীগের অভিযোগ জানান। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি মঈনউদ্দিন আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন, "লীগ মনোনীত প্রার্থী ও তাঁহাদের এজেন্টদের নিকট হতে লীগ অফিসে এই মর্মে বহু লিখিত অভিযোগ এসেছে যে, অনেক প্রিসাইডিং অফিসার ও অনেক পোলিং অফিসার প্রকাশ্যে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। কতিপয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বহু যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। তারা নিজেদের দলের জন্য ক্যানভাস করে। অধিকন্তু কয়েকজন মুসলিম লীগ ভোটারকেও টানাহেঁচড়া করেন।"[১৮]

'আজাদ' পত্রিকা ৯ মার্চের সংখ্যায় 'নির্বাচন সুষ্ঠু' হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিল, মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় বুঝতে পেরে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই ঐ পত্রিকায় **১১** মার্চ 'তদন্ত ও প্রতিকার' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় লেখা হয়। ঐ সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "যেসব ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাদের সুমহান দায়িত্ব পালন করেন নি কিংবা ইচ্ছা করে অন্যায় এবং পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করেছেন তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।"[১৯] এ নির্বাচনে মধ্যবর্তী কারকদের মধ্যে ছাত্ররা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা স্বেচ্ছায় গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল নির্বাচনী প্রচারে। যুক্তফ্রন্টের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যেও একটি বড় অংশ ছিল মধ্যবর্তী কারকদের। এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ সিভিল সোসাইটির জয় যেখানে প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও প্রান্তিক কারকেরা উৎসাহে অংশ নিয়েছিল।[২০]

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পিছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। **১৯৪৭** সালের **১৪ই** আগস্টে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে দলের নেতৃবর্গ নিজেদের ভাগ্যগড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়ে অবহেলা করেন। ফলে দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দলের অনেক পুরাতন এবং জনপ্রিয় নেতা ও সদস্য বিভিন্ন কারণে দলত্যাগ করেন এবং নতুন দল (যেমন আওয়ামী মুসলিম লীগ) গঠন করেন। ফলে দলের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া মুসলিম লীগ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে বহুমুখী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, সে জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগকেই দায়ী করেন এবং নির্বাচনে তার প্রভাব পড়ে। মুসলিম লীগের পূর্ব বাংলা শাখা এবং পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকার এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। লবণ, কেরোসিন ও সরিষার তেল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহবধূরাও মুসলিম লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। তাছাড়া তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না করে আপামর জনসাধারণকে ক্ষুব্ধ করে। দীর্ঘ ৭ বছরেও সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশবাসীর নিকট দলের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়।

ফলে নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কোনো বক্তব্যই জনগণকে খুশি করতে পারে নি। অপরপক্ষে, ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহ্‌রাওয়ার্দী– এই তিনজনের নির্বাচনী প্রচারণার ফলে দেশময় যে প্রাণচাঞ্চল্যের বন্যা এল, তাতে মুসলিম লীগের মতো ক্ষমতাসীন দল ভেসে গেল।

মুসলিম লীগের মুখপত্র *আজাদ* পত্রিকা এই দলের পরাজয়ের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করে– "সাধারণভাবে লীগের পরাজয়ের যেসব কারণ সর্বত্র আজকাল আলোচিত হইতেছে সেসবের ভিতর রহিয়াছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের এবং লীগের কতিপয় নীতি ও কার্যের প্রতিবাদ। লীগের পরাজয়ের কারণগুলো হচ্ছে : (১) বাংলাভাষার দাবীর প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিন সরকারের দমন-নীতি; (২) পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের নীতি, সমদর্শিতার অভাব; অবিচার ও শোষণ নীতি; (৩) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসন না-দেওয়ার প্রস্তাব ও মনোভাব; (৪) পূর্ব বাংলার জনগণের আর্থিক দুর্দশা; (৫) শাসনতন্ত্র রচনার বিলম্ব; (৬) লীগের গণসংযোগের অভাব; (৭) লীগ ও মন্ত্রিত্বের একীকরণ; (৮) লীগের ভিতর বিপুল ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বের অভাব; (১০) দুর্নীতি দমনে সরকারী ব্যর্থতা এবং এইভাবে এই তালিকায় আরও কারণ যোগ করা যাইতে পারে।"[২১]

৫৪-এর নির্বাচন পর্যালোচনা

পূর্ব বাংলায় ৫৪-এর নির্বাচন ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন হয়েছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ। নির্বাচনে সরকারী দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল অবাক করা ঘটনা। নির্বাচনে তৎকালীন সরকার কারচুপির প্রচেষ্টা করে নি। কিন্তু দেখাগিয়েছিল যে পূর্ব বাংলায় নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে মুসলিম লীগ বারবার নির্বাচন পিছিয়ে। একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট বন্ধ হতে পারে না, একটি নির্দিষ্ট সময় থাকবে তারপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট দিনে ভোট হবে কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর সব দেশেই নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ থাকে অর্থাৎ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে একটি ব্যতিক্রমী বিষয় হল সরকারী দল মুসলিম লীগ দাবী করে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নি। এবং লক্ষণীয় বিষয় কারচুপির এই অভিযোগটি করছে সরকারী দল। ৫৪-এর নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল এবং তারা ওই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার দাবীর সপক্ষে ভোট দিয়ে জনগণ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে ওই দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে পাকিস্তানের কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলায় সেই-যে মুসলিম লীগের পতন ঘটল, এরপর আর কখনও এখানে মুসলিম লীগ শক্তিশালী হতে পারে নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকারগঠন ও পশ্চিমা শাসকদের চক্রান্ত

১৯৫৪ সালের এই বিজয় ধরে রাখা দূরের কথা তা সংহতও করতে পারে নি পূর্ববঙ্গের রাজনীতিকরা। শাসক চক্রের চক্রান্ত তারা রুখতে পারে নি। এই শাসক চক্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল আমলা যারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণে, দীর্ঘদিন ধরে তারা অভ্যস্ত ছিল জনসমর্থনহীন মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণে থাকতে। যুক্তফ্রন্টের জনসমর্থনের ভিত্তি ছিল বিরাট সুতরাং পাকিস্তানের শাসক আমলারা বুঝতে পারছিল না একতরফাভাবে ক্ষমতাচ্যুত না করে কীভাবে এর ওপর আধিপত্য বিস্তার করা যায়। যুক্তফ্রন্টকে অপসারণের অন্য আরেকটি কারণ ছিল। পাকিস্তান তখন অপেক্ষা করছিল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তিতে উপনীত হতে। এ চুক্তি হলে আমলাচক্রের হাতে আসবে প্রচুর সম্পদ এবং যুক্তফ্রন্ট ছিল এ ধরনের চুক্তির বিরুদ্ধে।

প্রাথমিকভাবে, আমলাচক্র চাইল যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরাতে। তারা জানত, যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মতবিরোধের কথা। এ লক্ষ্যে নির্বাচনের পর শাসকরা ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান জানালেন। যদিও যুক্তফ্রন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল আওয়ামী লীগের। এতে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হল মনোমালিন্যের, কারণ তখনও ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হন নি। নেতা নির্বাচিত হলেন ২রা এপ্রিল ১৯৫৪ সালে। ৩রা এপ্রিল মধ্যরাতের মধ্যে গর্ভনর বললেন মন্ত্রিসভার নাম দিতে। মধ্যরাতের মধ্যে ফজলুল হক মাত্র তিনজনের নাম স্থির করতে পারলেন যাঁদের একজনও আওয়ামী লীগের ছিলেন না। ১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিলের আগে ও পরে মন্ত্রিসভা নিয়ে নানারকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলে। ফলে, ভাসানী ও ফজলুল হকের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। বস্তুত মন্ত্রিসভা গঠন নিয়েই বলা যেতে পারে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। ফজলুল হকের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও স্বার্থ ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হলেন।[২২] পরবর্তীকালে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ বিরোধের নিস্পত্তি ঘটে। প্রথম দফায় মন্ত্রিসভা গঠনের এক মাস বার দিন পর ১৫ই মে তা সম্প্রসারিত হয়। এবার মন্ত্রিসভায় আরও ১০জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হন ৭জন আওয়ামী লীগের, ৩জন কৃষক-শ্রমিক পার্টির।[২৩] নির্বাচিত হওয়ার পর ফজলুল হক ৩০শে এপ্রিল সরকারী সফরে কলকাতা যান এবং এক সংবর্ধনা সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগ-আপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙালীত্বকে কোনো শক্তিই কোনো দিন ভাগ করতে পারবে না। দুই বাংলার বাঙালী চিরকাল বাঙালীই থাকবে।'[২৪] ফজলুল হকের এ সব মন্তব্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তথা পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে অপসারণের উপায় খুঁজে পেল। মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরাতে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখল। তারা আদমজী জুট মিলে, কর্ণফুলী পেপারস মিলে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপর দোষ চাপাল।[২৫] এরপরেও ক্ষান্ত হল না, ফজলুল হককে বেকায়দায় ফেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কাজে লাগাল করাচীতে নিযুক্ত *নিউইয়র্ক টাইমসের* সংবাদদাতা জন পি ক্যালহানকে। ২০শে মে ক্যালহানের নেওয়া ফজলুল হকের একটি স্বাক্ষাৎকার ছাপা হল ঐ কাগজে। রিপোর্টের মূল বিষয় ছিল, ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা চান, কেননা শুধু ভৌগোলিক দিক দিয়েই পাকিস্তানের দু'টি অঞ্চল শুধু আলাদাই নয়, এর অর্থনীতি,

সংস্কৃতি সব কিছুই আলাদা। ফজলুল হক এ রিপোর্ট মিথ্যার বেসাতি হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিবাদ জানায়। তিনি বলেন, 'পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের কথা তিনি বলেছেন স্বাধীনতার কথা নয়।' কিন্তু ক্যালাহান স্বীকারই করলেন না যে তাঁর রিপোর্ট তথ্যগত ভুল আছে।[২৬]

কেন্দ্রীয় সরকার আসল উদ্দেশ্য ধামাচাপা দেওয়ার জন্য হক মন্ত্রিসভা সর্ম্পকে নানারকম কটূক্তি করতে লাগে। বলা হল এ মন্ত্রিসভা শুধু অক্ষমই নয় বরং জাতীয় সংহতির প্রতি হুমকিস্বরূপ, কারণ এ সরকার কমিউনিষ্ট ও ভারতীয় এজেন্টদের আশ্রয়দাতা। ৩০ মে, ১৯৫৪ সালে কেন্দ্র যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা অপসারণ করল।[২৭] এভাবে সরকার গঠনের ৫৬ দিনের মধ্যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম হয়।[২৮] ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হয় যার মেয়াদ ছিল স্বল্পকালীন। পরবর্তী বছরে পুনরায় সরকার গঠিত হয় তবে ফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ বিভেদের কারণে অর্জিত ঐক্য বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যুক্তফ্রন্টের সংহতি বিনষ্ট হলে কোয়ালিশন রাজনীতি, দুর্বল দল ব্যবস্থা এবং অস্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা পায়।[২৯] ফজলুল হককে কেন্দ্রীয় সরকার 'বিশ্বাস-ঘাতক' বলে চিহ্নিত করে। বলা হল আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তার সরকার ব্যর্থ এবং তিনি প্রদেশকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছেন।[৩০] ফজলুল হকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল তার যে কোনো ভিত্তি ছিল না তা প্রমাণিত হল তাঁকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও পূর্ববঙ্গের গর্ভনর হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, হক মন্ত্রিসভা অপসারণের ফলে জোরালো কোনো প্রতিবাদ হয় নি। বরং অনেক রাজনীতিবিদ নিজ সামান্য স্বার্থে এমন আচরণ করেছে যা সিভিল সমাজের বদলে আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকার গঠনে সাহায্য করে। অনেকে আঁতাত করে হতে চেয়েছেন ক্ষমতার অংশীদার এবং এ ধরনের আচরণই উন্মুক্ত করেছিল ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করতে।[৩১] ১৯৫৪ সালের এতবড় বিজয় যা ছিল সিভিল সমাজের বিজয় তা কেন রাজনীতিকরা ধরে রাখতে পারলেন না? কেন হটে আসতে হল সিভিল সমাজকে? এবং এর জন্য কী চরম মূল্য দিতে হয়েছিল? এ সব প্রশ্নের উত্তরের ইংগিত পাওয়া যায় আবুল মনসুর আহমদের লেখায়। তাঁর উদ্ধৃতি, "যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে পূর্ব বাংগালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সৌভাগ্য সূর্য উদিত হইয়াছিল, প্রভাতেই এমনি করিয়া তাতে গ্রহণ লাগিল। পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে, সে গ্রহণ আজও ছাড়ে নাই। পিছনের দিকে তাকাইয়া এত দিন পরেও আজ মনে হয়, যদি তিন প্রধানের বিরোধ না হইত, যদি যুক্তফ্রন্টের সর্বসম্মত মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিত, যদি হক সাহেব ও শহীদ সাহেব স্ব স্ব প্রিয়পাত্রের জন্য যিদ না করিতেন, যদি মওলানা ভাসানী নিরপেক্ষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, যদি হক সাহেব লিডার নিযুক্ত হইয়াই গণ-পরিষদের মেম্বরগিরি নিজে ছাড়িতেন এবং অন্যান্যদের ছাড়িবার নির্দেশ দিতেন, যদি তিনি ২১ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে ধীরে ও দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেন, যদি হক সাহেব কলিকাতা সফরে গিয়া রাজনৈতিক দুশমনদের অজুহাত না দিতেন, তবে পূর্ব বাংলার ভাগ্যে কি কি কল্যাণ হইতে পারিত তা আজ সহজেই অনুমেয়। পূর্ব বাংলার সরকারের জনপ্রিয়তার সঙ্গে তার ঐক্য ও স্থায়িত্বের মুখে নির্বাচনে পরাজিত সরকারী দল আমাদের দাবী মানিয়া লইতেন,

গণপরিষদে নয়া নির্বাচন হইত, নয়া নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা অবিলম্বে পূর্ব বাংলার গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচিত হইত; পাকিস্তানে গণতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে রূপায়িত হত পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান চরম দুর্ভাগ্যসমূহের একটিও ঘটিতে পারিত না।"[৩২]

১৯৫৪ সালের ঘটনাই আমরা দেখি ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আঁতাত করছে কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য দেখা দেয়। এখনো একই ধরনের বিষয় আমরা লক্ষ্য করি যে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থে কীভাবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বা পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গে কোনো দলীয় রাজনৈতিক সরকার স্বাধীনভাবে কাজ করুক তা তারা চায় নি। বাংলাদেশ আমলেও এই ধারাটি অব্যাহত থাকে। রাজনৈতিক সরকার যাতে শাসন করতে না পারে সে ব্যাপারে আমলারা বিশেষ করে সামরিক আমলারা পাকিস্তান আমলকে অনুকরণ ও অনুসরণ করেছে। এখনকার রাজনীতিতেও এই বিষয়টি বিরাজমান।

রাজনীতিবিদদের অগণতান্ত্রিক আচরণ

পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদে বাঙালী মুসলিম লীগ সদস্যরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু প্রাদেশিক নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়ায় ও যুক্তফ্রন্টকে অন্যায়ভাবে অপসারণ করায় তাদের জনপ্রিয়তা ও সম্মান হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে মুসলিম লীগ সদস্যরা উদ্যোগ নিলেন ১৯৩৫ সালের 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' সংশোধন করার। এই 'অ্যাক্ট' এর একটি ধারা অনুযায়ী যে-কোনো মন্ত্রিসভা বাতিল করতে পারতেন গভর্নর জেনারেল। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গুলাম মহম্মদ তখন রাজধানীর বাইরে ছিলেন। সদস্যরা ধারাটি সংশোধন করতে চাইলেন এভাবে যে–প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকে তবে তাঁকে অপসারণ করা যাবে না। কিন্তু গুলাম মহম্মদ এ ধরনের উদ্যোগ মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। ১৯৫৪ সালের ২৩শে অক্টোবর তিনি গণপরিষদ বাতিল করে দিলেন। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা অন্যায়ভাবে অপসারণের পরও সিভিল সমাজ থেকে প্রতিবাদ না আসায় তিনি আরেকটি অন্যায় করার সাহস পেয়েছিলেন। এবং এ অন্যায় করেও তিনি জিতে গেলেন। কারণ এরও কোনো প্রতিবাদ হল না। প্রাথমিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের কাছে নতি স্বীকার করল।[৩৩] গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার আগে ও পরে পূর্ববঙ্গের রাজনীতিকরা অনেক ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছেন। নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করেন নি। পূর্ববঙ্গের আওয়ামী লীগের একজন নেতা আতাউর রহমান খানের কাছে, গুলাম মহম্মদ গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার আগে সমর্থন চেয়েছিলেন। আতাউর রহমান এই শর্তে রাজী হয়েছিলেন যে, অতি শীঘ্র নতুন নির্বাচন দিতে হবে এবং পূর্ববঙ্গে জনসমর্থিত সরকার বসাতে হবে। ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিতে আর যাই হোক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে নেওয়া কষ্টকর। অন্যদিকে, গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার পর যুক্তফ্রন্ট যাতে পুনরুজ্জীবিত করা যায় তার চেষ্টাও

Dhaka University Institutional Repository

চলেছিল। গুলাম মহম্মদের তখন পূর্ববঙ্গ সফরের কথা। অনেকের মনে এ ধারণা জন্মেছিল গুলাম মহম্মদকে যে বেশী খুশি করতে পারবেন তিনিই হয়ত মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এ পটভূমিকায় যুক্তফ্রন্টের নেতারা বৈঠকে বসলেন গুলাম মহম্মদের অভ্যর্থনার বিষয় আলাপ করতে। গুলাম মহম্মদ যেদিন এলেন সেদিন দেখা গেল আতাউর রহমান খান ও এ.কে. ফজলুল হকের মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে গেছে কে গভর্নর জেনারেলকে আগে মালা পরাবেন তা নিয়ে। কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, "এটা শুধু নেতৃবৃন্দের পক্ষেই অবমাননাকর ছিল না, সারা বাংলার আত্মসম্মানে আঘাত করেছিলেন নেতারা, শুধু মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য।"[৩৪]

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদকে ধরাশায়ী ও সামান্য কিছু পাওয়ার আশায় আমলাদের সঙ্গে আঁতাত করে রাজনীতিবিদগণ। কয়েকজন মাত্র নেতা, যেমন– মওলানা ভাসানী ছিলেন ব্যতিক্রম। কিন্তু, ঐ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ধরনের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে নিশ্চুপ থাকাটাও ছিল একধরনের মৌন সহযোগিতা। যুক্তফ্রন্ট যখন অপসারিত হয় ভাসানী তখন ইউরোপে। এ খবর শুনেই তিনি আর ঢাকা না ফিরে কলকাতায় চলে গেলেন এবং সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কারণ, ইস্কান্দার মীর্জা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁকে গুলি করে হত্যা করবেন। পূর্ববঙ্গের তৎকালীন তিনজন নেতা– ভাসানী, ফজলুল হক ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর মধ্যে, ভাসানীরই সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা ছিল আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার। কিন্তু, ঐ সময় অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে ভাসানীর পশ্চাদপসারণ ছিল সিভিল সমাজের পশ্চাদধাবনের প্রতীক। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন পশ্চিমা আমলাদের সঙ্গে সমঝোতা করে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী হলেন তখন ভাসানী কলকাতা থেকে ফিরলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী নিজে কলকাতা গিয়ে ভাসানীকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাসানীই ছিলেন একমাত্র নেতা যার ইংরেজ আমল থেকে দীর্ঘকাল আত্মত্যাগের উদাহরণ ছিল। সুতরাং আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বৈরাচার ও হুমকি যদি তাঁকে কাবু করতে পারে তা হলে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য নেতাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।[৩৫]

যুক্তফ্রন্টের নেতাদের পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থ বিসর্জন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

শুধুমাত্র কিছু দলীয় সুবিধার কারণে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল অথচ এর সৃষ্টি এবং জয় হয়েছিল আদর্শ ও নীতির কারণে। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক শাসকচক্রের পক্ষে শাসনতন্ত্র রচনার সময় এমন সব ধারা রাখা সম্ভব হয় যাতে যুক্তফ্রন্টের স্বায়ত্তশাসনের দাবী উহ্য থাকে এবং স্বাভাবিকভাবে আইনসভায় পূর্ববঙ্গের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কথা তা থেকে বঞ্চিত হয়। আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহ্‌রাওয়ার্দী তৈরী করলেন শাসনতন্ত্রের খসড়া (১৯৫৬ সালে যা গৃহীত হয় পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান রূপে) এবং সে খসড়ায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কোনো উৎসাহই দেখালেন না অথচ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তা ছিল একটি দাবী। বরং পশ্চিম পাকিস্তানকে এক 'ইউনিট' করার প্রস্তাবে সমর্থন করলেন। এক ইউনিটের অর্থ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আসন সংখ্যা সমান করে দেওয়া। শুধু তাই নয়, আইনমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিতে

উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন অথচ ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্ট তা জোরালোভাবে বিরোধিতা করেছিলেন।[৩৬] নতুন গণপরিষদ আহ্বানে গুলাম মহম্মদ মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। ফেডারেল কোর্ট পরামর্শ না দিলে তিনি হয়ত দ্বিতীয়বার গণপরিষদ আহ্বানও করতেন না। ৭ই জুলাই, ১৯৫৫ সালে গুলাম মহম্মদ দ্বিতীয় গণপরিষদ আহ্বান করেন। পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে সমসংখ্যক সদস্য এতে যোগ দিলেন এবং এভাবে পূর্ববঙ্গের রাজনীতিবিদগণ আবার পশ্চিমা শাসকচক্রের আধিপত্য মেনে নিলেন। প্রতিরোধ করলে যেখানে তারা পেতেন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেখানে তারা মেনে নিলেন সংখ্যা সাম্য। ১৯৫৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর "এস্টাবলিশমেন্ট অফ ওয়েষ্ট পাকিস্তান বিল" পাস হল। অনেকে আশা করেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলো যেমন, সিন্ধু বা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এর বিরোধিতা করবে। কেননা এক ইউনিটের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে পাঞ্জাবী আমলাচক্রের হাতে। এই আশংকায় পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্র এ দু'টি অঞ্চলে দমন-নিপীড়নের আশ্রয় নিল। এদিকে ফজলুল হক ও তাঁর অনুসারীরা আমলাচক্রের সঙ্গে হাত মেলানোতে অবস্থা আমলাদেরই অনুকূলে যায়।[৩৭] পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ও গণপরিষদে সংখ্যার সাম্যের কারণে শাসক আমলাদের বাংলা ভীতি আর রইল না। ফলে, একটি শাসনতন্ত্র রচনাতেও আর দেরি হল না। ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান চালু হয়। সংবিধানে পূর্ববঙ্গের নাম বদলে রাখা হয় পূর্ব-পাকিস্তান। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে ইস্কান্দার মীর্জার সমর্থনে সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হলেন অথচ এর বছরখানেক আগেই ইস্কান্দার মীর্জা চৌধুরী মহম্মদ আলী সমর্থনে সোহরাওয়ার্দীকে হেনস্থা করেছিলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীও শাসক আমলাদের সন্তুষ্ট করে চলতে থাকে। ১৯৫৭ সালের ১৪ই জুন ঢাকায় এক বক্তৃতায় সোহ্‌রাওয়ার্দী ঘোষণা করেন, পূর্ব-পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন দাবীর ৯৮ ভাগ পেয়েছে । মীর্জা সোহরাওয়ার্দীকে এরই মধ্যে বদল করতে চাইলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী চাইলেন, আইনসভায় তাঁর শক্তি পরীক্ষা করতে কিন্তু মীর্জা এতে রাজী হলেন না কারণ তাতে গণপরিষদ হয়ে ওঠে নীতি নির্ধারক। তিনি বললেন, সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে হবে অথবা তাঁকে বরখাস্ত করা হবে। সোহ্‌রাওয়ার্দী পদত্যাগ করলেন। আই আই চুন্দ্রিগড় হলেন প্রধানমন্ত্রী; ৫৯ দিন পর প্রধানমন্ত্রী হলেন মালিক ফিরোজ খান নুন। ১৯৫৮ সালে শুধু ফিরোজ খান নুন কেন, স্বয়ং ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে দিয়ে গদি দখল করলেন আইয়ুব খান।[৩৮]

১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রবর্তিত হলে ফজলুল হক হলেন গর্ভনর জেনারেল এবং তার অনুগত আবু হোসেন সরকার হলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রাদেশিক সভায় আবু হোসেন সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে হবে তাই সিভিল সমাজের নৈতিকতা ভঙ্গ করে তারা বিরত থাকল আইনসভা আহ্বানে। একবার শুধু স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের জন্য সভা ডাকা হয়েছিল ।

মীর্জা ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সরকার মন্ত্রিসভা বাতিল করে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসালেন। মুসলিম লীগের ভাঙ্গন সৃষ্টি করে ইস্কান্দার মীর্জা 'রিপাবলিকান পার্টি' নামে এক নতুন দল গঠন করলেন। ডা. খান সাহেব হলেন এর নেতা। চৌধুরী মহম্মদ আলীর

প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এবং যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে হতাশ ও ক্ষুব্ধ মুসলিম লীগাররা এতে যোগ দিলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর রিপাবলিকান ও আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন করে সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করল।[৩৯]

১৯৫৭ সালের ১১ই অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে বললেন। আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে এর প্রতিবাদে হরতাল ডাকল। কিন্তু হরতাল ব্যর্থ হল কারণ সোহ্‌রাওয়ার্দীর জন্য তেমন সহানুভূতি অবশিষ্ট ছিল না। ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ, বাজেট তখনও পাস হয় নি এবং প্রাদেশিক আইনসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অধিবেশন চলবে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত, তখন আতাউর রহমান গর্ভনরকে অনুরোধ জানালেন সভা স্থগিত রাখতে। গর্ভনর ফজলুল হক এ দাবী প্রত্যাখান করে বললেন, পরিষদে আতাউরের সংখ্যাগরিষ্ঠাতা নেই। মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন গভর্নরকে বরখাস্ত করতে। ফজলুল হক পাল্টা শোধ হিসেবে আতাউর রহমানকে বরখাস্ত করে ৩১শে মার্চ আবু হোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করলেন। শুধু তাই নয়, স্পীকারের পরামর্শে সভা মুলতুবী করলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সেই রাত্রেই প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে ফোন করে জানালেন, গভর্নরকে বরখাস্ত না করলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন। প্রধানমন্ত্রী তখনই ফজলুল হককে বরখাস্ত করে মুখ্য সচিব হামিদ আলীকে পূর্ব-পাকিস্তানের অস্থায়ী গভর্নর নিয়োগ করলেন। ১লা এপ্রিল, অবাঙালী সি এস পি হামিদ আলী আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত করলেন। বারো ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রিত্ব হারালেন সরকার। হামিদ আলী গভর্নর হয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে আতাউর রহমানকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করলেন।

১৮ই জুন প্রাদেশিক আইনসভায় আতাউর রহমানের সরকার পরাজিত হয়ে ১৯শে জুন পদত্যাগ করল। ২০শে জুন আবু হোসেন সরকার হলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২১শে জুন তাঁর সরকার মুখোমুখি হল অনাস্থা প্রস্তাবের। সঙ্গে সঙ্গে অধিবেশন কক্ষে উদ্ভব হল এক অভাবনীয় পরিস্থিতির। শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব পাস হল, পদত্যাগ করলের আবু হোসেন সরকার। ২৫শে জুন প্রেসিডেন্টের আদেশে স্থগিত হল অধিবেশন। আওয়ামী লীগ অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নুনকে চাপ দিতে লাগল আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা নিয়োগে। এই চাপ সফল হল এবং ১৯৫৮ সালের ২৫শে জুলাই ক্ষমতা গ্রহণ করলেন আতাউর রহমান। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পক্ষে ও মীর্জার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। শেখ মুজিব এমনও বললেন যে, মীর্জা পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় সমস্যা, এবং পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে তিনি না থাকলে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ এ ধরনের প্রচারণা চালায়।

স্পীকার আব্দুল হাকিম ছিলেন কেএসপির। আওয়ামী লীগ চাচ্ছিল তাঁকে হটাতে, কারণ তাদের সন্দেহ ছিল স্পীকারের প্রশ্রয়ে বিরোধী দল শক্তি সঞ্চয় করে পতন ঘটাতে পারে আওয়ামী লীগের। আওয়ামী লীগ সে সময় দলীয় ছয়জন সংসদ সদস্যকে সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটারের পদ দেয়। এ কারণে, নির্বাচন কমিশন এক রায়ে জানাল যে, ছয়জনের আসন শূন্য হয়ে যাবে।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রভাবে ফিরোজ খান নুন কেন্দ্রীয় এক অনুজ্ঞা বলে নির্বাচন কমিশনের রায় কার্যকর করা থেকে বিরত থাকে। ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ অধিবেশন শুরু হলে, বিরোধী দল এটিকেই আলোচনার প্রধান বিষয় করে তুলল। তারা দাবী তুলল, ঐ ছয়জনের সদস্যপদ বাতিল করতে হবে। স্পীকার জানায় এ বিষয়ে তিনি তাঁর রুলিং দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল আইনসভার পরিস্থিতি। সভা যেন পরিণত হল যুদ্ধক্ষেত্রে। স্পীকার সভা ত্যাগ করলেন। পরে, তাঁর বিরুদ্ধে পাস হল একটি অনাস্থা প্রস্তাব। শুধু তাই নয়, আরেকটি প্রস্তাবও পাস হল তাঁর বিরুদ্ধে যার মূল বক্তব্য ছিল, স্পীকার 'পাগল'। ২৩শে সেপ্টেম্বর অধিবেশন বসলে দেখা গেল, বিরোধী দলের শক্তি হ্রাস পেয়েছে কারণ, আওয়ামী ইতোমধ্যে কয়েকজন কেএসপি সদস্যকে তাদের দলে টেনে নেয়। সরকার পক্ষ দাবী তুলল, ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী কাজ চালাবেন। বিরোধী দল তাতে আপত্তি তুলে বাধার সৃষ্টি করে। সরকার পক্ষ এমন ব্যবস্থা করল যাতে স্পীকার সভা কক্ষে প্রবেশ করতে না পারেন। শাহেদ আলী বসলেন স্পীকারের আসনে। বিরোধী দল ক্ষিপ্ত হয়ে শুরু করল ভাংচুর। শাহেদ আলী আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর স্থগিত হল আইনসভা। ২৬ শে সেপ্টেম্ব ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পরলোক গমন করেন।[৪০]

যুক্তফ্রন্ট শাসনকাল পর্যালোচনা

১৯৫৪ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে এই প্রদেশে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আসে। কিন্তু মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে এবং সর্বোপরি যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সংখ্যালঘু সংসদ সদস্যদের ঘন ঘন সমর্থন বদলের কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে থাকে। মাত্র চার বছরে সাতটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং তিনবার গভর্নরের শাসন জারী করা হয়। ফলে বহু প্রত্যাশিত ২১ দফার দাবীগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি এবং দেশের উন্নয়ন সাধনের যে সুযোগ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ পেয়েছিলেন তা তারা নিজেদের সংকীর্ণ দলীয়স্বার্থে কাজে লাগাতে পারেন নি। উপরন্তু যুক্তফ্রন্টভুক্ত একটি দলের (কৃষক-শ্রমিক পার্টির) এম.পি.-দের দ্বারা অন্যদলের (আওয়ামী লীগের) সমর্থিত স্পীকারকে পিটিয়ে হত্যা করা চুয়ান্নোর নির্বাচনে গঠিত আইন পরিষদের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।[৪১]

সামরিক শাসন জারী

স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যু মধ্যে দিয়ে সীমিত হয়ে এল পাকিস্তানে পার্লামেন্টের গণতন্ত্রের দিন। ভারসাম্য নিজের পক্ষ ঠিক রাখার জন্যে কেন্দ্রে ফিরোজ খান নুনকে প্রায়ই রদবদল করতে হচ্ছিল মন্ত্রিসভা। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগ দেয় নি যেহেতু সোহ্‌রাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করা হয় নি। তবে, ২রা অক্টোবর, ১৯৫৮ আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে যোগ দিল

মন্ত্রিসভায়। মন্ত্রী হলেন ছয়জন, এর মধ্যে তিনজন পূর্ণমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নুন মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। এক সময় দেখা গেল, পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী দু'জন– আমজাদ হোসেন ও হামিদুল হক চৌধুরী। ৭ই অক্টোবরে বিশৃংখলা দূর করে হামিদুল হক চৌধুরীকে দেওয়া হল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ৮ই অক্টোবর সকালে পত্রিকা মারফত জানা গেল, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করেছেন । তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন আইয়ুব খানকে। তিন সপ্তাহ পর মীর্জা নিজেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। জেনারেল আইয়ুব খান হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করেছেন। ক্ষমতার লোভে, কিছু পাওয়ার লোভে তারাও ইচ্ছেমতো ব্যবহৃত হয়েছেন। সামরিক আইন জারীর পর সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে পিছু হটে যায় এবং তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দূরের কথা প্রতিবাদও হয় নি। অন্য কথায় বলা যেতে পারে প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকদের আত্মমর্যাদাহীন আচরণে সিভিল সমাজের নৈতিক বল সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল।[৪২] পাকিস্তানের প্রথম দশকের রাজনীতি রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতার আবর্তে ঘুরপাক খায়। কেন্দ্র এবং প্রদেশে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণীত হওয়ার পরও তা লক্ষ্য করা যায়। সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন্দ্র এবং প্রদেশে তাই কার্যকরী হতে পারে নি। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতার সংসদীয় রীতিনীতি সম্বলিত সংসদ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ইতিবাচক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নি। এ রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ নিজেদের অনুকূলে নিতে পাকিস্তানের ভূস্বামী, আমলা এবং সামরিক বাহিনী কার্পণ্য করে নি। এভাবে সংসদীয় সরকার ও সংবিধানের অবসান ঘটিয়ে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করা হয়।[৪৩] বাঙালী পাকিস্তান এনেছিল আবেগ দিয়ে। আবেগটা ছিল এ রকম যে, সে মাথা তুলে দাঁড়াবে, গণতান্ত্রিক পরিবেশে তার সন্তান বড় হবে। শাসকরা তার তোয়াক্কা করে নি।[৪৪] ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সংসদের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল দুর্বল। মুসলিম লীগের একচেটিয়া মনোভাব সংসদকে নিয়ন্ত্রণসহ সরকার অভিমুখী করে রাখে। সংসদের স্পীকারও ঈপ্সিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় নি।[৪৫] ১৯৫৪ সালে যখন প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরোনো অত্যন্ত প্রতাপশালী মুসলিম লীগ, যারা এনেছিল পাকিস্তান– সে দলটি হয়ে গেল একেবারে নিশ্চিহ্ন। কিন্তু তৎকালীন প্রগতিবাদীদের অন্তর্কলহ গণধিকৃত মুসলিম লীগ ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের সমাজ, রাজনীতিতে বিভিন্ন স্বার্থকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি বা করতে চায় নি। ফলে সেই মুসলিম লীগ ও তাদের সহযোগীরা সৃষ্টি করল ১৯৫৮-র।[৪৬]

সংসদীয় সরকার ও সংবিধানের অবসান ঘটিয়ে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করা হয়। অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণের পর আইয়ুব খানের জন্য ক্ষমতা গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা জরুরী হয়ে পড়ে; তাই তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন, পূর্ববর্তী শাসনকালে দেশ ধ্বংসের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। আইয়ুব খান তার ক্ষমতা গ্রহণের আবশ্যকতা প্রমাণ করার জন্য বলেন যে, দেশের রাজনীতিবিদগণের ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থান্ধতা দুর্নীতি, দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা, দেশপ্রেমের

অভাব প্রভৃতি কারণে তারা দেশের গঠনমূলক কিছু করতে পারেন নি। সামরিক আইন জারীর কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় ১৫০জন সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং প্রায় ৬০০জন সাবেক জাতীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তদন্ত করে। রাজনীতিকগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ৭ই অক্টোবর 'নির্বাচিত সংস্থাসমূহ (অযোগ্যতা) আদেশ ১৯৫৯' [Elective Bodies (Disqualification) Order 1959] সংক্ষেপে EBDO এবং PODO (Public Office Disqualification Order) বা সরকারী পদ লাভে অযোগ্যতা সংক্রান্ত আদেশ নামে দু'টি আদেশ জারী করেন। এই আইনে কেউ দোষী হলে তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে দেশের যে-কোনো নির্বাচিত সংস্থার সদস্য হওয়ার অযোগ্য বলে গণ্য হবেন। অভিযুক্তরা অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হতেন। এবডো-র আওতায় সামরিক সরকার ৮৭জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে অভিযুক্ত করেন। তাদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, খান আব্দুল গাফফার খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রমুখ অন্যতম।[৪৭]

মৌলিক গণতন্ত্র

সংসদীয় সরকার ও সংবিধানের অবসান ঘটিয়ে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারীর সঙ্গে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সাংবিধানিক সরকার গঠন সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের শাসন সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যবস্থায় পরিচালিত হতে থাকে এবং সামরিক শাসক আইয়ুব খান অভিনব নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র চালু করেন।[৪৮] তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, পাকিস্তানের মতো একটি অনুন্নত, পশ্চাৎপদ, চরম দরিদ্র, অশিক্ষিত দেশে পাশ্চাত্য-ধাঁচের গণতন্ত্র উপযোগী নয়। এখানে তাঁর মতে, নিচ থেকে ওপরে, স্তরভিত্তিক পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রযোজ্য। সংক্ষেপে, এই হল আইয়ুবের তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' এর ধারণাগত ভিত্তি। মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালের ২৬শে অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' ঘোষণা করেন। এর দ্বারা দেশে ৫ স্তর বিশিষ্ট পিরামিড আকৃতির একটি কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। এই স্তরগুলো হচ্ছে ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল, বিভাগীয় কাউন্সিল ও প্রাদেশিক কাউন্সিল। ছোট ছোট শহরে টাউন কমিটি এবং বড় শহরে পৌরসভা গঠনের বিধান করা হয়। এই কাঠামোর সর্বনিম্নে গ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত ইউনিয়ন কাউন্সিল ও শহর এলাকার টাউন কমিটিগুলো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। এর উপরের স্তরগুলো পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে গঠিত। আইয়ুবের এই 'মৌলিক গণতন্ত্র' 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র' নামেও পরিচিত।

'মৌলিক গণতন্ত্র'; ব্যবস্থাধীনে পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) করে মোট ৮০,০০০ (আশি হাজার) ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে দেশে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। এদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন বলে বিধান করা হয়।[৪৯] আইয়ুব তাঁর 'মৌলিক গণতন্ত্রের' অধীনে ইউনিয়ন কাউন্সিল ব্যতীত অন্য সকল স্তর, দেশের

প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সবার জন্য পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। বস্তুত এ ব্যবস্থা না ছিল 'মৌলিক' না ছিল 'গণতন্ত্র'। গণতন্ত্রের মুখোশ পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক-বেসামরিক আমলাগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ ও কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তাই, যাতে দেশের চিহ্নিত বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকরী করে ফেলে স্থানীয় পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠীর একটি একক সমর্থন বলয় সৃষ্টি হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।[৫০]

মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন ও ১৯৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬০ সালের ১১ই জানুয়ারি সারা দেশে 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে জনসাধারণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণকে অর্থাৎ তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীগণকে (Basic Democrats বা B. D. Member) নির্বাচিত করেন। উক্ত নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের ৪০,০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০,০০০ মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের পর আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের ১৩ই জানুয়ারি The Presidential (Election and Constitutional) Order, 1960 জারী করেন। এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক গণতন্ত্রীগণ একটি রেফারেন্ডামের মাধ্যমে আইয়ুব খানকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করে তাকে একটি সংবিধান প্রণয়নের অধিকার প্রণয়ন করবেন। প্রেসিডেন্ট পদে তার মেয়াদকাল শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য হবে না, বরং ভবিষ্যতে প্রণীত সংবিধানে যে মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হবে– সেই প্রথম মেয়াদকালের জন্য। এইভাবে আইয়ুব খান সামরিক শাসনকে আইনসিদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সালে গোপন ব্যালটে 'হ্যাঁ-না' ভোট দিয়ে আইয়ুবকে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন। ৭৮,৭২০টি ভোট পড়ে, তন্মধ্যে হ্যাঁ-ভোট ৭৫,২৮২টি ছিল।[৫১] সামরিক শাসনের প্রতি যে মানুষের সমর্থন আছে তা আইয়ুব দেখাতে চাইলেন নির্বাচনের মাধ্যমে। ১৯৬০ সালের মধ্যে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন সমাপ্ত করলেন এবং আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর প্রদত্ত ভোটে ১৫ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৯৫.৬ শতাংশ।[৫২] ১৯৬০ সালের নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন।[৫৩]

পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্ররা যে-কোনো সময় সেনা শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে– এ বিষয়ে সামরিক শাসকরা সচেতন ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের নতুন গর্ভনর আজম খান বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রদের উপদেশ দিতে লাগলেন এ বলে যে, রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের এড়িয়ে চলার জন্য। কিছুদিনের মধ্যেই সুর বদলে গেল জেনারেলের। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে তিনি ছাত্রদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতে লাগলেন, যে সব ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হবে তাদের লাথি মেরে

বের করে দেওয়া হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, কারণ তাদের ওপর ভর করেছে শয়তান। সামরিক শাসনামলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইউনিয়নের কর্মচাঞ্চল্য খানিকটা থমকে গিয়েছিল যদিও ইউনিয়ন স্থাপনে সরকার বাধা দেয় নি। ছাত্ররা তখনও সরাসরি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নামে নি। কিন্তু, যখনই সুযোগ এসেছে তা যত সীমিতই হোক তা সদ্ব্যবহার করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।[৫৪] **১৯৬২** সালের ৩০শে জানুয়ারি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর গ্রেফতারের পরপরই ছাত্ররা তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দিল। তারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকল। সরকার ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের উপর দমন নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন স্থিমিত করতে সক্ষম হয়। ১লা ফেব্রুয়ারি, সোহ্‌রাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করল। সরকারী নির্দেশে পরদিন ধর্মঘটের খবর ছাপা হল না পত্রিকায়। দেয়ালে পোস্টার পড়ল– 'সামরিক শাসন নিপাত যাক'। সরকারী পত্রিকায় আগুন দেওয়া হল, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এই প্রথম প্রকাশ্যে রাস্তায় অনুষ্ঠিত হল বিক্ষোভ। ৩রা ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের উপাচার্যের সঙ্গে এলেন কলা ভবনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। বক্তৃতা করার আগেই ছাত্ররা আঞ্চলিক বৈষম্য, মৌলিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন শুরু করল এবং মন্ত্রী মাইকের সামনে দাঁড়াতেই লাঞ্ছিত হলেন। ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুয়ারি **১৯৬২** থেকে ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে। একদিনের ধর্মঘট চলল পাঁচ দিন।[৫৫] ৫ই ফেব্রুয়ারি রাতে, সরকারী নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে কার্জন হলে কয়েক হাজার ছাত্র জমায়েত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নিন্দা করে রাস্তায় নেমে আসে। পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান। ছাত্ররা ধাওয়া করল সেনাবাহিনীর জিওসি-কে। ৭ই ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব খানকে ঘেরাও করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হল। সাধারণ মানুষ যোগ দিল ছাত্রদের সঙ্গে, অনুষ্ঠিত হল বিশাল গণজমায়েত। পোড়ানো হল আইয়ুব খানের ছবি। সরকার রাজনৈতিক নেতা, যেমন– শেখ মুজিব এবং সাংবাদিক, যেমন– মানিক মিয়া ও ছাত্রদের গ্রেফতার করা হল। টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে জমায়েত মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হল। সেনাবাহিনী টহল দিতে থাকল রাস্তায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়ল মফস্বলে। ফলে, মফস্বলেও শুরু হল সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হল, আইয়ুব খান শক্তি প্রদর্শন করে সফল হল **১৯৬২** সালের ফেব্রুয়ারি অসন্তোষ দমনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, সামরিক শাসনামলের ইতিহাসে ঘটনাটি অসাধারণ। **১৯৬২** সালের ফেব্রুয়ারি অসন্তোষের সাফল্য ছিল সীমিত। কিন্তু এ অসন্তোষ সামরিক শাসনের ভিত্তিতে অভিঘাত হেনেছিল এবং তখন থেকে সামরিক শাসকদের ভূমিকা আক্রমণাত্মক থেকে হয়ে উঠেছিল রক্ষণাত্মক। আরও লক্ষণীয় যে, ছাত্রদের যখন হল ত্যাগ করতে বলা হয় তখন সাধারণ মানুষ বেদনা বোধ করেছিল। ছাত্ররা নিজেদের বাড়িঘর অর্থাৎ গ্রামেগঞ্জে, মফস্বল শহরে তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। শুরু হয়েছিল সামরিক শাসনবিরোধী প্রচারণা এবং এভাবে প্রস্তুত হয়েছিল সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের।[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষাণা করা হয়। ছাত্র ও রাজনীতিবিদরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন সম্মিলিত বিরোধী দল থেকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বোন ফাতেমা জিন্নাহ্ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রার্থী হবে। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা সম্মিলিত বিরোধী দলের বা 'কপ' (কম্বাইনড অপোজিশন পার্টি) প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পক্ষে শহর থেকে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে কাজ করেছেন।[৫৭] ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের একটি প্রস্তাব সমর্থন করে এবং 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party বা COP) নামে একটি জোট গঠন করে।[৫৮]

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল

১৯৬৪ সালে নভেম্বর মাসে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কপ দাবী করে যে পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৬৫ ভাগ ও পূর্ব-পাকিস্তানে শতকরা ৮৫ ভাগ নির্বাচতি মৌলিক গণতন্ত্রী তাদের দলের, অপরপক্ষে কনভেনশন মুসলিম লীগ দাবী করে যে পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের প্রার্থী যথাক্রমে শতকরা ৮৩.১ এবং ৮৫ ভাগ।[৫৯] এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

সারণি ১.৩ : ৮ জানুয়ারি (১৯৬৫) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচনী ফলাফল নিম্নরূপ :[৬০]

প্রদেশ	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা	অবৈধ ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত বৈধ ও অবৈধ ভোটের মোট সংখ্যা	প্রত্যেক প্রার্থীর লব্ধ ভোটের শতকরা হার
পূর্ব-পাকিস্তান	১. আইয়ুব খান ২. জনাব কে.এম. কামাল ৩. মিয়া বশীর আহমদ ৪. মিস ফাতিমা জিন্নাহ্	২১,০১২ ৯৩ ১১ ১৮,৪৩৪	২৭৪	৩৯,৮২৪	৫৩.১২ ০.২৩ ০.০২ ৪৬.৬০
পশ্চিম পাকিস্তান	১. আইয়ুব খান ২. জনাব কে.এম. কামাল ৩. মিয়া বশীর আহমদ ৪. মিস ফাতিমা জিন্নাহ্	২৮,৯৩৯ ৯০ ৫৪ ১০,২৫৭	৫৩৬	৩৯,৮৭৬	৭৩.৫৬ ০.২৩ ০.১৪ ২৬.০৭
পাকিস্তান সর্বমোট	১. আইয়ুব খান ২. জনাব কে.এ. কামাল ৩. মিয়া বশীর আহমদ ৪. মিস ফাতিমা জিন্নাহ্	৪৯,৯৫১ ১৮৩ ৬৫ ২৮,৬৯১	৮১০	৭৯,৭০০	৬৩.৩১ ০.২৩ ০.০৮ ৩৬.৩৬

১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাধারণ জনগণের মধ্যে মিস ফাতিমা জিন্নাহ্‌র পক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলেও নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, আইয়ুব খান যেখানে ভোট পান ৪৯,৯৫২; মিস ফাতিমা সেখানে মাত্র ২৮,৬৯১ ভোট পান।[৬১] প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ৯৯.৬২ ভাগ। আইয়ুব খান বিজয়ী হয়েছিলেন ৬৩ ভাগ পেয়ে আর ফাতেমা জিন্নাহ্‌ পেয়েছিলেন ৩৬ ভাগ। পূর্ব-পাকিস্তানের ১৭টি জেলার মধ্যে ১৩টিতে জিতেছিলেন আইয়ুব খান। এতদ্‌সত্ত্বেও লক্ষণীয় যে, আইয়ুবের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রবল চাপ থাকা সত্ত্বেও ৩৬.৬০ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্রী আইয়ুবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে এ সংখ্যা ছিল ২৬.০৭ ভাগ। মৌলিক গণতন্ত্রীরা তাদের এতসব সুযোগ-সুবিধা হাতছাড়া করে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন এটা ভাবার কোনো কারণ ছিল না। কারণ, ফাতেমা জিন্নাহ্‌ জিতলে, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। মৌলিক গণতন্ত্র থাকবে না। তবু, আইয়ুববিরোধী ভোটের সংখ্যা এটাই প্রমাণ করে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের সিভিল সমাজ পিছুহটে যায় নি। ছাত্রদের কৃতিত্ব এই যে, তারা আইয়ুববিরোধী নির্বাচনী প্রচারণা ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের বিষয়টি এক করে তুলেছিলেন।[৬২] ১৯৬৭ সাল থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮-১৯৬৮ আইয়ুব খানের শাসনামলকে "উন্নয়ন দশক" বা "ডিকেড অফ ডেভেলপমেন্ট" হিসেবে পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সারা পাকিস্তান জুড়ে শুরু হয় এক নজিরবিহীন প্রচারণা। এ প্রচারের মাধ্যমে এ ধারণাই সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয় যে, আইয়ুব খানের সময় পাকিস্তান ও বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং তাকে হটানো মুশকিল। খুব সম্ভব, আইয়ুব খান ১৯৭০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এ প্রচারণা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাঁকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়। দু'টি ঘটনা এর ভিত্তি স্থাপন করে। পূর্ব-পাকিস্তানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে লাণ্ডিকোটালে চোরাকারবারী পণ্য নিয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ।[৬৩]

রাজনৈতিক দমন পীড়ন ও ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হয়। এ পটভূমিকায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব ছয় দফা ঘোষণা করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের নাগরিক সমাজকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ছয় দফা এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মতো কাজ করেছিল। আওয়ামী লীগের প্রবীণ কিছু নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করলেও তরুণরা তা লুফে নেয়। পোস্টারে লেখা হতে থাকে 'বাঙালীর দাবী ৬ দফা', বাঁচার দাবী ৬ দফা।' স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির ভিত্তি ছয় দফা আন্দোলন। ছয় দফা বহুদিন পর বাঙালীকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল এবং সে কারণে ক্রমেই শেখ মুজিব সবাইকে ছাড়িয়ে পরিণত হয়েছিলেন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতায়। এরপরই সরকার খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের ওপর। শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন।[৬৪] ১৯৬৮ সালের ৭ই জানুয়ারি সংবাদপত্রে "পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র" সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হল, জানানো হল এ কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে ২৮জনকে। গ্রেফতারে সংখ্যা পরবর্তীকালে দাঁড়ায়

৩৫জনে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত এ মামলার মূল বক্তব্য ছিল, ভারতীয় সাহায্যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালী সামরিক-বেসামরিক কিছু কর্মচারী পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে। গ্রেফতারকৃতদের প্রথম নামের তালিকায় শেখ মুজিবের নাম ছিল না। তাঁকে পরবর্তীকালে প্রধান আসামী করা হয়। এ ষড়যন্ত্র মামলার খবর প্রথমে বাঙালীদের বিমূঢ় করেছিল। স্পষ্টত তারা এটি বিশ্বাস করে নি। বরং এ বিশ্বাসই দৃঢ়ভূত হয় যে, যেহেতু ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছিল সেহেতু শেখ মুজিব ও বাঙালীদের দমনের জন্যই তারা এ মামলা দায়ের করেছিল।

সরকার ভেবেছিল, এ ধরনের মামলায় শেখ মুজিবের ইমেজ বা জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে। কিন্তু ভুল হয়েছিল সরকারী হিসেবে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন তাঁর জবানবন্দিতে– "কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।"[৬৫] আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। এ আন্দোলনে শহীদ হন আসাদ, মতিউর, রুস্তম। এ ছাড়া সার্জেন্ট জহুরুল হক ঢাকা সেনানিবাসে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন, ইপিআরের গুলিতে নিহত হন ড. শামসুদ্দোহা। এবং সে সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি আর আইয়ুব খানের নিয়ন্ত্রণে আসে নি। তাকে আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

আইয়ুব খানের পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে জারী করেন সামরিক আইন। ২৮শে নভেম্বর ১৯৬৯ সালে এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন– জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। শুধু তাই নয়, তিনি অধিকতর স্বায়ত্তশাসনেরও প্রতিশ্রুতি দেন। মার্চ মাসের ৩০ তারিখে ইয়াহিয়া "শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো" বা "লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার, ১৯৭০" ঘোষণা করেন। এই কাঠামোর আওতায় নির্বাচন ও সংসদ গঠিত হওয়ার কথা। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শুধু ছাত্ররাই নয়, রাজনৈতিক নেতারাও এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে এটি 'জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বানচালে'[৬৬] প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক নেতারা "শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো"র প্রতিবাদ জানালেও নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।[৬৭] ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং ২২শে অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ওই তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি। পরে তা ৭ই ডিসেম্বর পুনর্নির্ধারিত হয়।[৬৮]

১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর। নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ–

সারণি ১.৪ : প্রদেশ এবং দলভিত্তিক নিম্নরূপ :[৬৯]

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	প্রদেশ অনুসারে ফলাফল							মোট আসন
–	–	পূর্ব-পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ.প.সী.প্র	বেলুচি-স্তান	উপজাতি এলাকা	মহিলা	–
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	✕	✕	✕	✕	✕	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	১২২	✕	৬৪	১৮	১	✕	✕	৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৩২	✕	১	১	৭	✕	✕	✕	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১১৯	✕	৭	✕	✕	✕	✕	✕	৭
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	৯৩	✕	✕	✕	৬	১	✕	✕	৭
মারকাষ-ই-জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	?	✕	৪	৩	✕	✕	✕	✕	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬১	✕	✕	✕	৩	৩	✕	✕	৭
জামায়াতে ইসলাম	২০০	✕	১	২	১	✕	✕	✕	৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১২৪	✕	২	✕	✕	✕	✕	✕	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১০৮	১	✕	✕	✕	✕	✕	✕	১
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৩০০	১	৩	৪	✕	✕	৭	✕	১৪
মোট	-	১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দু'টি রাজনৈতিক দল প্রধান্য দেখা যায়। নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকী ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি নেতা নূরুল আমিন, অপরটি একজন স্বতন্ত্র সদস্য। অপর পক্ষে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে।[৭০]

সারণি ১.৫ : পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল[৭১]

দলের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	×	২
পাকিস্তানী পিপলস পার্টি	×	×	×
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	×	×	×
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	×	×	×
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	×	×	×
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	×	১
জামায়াতে ইসলামী	১	×	১
নেজামে ইসলামী	১	×	১
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	×	×	×
মারকাজে আহলে হাদীস	×	×	×
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (হাজারী)	×	×	×
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (নূরানী)	×	×	×
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭	×	৭
মোট	৩০০	১০	৩১০

নির্বাচনী ফলাফল ছিল ক্ষমতাসীন পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রের কাছে অপ্রত্যাশিত। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ইয়াহিয়া দিয়েছিলেন বটে কিন্তু বোধহয় ভেবেছিলেন, কোনো একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। সেক্ষেত্রে শাসক আমলাচক্রের প্রধান হিসাবে একটি দলকে খেলাতে পারবেন আরেকটি দলের বিরুদ্ধে, যেমনটি গুলাম মহম্মদ ও ইস্কান্দার মীর্জা করেছিলেন ১৯৫৮ সালের আগে। আওয়ামী লীগ যে শুধু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তাই নয়, ঐ সময় আওয়ামী এমপিদের ঐক্য ছিল দৃঢ়। এবং তা পার্থক্য সূচিত করেছিল প্রাক ১৯৫৮ পর্বে সঙ্গে। ঐ পর্বে এই ঐক্য ছিল না দেখেই আমলাচক্র ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পেরেছিল। এবং বোধহয় এ কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফল নস্যাতের জন্য সামরিক সমাধান বেছে নেয়।[৭২] পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে সেনা মোতায়নের জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই, প্রথমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের শুরুর তারিখ নির্ধারণ করে সময় ক্ষেপণের কৌশল গ্রহণ করে এবং পরে আলোচনার নামে। অবশেষে ২৫শে মার্চ কালো রাত্রিতে পাকিস্তান বাহিনীর অতর্কিত হামলার মাধ্যমে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৬ই

ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের পিচ্ছিল পথ বেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে রাজনৈতিক ইতিহাস তাতে আমরা ২টি বিষয় লক্ষ্য করি :

১. পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী তৎকালীন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বাধীনভাবে শাসন করতে দেয় নি নানা অজুহাতে। তার প্রমাণ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন।
২. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক ও বিরোধী রাজনীতিবিদরা অর্থাৎ দুই পক্ষই বিতর্কিত করে তুলেছিলেন।

আইয়ুব খান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের শাসন কার্য চালিয়ে নেন, রাজনীতিবিদদের শাসন করতে না দেওয়ায় ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু নির্বাচন না হলে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্ন ওঠে তাই আইয়ুব খান মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনের আয়োজন করতেন। নির্বাচনের ফলাফল যাতে পক্ষে যায় তাই 'হ্যাঁ-না' ভোট করেছেন। অর্থাৎ নির্বাচনী প্রক্রিয়া ধ্বংস করেন। গণতান্ত্রিক ধারা যাতে না থাকে তাই তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রবর্তন করেছেন। এ ধরনের গণতন্ত্র অভিনব। তখন রাজনৈতিক সমাজ এর প্রবল বিরোধিতা করতে পারতেন কিন্তু তা তারা করেন নি। বরং অনেকেই তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে তারা নির্বাচন প্রক্রিয়া বিনষ্ট করতে সহযোগিতা করেছেন। অন্তিমে তা রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধেই গেছে।

আইয়ুব খানের পরে আমরা দেখি দাবী এসেছে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচন বিষয়টি যে মূল সে বিষয়টি আবার প্রতীয়মান হল। ঐ নির্বাচনের দাবীতেই ১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বেশ কয়েকটি সংস্কার আনা হয়। যেমন : সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোটদান পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র বাতিল করা, যার মাধ্যমে সর্বজনীন ভোটাধিকার সীমিত করা হয়েছিল। ফলে এক দিক থেকে বলা যেতে পারে ১৯৫৪-এর নির্বাচনের পরে ১৯৭০ সালেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অধীনে। এবং এই দুইটি নির্বাচনেই বাঙ্গালীরা তার মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে। এবং তা ছিল কেন্দ্রীয় দুশাসনের বিরুদ্ধে। বাঙ্গালীর গণতন্ত্রের প্রতি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তা ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেন। তারা নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করেন অথবা সেই প্রক্রিয়াটি বিতর্কিত করে তোলার চেষ্টা করেন। যাতে মানুষের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা আসে এবং পরে সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ দেখায়।

এইভাবে পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংসের ব্যবস্থা করে যা বাংলাদেশে পরবর্তীকালে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং যাকে আমরা বলা হয় গণতন্ত্রের 'পাকিস্তানীকরণ'।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার আদায় করতে গিয়ে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটি জন্ম নেয়। পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর ১৯৫২ সালে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ভয়ে শাসকগোষ্ঠী বারবার নির্বাচন পিছিয়েছেন। নিজেদের সুবিধা মতে সময়ে তারা ১৯৫৪ সালে নির্বাচন দেয় কিন্তু তাদের ভরাডুবি ঠেকাতে পারেন নি। নির্বাচনে পরাজিত সরকারী দলই ভোট কারচুপির অভিযোগ করে। কিন্তু বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে সে রকম কোনো অভিযোগ ওঠে নি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে পরাজিত হয়ে মুসলিম লীগ সরকার সব সময় জোটের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে চেষ্টা করে। তারা ঘন ঘন নির্বাচিত সরকারকে বহিস্কৃত করতে থাকে। এর ফলে ৭ বার নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং ৩ বার গভর্নর জেনারেলের শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিদায় জানিয়ে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতায় আসেন সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে। ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য আবিষ্কার করেন নতুন এক পন্থা যা 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে পরিচিত। মৌলিক গণতন্ত্রীদের 'হ্যাঁ-না' ভোটে ১৯৬০ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ক্ষমতাকে বৈধ করেন। অর্থাৎ আইয়ুব খান প্রচলিত গণতন্ত্রের কাঠামোতেই আঘাত করেন এবং নিজের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি তৈরী করেন। ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিন হন। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। শাসকগোষ্ঠী ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের গড়িমসি করে। নির্বাচনের ফলাফল না মেনে উল্টো বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য শুরু করে গণহত্যা। শুরু হয় ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের। নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয় এবং যাত্রা শুরু করে নতুন করে। ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে ম্যানডেট পায় তার উপর ভিত্তি করে মুজিব নগর সরকার গঠিত হয় এবং এই সরকারের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

মুজিব শাসনামল (১৯৭২-১৯৭৫)

স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল দৃঢ় পদক্ষেপে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সরকার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এ দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করে জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী ও প্রত্যাশা পূরণ করা হয়। বাংলাদেশের জন্য গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশ ২২ জারী করা হয়। এ আদেশবলে গণপরিষদ গঠন করা হয় এবং ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ও পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হন। সংবিধান প্রণয়নকল্পে গণপরিষদের প্রথম সভা ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি খসড়া সংবিধান রচনা করে এবং ১২ই অক্টোবর ১৯৭২ গণপরিষদ তার শেষ অধিবেশনে উক্ত খসড়া দলিলের ওপর আলোচনায় বসে। প্রায় তিন সপ্তাহ

আলোচনা শেষে ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদ দেশের সংবিধান অনুমোদন করে। উক্ত সংবিধান ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে কার্যকরী হয়। সংবিধানে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌল নীতি হিসেবে গণতন্ত্র স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশের সংবিধান ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতির সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করে। এভাবে দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে।[৭৩] আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এক বছরের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। এত স্বল্প সময়ে এবং ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে একটি দেশকে লিখিত শাসনতন্ত্র উপহার দেওয়া এক বিরল ঘটনা।[৭৪] যেখানে পাকিস্তানের সংবিধান প্রনয়নে সময় লেগেছিল ৯ বছর সময় সেখানে বাংলাদেশ স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে গণতান্ত্রিক পথে তার দৃঢ় পথ চলার পূর্বাভাস দেয়। সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এবং উদ্দেশ্য ছিল, "এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।"[৭৫] মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিকাশের ও সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল সংবিধানে। মুক্তিযুদ্ধে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানই অংশ নেয় নি, সকল ধর্মাবলম্বীরা সমভাবে অংশ নিয়েছিলেন তাই ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল, অতীতে যে প্রশ্ন নিয়ে কয়েক শ' বছর সন্দেহ, বিতর্ক চলছিল তা বাতিল করে বাঙালী অভিধায়ই সবাইকে ভূষিত করা হল। এটাও ছিল শাসনতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এক কথায় "এটি ছিল একটি ব্যাপক, সুলিখিত দলিল এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় তৎকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষা বহুলভাবে প্রতিফলিত করেছিল। প্রতিটি বিধান প্রণয়নের পেছনেই কাজ করেছে এক একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং এগুলোর সবই করা হয়েছিল অতীতে বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত গণদাবীর ভিত্তিতে।"[৭৬]

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন

সংবিধান রচনা এবং অনুমোদনের সাথে সাথে গণপরিষদের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অন্যান্য চৌদ্দটি দলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দল সমূহের প্রার্থী ছিল ১,০৮৯ জন ও স্বতন্ত্র ছিল ১২০ জন অর্থাৎ মোট প্রার্থী ছিল ১,২০৯জন। এবং মোট ১৫জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।[৭৭]

সারণি ১.৬ : বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[৭৮]

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট
বাংলদেশ আওয়ামী লীগ	২৯৩	১৫	৩০৮
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	১	-	১
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১	-	১
স্বতন্ত্র	৫	-	৫
মোট	৩০০	১৫	৩১৫

আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণ ৩০০ সংসদীয় আসনের ২৯৩টি আসনে বিজয়ী হওয়ার মধ্যদিয়ে দলটি জাতীয় সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনে শতকরা ৫৫.৬১ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করে এবং বিজয়ী দল ওই ভোটের শতকরা ৭৩.২০ ভাগ লাভ করে। সংসদে নারীদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনসহ দলটির আসন সংখ্যা হয় ৩০৮। প্রথম সংসদে ট্রেজারি বেঞ্চের ব্যাপক প্রাধান্য এবং বিরোধী দলের খুবই কম আসনপ্রাপ্তির ফলে সংসদে 'বিরোধী দল' বলে মূলত কিছুই থাকে না এবং সংসদীয় বিরোধী দলের স্বীকৃতি না থাকার বাস্তবতায় সংসদীয় কাঠামোয় দায়িত্বশীল নির্বাহী প্রতিষ্ঠা সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে।[৭৯] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তার জোরে আওয়ামী লীগ যে প্রায় সব আসনই পাবে তা ছিল দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলায় বঙ্গবন্ধু তথাপি এ নির্বাচন দিয়েছিলেন নিয়মতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠার জন্য, যা কিনা ক্ষমতাকে বৈধতা দেবে।[৮০] তবে নির্বাচনে পরাজিত অনেক প্রার্থীই কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম– অলি আহাদ এই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করেন।[৮১] এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিশাল বিজয় লাভ করায় কার্যত কোনো বিরোধী দল থাকে না। ৮ই মার্চ ১৯৭৩ সালে নির্বাচন পরবর্তী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, 'বাংলাদেশে এখন কোনো বিরোধী দল নেই'।[৮২] সেই 'পরাজিত' প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডঃ আলিমুর রাযী, রাশেদ খান মেনন, মেজর জলিল এবং অন্যেরা। আবুল মনসুর আহমদ ৭৩-এর নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের গঠনমূলক সমালোচনা করে বলেন, 'আওয়ামী-নেতৃত্বের আরও বেশী সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সে কর্তব্য অবশ্য শুরু হইয়াছিল আগেই। নির্বাচন চলাকালেই। গোড়ার দিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে উভয়-পক্ষের ভ্রান্ত ধারণা থাকার দরুন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব উদার হইতে পারে নাই। কিন্তু নমিনেশন পেপার বাছাইর দিনেই আওয়ামী লীগের বিপুল জয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। শেখ মুজিব দু'টি আসন হইতেই বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইলেন। আওয়ামী লীগের আরও ৭জন প্রার্থী বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইলেন। এই সময়ে আওয়ামী নেতৃত্বের উদার হওয়ার কোনও অসুবিধা বা রিস্ক ছিল না। বিরোধী দলসমূহের প্রার্থীদের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খাঁ, প্রফেসর মোযাফ্ফর আহ্মদ, ডাঃ আলিমুর রাযী, জনাব নূরুর রহ্মান, রাজশাহীর মিঃ মুজিবুর রহমান, জনাব অলি আহাদ, মিঃ সলিমুল হক খান মিল্কী, মিঃ আমিনুল ইসলাম চৌধুরি, মিঃ যিল্লুর রহিম, হাজী

মোহাম্মদ দানেশ, মিঃ বযলুস-সাত্তার প্রভৃতি জনা-পঁচিশেক অভিজ্ঞ সুবক্তা পার্লামেন্টারিয়ানকে জয়ী হইতে দেওয়া আওয়ামী লীগের ভালর জন্যই উচিৎ ছিল। তিন শ’ পনর সদস্যের পার্লামেন্টে জনা-পঁচিশেক অপযিশন মেম্বর থাকিলে সরকারী দলের কোনই অসুবিধা হইত না। বরঞ্চ ঐ সব অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান অপযিশনে থাকিলে পার্লামেন্টের সৌষ্ঠব ও সজীবতা বৃদ্ধি পাইত। তাঁদের বক্তৃতা বাগ্মিতায় পার্লামেন্ট প্রাণবন্ত, দর্শনীয় ও উপভোগ্য হইত। সরকারী দলও তাতে উপকৃত হইতেন। তাঁদের গঠনমূলক সমালোচনার জবাবে বক্তৃতা দিতে গিয়া সরকারী দলের মেম্বররা নিজের ভাল দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হইয়া উঠিত। বাংলাদেশের পার্লামেন্ট পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের একটা ট্রেনিং কলেজ হইয়া উঠিত। আর এ সব শুভ পরিণামের সমস্ত প্রশংসা পাইতেন শেখ মুজিব।”[৮৩]

নির্বাচনের ফলে বিরোধী দল একরূপ শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছিল। কয়েকটি দলের এবং নির্দলীয় মেম্বর মিলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা হলেন মাত্র ৮জন। বিরোধী দল ছাড়া পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ হয় না। তবে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খান অল্প সংখ্যক স্বতন্ত্র সদস্যকে নিয়ে বিরোধী দলের ভূমিকা পালনে তৎপর হন। তাঁরা প্রশ্নোত্তরপর্বসহ বাজেট অধিবেশনে সমালোচনাধর্মী বক্তব্য, প্রশ্ন এবং সম্পূরক প্রশ্ন রাখেন। প্রথম সংসদের আটটি অধিবেশনে ১৪টি মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করা হয়। তবে এর কোনোটিই আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয় নি। জনগুরুত্ব সম্পর্কে স্বল্পকালীন আলোচনার (বিধি ৬৮) ব্যাপরে ১৫টি নোটিশের মধ্যে দু’টি আলোচিত হয়। সংসদ সদস্যগণ জনগুরুত্ব সম্পর্কে ২২৯টি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব (বিধি ৭১) উত্থাপন করেন যার মধ্যে ৫২টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। অর্ধঘণ্টা আলোচনায় ৪টি নোটিশের কোনোটির ওপরই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নি। প্রথম সংসদে প্রণীত আইনের অধিকাংশই আসে অধ্যাদেশ অনুমোদনের মাধ্যমে। এভাবে কমিটি ব্যবস্থার ক্রিয়াশীলতা ও সুষ্ঠুতা দৃশ্যমান হয় নি। বস্তুত জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যারিশমা, দলীয় শৃঙ্খলা ইত্যাদি উপাদানের ফলে নির্বাহীর কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা বা সংসদীয় কৌশলের মাধ্যমে দায়িত্বশীলতা দাবী মুখ্য বিষয় হতে পারে নি।[৮৪] প্রথম জাতীয় সংসদের গুরুত্ব নির্বাহীর অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে হ্রাস পেতে থাকে। বিশেষত রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশসমূহ জারী এবং ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে পর পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল এ সময় সংসদে বিস্তারিত বিতর্ক, অনুসন্ধান বা সংশোধনী ছাড়াই অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। এভাবে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ও জাতীয় রক্ষী বাহিনী (সংশোধিত) বিল, ১৯৭৫ সালের প্রিন্টিং প্রেস ও প্রকাশনা (সংশোধিত) বিল, বিশেষ ক্ষমতা বিল এবং সংবিধান চতুর্থ সংশোধনী বিল স্বল্প সময়ের মধ্যেই সংসদীয় অনুমোদন লাভ করে। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল ১৯৭৩ পাসের মাধ্যমে নির্বাহীকে জরুরী অবস্থা ঘোষণাসহ একজন ব্যক্তিকে ছয় মাসের জন্য অন্তরীণ রাখার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং কেবিনেট তথা মন্ত্রীবর্গ প্রকৃত নির্বাহীর অধীন হওয়ায় যৌথ দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্র গুরুত্বহীন হয়ে যায়। এভাবে সংসদীয় কাঠামোয় সরকার এবং সরকারী দলের

পার্থক্য কদাচিৎ দৃশ্যমান হয় এবং উপরোক্ত সংশোধনীসমূহ পাসের পর সংসদ প্রকৃত নির্বাহীর নির্দেশ পালনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[৮৫] ১৯৭৪ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পটভূমিকার যৌক্তিকতা ছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে চার দিকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। স্বাধীনতা বিরোধীরা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা। দেশের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। এই অবস্থায় দেশকে ও দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে আর কোনো বিকল্প ছিল না। এ রকম নানাবিধ কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষণার যৌক্তিকতা ছিল। কিন্তু, যৌক্তিকতা যাই থাকুক না এ ঘোষণা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর আঘাত হেনেছিল। কারণ, তার মাত্র দু'বছর আগে সংবিধানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল মৌলিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর। এই যে প্রক্রিয়া (১৯৭৪-১৯৭৫) ও ব্যবস্থা গ্রহণ তার কোনোটিই সিভিল সমাজ মেনে নেয় নি।[৮৬] প্রথম জাতীয় সংসদের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল ১৯৭৫ পাস হয়। এটার মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু করা হয়। সে সাথে একদলীয় ব্যবস্থার অধীনে সর্বাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিলুপ্তি ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। প্রথম জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার পর এর কার্যক্রম সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য নির্বাহীর দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে নি। সংসদের পদ্ধতিগত রীতিনীতি এ প্রতিষ্ঠানকে সরকারের সার্বভৌম শাখা করলেও সংসদের পরিপূর্ণ কর্মকাণ্ড, সংসদ সদস্যগণের ভূমিকা পালন, নীতি প্রণয়ন পদ্ধতি, অর্থের ওপর নিয়ন্ত্রণ, নির্বাহীর কাজের তদারকি, জনদাবী ও মতামতের নিত্য প্রতিফলন এ প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে পরিলক্ষিত হয় নি। তা ছাড়া ৭০ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নির্বাহীর বিপক্ষে সংসদের অনাস্থা জ্ঞাপনের অকার্যকারিতা, বেসরকারী সদস্য বিল ও প্রস্তাবের অনুপস্থিতি এবং সরকারী বিল ও সংবিধানের সংশোধনীসমূহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংযোজন আনার সুযোগ না থাকায় সংসদ নির্বাহীর উপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পরে।[৮৭]

বাকশাল গঠন

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধনের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী একদলীয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির আওতায় রাষ্ট্রপতির পদ লাভ করেন। ইতোমধ্যে ৬ জুন, ১৯৭৫ এ ঘোষিত 'দ্বিতীয় বিপ্লব' কায়েমের লক্ষ্যে জাতীয় দল 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা 'বাকশাল' গঠন করা হয়।[৮৮] এবং এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সৈনিক, আমলা বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিদের নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় বাকশালে যোগ দেওয়ার হিড়িক। বুদ্ধিজীবী, আমলা, সরকারী কর্মচারী, সাংবাদিক সবাই শেখ মুজিব বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে বাকশালে যোগ দেওয়ার আবেদন করতে থাকেন।[৮৯] চতুর্থ সংশোধনীর পর দেশে চারটি সংবাদপত্র চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জাতীয় দলে অধিকাংশ সংসদ সদস্যই যোগ দেন। অবশ্য জেনারেল ওসমানী ও মঈনুল হোসেন দলে যোগ দেন নি।[৯০] রাষ্ট্রপতিসহ কেবিনেট সদস্যগণ ও মন্ত্রীবর্গ সকলেই বাকশালের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা,

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন এবং মিডিয়ার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাহী কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়। রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক কাঠামোর এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে সর্বাত্মক রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। নতুন রাষ্ট্রিক কাঠামোর কার্যক্রম এবং ঘোষিত নীতিমালা প্রকৃত বাস্তবায়নের মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[৯১] এবং নতুন সৃষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো বাতিল করা হয়। দেশে সামরিক শাসন জারী করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এক বছরের বেশী সময় ধরে নিষিদ্ধ করা হয়। আরও তিন মাসকাল অতিক্রান্ত হলে দেশের প্রথম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়।[৯২]

জেনারেল জিয়ার শাসনামল

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিপথগামীর হাতে সপরিবারে শহীদ হওয়ার পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক ‘ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স’ নামে সংবিধান, আইনের শাসন ও মানবতাবিরোধী একটি অধ্যাদেশ জারী করেছিল। এরপর পাল্টাপাল্টি বেশ কয়েকটা সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ৭ই নভেম্বর পাল্টা এক সেনা অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ ও তার কয়েকজন সহযোগীসহ নিহত হন। এবং এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমানের উত্থান ঘটে।[৯৩] রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং তিন বাহিনীর প্রধানগণ উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালের ৩০শে নভেম্বর জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। পরের বছর ২১শে এপ্রিল বিচারপতি সায়েম স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন এবং জিয়া সে পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন।[৯৪]

বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ বসে ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির আওতায়। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সামরিক প্রধান হিসেবে পুনঃনিযুক্তি লাভের পর জেনারেল জিয়া ক্ষমতার মধ্যমণি হন এবং সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের অঙ্গীকার করেন। ১৯৭৬ সালের জুলাই থেকে সীমিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল বিধি বা Political Parties Regulation পাস করে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা হয়। বিধি অনুসারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সরকারের অনুমোদন গ্রহণের আবেদন করতে হতো এবং সে উদ্দেশ্যে নিজ নিজ দলের সংবিধান, কর্মসূচী এবং মেনিফেস্টো যথারীতি দাখিল করতে হতো। এভাবে ১৯৭৬ সালের শেষ নাগাদ আবেদনকারী ষাটটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে একুশটিকে যথাযথ অনুমতি প্রদান করা হয়।[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসকরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে কাজগুলো করে তা হল :

১. সামরিক আইনে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া

২. নতুন রাজনৈতিক দল গঠন

৩. গণভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার বৈধতা প্রদান

৪. ভোট কারচুপি করে সমস্যার সৃষ্টিকরণ

৫. রাজনীতিতে ধর্মের ব্যাপক ব্যবহার

জিয়াউর রহমানও এর ব্যতিক্রম নয়। জেনারেল জিয়া ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য অসংখ্য বেসামরিক পদে সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেন। আবার তিনি সামরিক-বেসামরিক আমলাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। সামরিক বাহিনীর মধ্যে নিজের অবস্থানকে জনপ্রিয় করে তুলতে জিয়া সামরিক খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেন। বঙ্গবন্ধুর আমলের ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে সেনা বাজেট ছিল ৭০০ মিলিয়ন টাকা। জিয়া তা বাড়িয়ে প্রায় ২১০০ মিলিয়ন টাকা করেন। নতুন সেনা ডিভিশন গঠন, গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৯৬] জিয়াউর রহমান একটি শক্তিশালী সমর্থকগোষ্ঠী তৈরীতে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন আদর্শিক স্থানান্তরে (ideological shipment)। বস্তুত ইসলামকে ভিত্তি করেই জিয়া ৮০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নিজের একটি শক্তিশালী সমর্থক গোষ্ঠী তৈরী করেন। এক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশে স্বীকৃত যুদ্ধাপরাধী শাহ আজিজুর রহমান, মওলানা আব্দুল মান্নানসহ বেশ কয়েকজন রাজাকারকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেয় সরাসরি দালাল আইন প্রত্যাহারের মাধ্যমে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও জিয়া এটি করেছিলেন নিজের জন্য একটি শক্তিশালী 'আদর্শিক সমর্থক গোষ্ঠী' তৈরীর জন্য। ফলে যারা ঐতিহাসিকভাবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তি, যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে দেশান্তরী নতুবা আত্মগোপনে ব্যস্ত জেনারেল জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় তারা রাজনীতিতে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়।[৯৭] পাকিস্তানের জেনারেল জিয়াউল হকের মতো জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় পাকাপোক্তভাবে টিকে থাকার জন্য জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া জিয়াউর রহমানের আমল থেকেই জোরেসোরে শুরু হয়। সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযুক্ত করা হল। ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি থেকে বাদ দেওয়া হয়। কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে সকল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান শুরু করার নিয়ম চালু করা হয়।[৯৮] জিয়া খন্দকার মোশতাক ও বিচারপতি সায়েমের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেন। তিনি ক্ষমতাকে সুসংহত করতে প্রথমে আয়োজন করেন 'হ্যাঁ-না' ভোট, পরে উর্দি গায়ে আয়োজন করেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আরও পরে আয়োজন করেন সংসদ নির্বাচন। তারপরই জিয়া সেনা বাহিনীর প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। অর্থাৎ ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত না করে জিয়া গা থেকে

উর্দি খোলেন নি। এটি কেবল প্রতীকী বিষয় নয়; বরং এটি ছিল ক্ষমতাকে চূড়ান্তভাবে ব্যবহারের এবং ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের সবচে' কার্যকর অস্ত্র।[৯৯] ১৯ দফা, খাল খনন কর্মসূচী, রাজনৈতিক দল গঠন, গণভোটসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান বেসামরিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।[১০০] জেনারেল জিয়া ১৯৭৭ সালের ৩০শে মে এক জাতীয় গণভোটের মাধ্যমে নিজ অবস্থান ও কর্মসূচীর পক্ষে জনসমর্থন লাভের প্রয়াস পান।[১০১] ১৯৭৭ সালের ৩০শে মে অনুষ্ঠিত গণভোটে জিয়াউর রহমান ৯৮.৮৭% সমর্থনসূচক ভোট আদায় করতে সমর্থ হন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তালুকদার মনিরুজ্জামান এ গণভোটেকে সমালোচনা করে বলেছেন, "এ ভোটের তেমন কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, কেননা সামরিক শাসনের সময় সব জেনারেলই ৯৯ শতাংশ ভোট পেয়ে থাকেন; এটি এক ধরনের সামরিক ফ্যাশান।"[১০২]

১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

জিয়াউর রহমান নিজেকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য ৩রা জুন ১৯৭৮ সালে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করেন।[১০৩] এবং ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন করেন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে দশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ঐক্যজোট প্রার্থী হয়েছিলেন এম. এ. জি. ওসমানী (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি)। বিপরীতে ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান। সেনা প্রধানের পদে থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংবিধান সম্মত ছিল না। সংবিধানের চরম লংঘনের মাধ্যমে তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। সাংবিধানিক এ সঙ্কট কাটাতে নির্বাচনের পর, রাষ্ট্রপতির শপথ নেওয়ার বেশ কিছুদিন পর তিনি ডিক্রী জারী করেন এই বলে যে, ১৯৭৬ সাল থেকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে তার অবসর গণ্য হবে। নির্বাচনে জেনারেল জিয়াউর রহমান সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। ওসমানী'র পরাজয়ের পেছনে নির্বাচনে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে কারচুপি ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।[১০৪] ভোট কারচুপি করে নির্বাচনী ফলাফল নিজেদের পক্ষে নেওয়া সামরিক শাসকদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জেনারেল জিয়া এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

সারণি ১.৭ : ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল[১০৫]

	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট
১	জিয়াউর রহমান	১ কোটি ৫৭ লাখ ৩৩ হাজার
২	এম.এ. জি. ওসমানী	৪৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ২০০ টি
৩	সৈয়দ সিরাজুল হুদা	৩৪ হাজার ৯৫টি
৪	অধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ	২৪ হাজার ২ শ' ২টি
৫	মোঃ আবুল বাশার	৫১ হাজার ২৩টি
৬	আব্দুস সামাদ	৩৬ হাজার ৬ শ' ৮০টি
৭	মৌলানা খবিরউদ্দিন আহমদ	৭৮ হাজার ৮ শ' ৯০টি
৮	মোঃ আজিজুল ইসলাম	৪৬ হাজার ৬ শ' ৫৮টি
৯	শেখ মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	২৫ হাজার ৪ শ' ৯১টি
১০	মোঃ গোলাম মোরশেদ	৩৬ হাজার ৮ শ' ৪৫টি

দেশে রাজনীতি চালু এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জেনারেল জিয়া নিজস্ব পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হতে থাকেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি দেশের সংবিধানে ইসলামী নীতি সংযোজনসহ 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ'-এর স্থলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রের স্থলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার-সংক্রান্ত নীতি প্রবর্তন করেন। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং গণভোট ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে নিজ রাজনৈতিক অবস্থানকে সুসংহত করেন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে প্রথমে জাতীয় গণতান্ত্রিক দল বা জাগদল, তারপর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট এবং শেষে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি গঠন করেন।[১০৬] বেশ কিছু সংখ্যক সামরিক বাহিনীর অফিসার, ক্ষুদে রাজনীতিবিদ, উচ্চভিলাষী আমলা এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ে এই পার্টির আবির্ভাব হয়। অচিরেই বিএনপি একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে সংগঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য রাজনীতিবিদদের প্রতি জিয়ার উঁচু ধারণা ছিল না, তিনি রাজনীতিবিদদের সায়েস্তা করার জন্য গোটা রাজনৈতিক অঙ্গনকে এমন ঘোলাটে করে দিয়েছিলেন যে, রাজনীতিবিদরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। জিয়া বলতেন : "I will make politics difficult for the

politicians."[১০৭] বাংলাদেশে দ্বিতীয় সংসদের নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে। তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল ও রাজনৈতিক জোট এ নির্বাচনের বিরোধিতা করলেও পরবর্তীকালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়।[১০৮]

সারণি ১.৮ : দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭৯) এর ফলাফল [১০৯]

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২০৭
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৯
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান)	০২
মুসলিম লীগ ও ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ (যৌথ ভাবে)	২০
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	০৮
গণফ্রন্ট	০২
জাতীয় লীগ	০২
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	০৪
স্বতন্ত্র	১৬
মোট	৩০০

এ নির্বাচনে সরকারী দল বিএনপিসহ ২৯টি রাজনৈতিক দল সংসদের ৩০০ আসনের জন্য ১৭০৩জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দান করে। প্রায় চার কোটি ভোটারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দ্বিতীয় সংসদীয় নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এতে সরকারী দল বিএনপি ২০৭টি আসন লাভ করে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তবে সংসদে বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধিত্বও ছিল যথেষ্ট। এভাবে আওয়ামী লীগ (মালেক), আওয়ামী লীগ (মিজান), মুসলিম লীগ-ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ, জাসদ ও অন্যান্য দল যথাক্রমে ৩৯, ২, ২০, ৮ এবং ৮টি আসন লাভ করে। এবং সংসদে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল ১৬। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সর্ববৃহৎ বিরোধী দলের মর্যাদা পায়।[১১০] নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে বিরোধী দলসমূহ নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখান করে। তবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

কৌশল হিসেবে দলগুলো সংসদ অধিবেশনে যোগদান করে।[১১১] সংসদে সরকারী এবং বিরোধীদলীয় প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের অনেকেই উচ্চতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সংসদ সদস্যগণের অনেকের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ছিল ভূমি মালিকানা এবং ক্ষমতাশালী জ্ঞাতি সম্পর্ক। দ্বিতীয় সংসদে ৭০-এর অধিক বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য এবং ১৬জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের উপস্থিতিসহ বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। আওয়ামী লীগের (মালেক) আসাদুজ্জামান, জাসদের শাহজাহান সিরাজ, আওয়ামী লীগের (মিজান) মিজানুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশ জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, জাতীয় একতা পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ন্যাপের মুজাফ্ফর আহমেদ, সাম্যবাদী দলের মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ খ্যাতিমান রাজনীতিবিদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় সংসদ ক্রিয়াশীল হবে এবং একদলীয় ক্ষেত্র হবে না বলে আশা প্রকাশ করা হয়। তবে এ ব্যাপারে হতাশার মাত্রাও ছিল যথেষ্ট কারণ জেনারেল জিয়া প্রবর্তিত নতুন রাজনৈতিক কাঠামোকে সংসদের মর্যাদা পূর্ণাঙ্গ বা সার্বভৌম ছিল না। জিয়ার রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির অনুরূপ ছিল না বরং এটি এমন এক সংসদ প্রতিষ্ঠা করে যার স্থায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন। এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এবং কেবিনেট সদস্যগণের নিয়োগ ও স্থিতিকাল রাষ্ট্রপতির পছন্দমাফিক ছিল এবং নির্বাচিত সংসদের নিকট তাদের দায়বদ্ধতার কোনো বিধান রাখা হয় নি। উপরন্তু নতুন অনুচ্ছেদ ৯২এ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংসদের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা খর্ব করা হয়। দ্বিতীয় প্রোক্লেমেশনের তিনটি ধারায় সংসদের ওপর নির্বাহীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পায়। এভাবে রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেবিনেটের এক-পঞ্চমাংশ সদস্য নিয়োগ দিতে পারতেন। তিনি জাতীয় স্বার্থে সংসদের অনুমতি ছাড়াই বিদেশী সরকারের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে ক্ষমতাশালী ছিলেন। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিলে সম্মতি প্রদান নাও করতে পারতেন যদি না সংশ্লিষ্ট বিলের ওপর গণভোট পাস করা হতো। রাষ্ট্রপতির এ ধরনের ক্ষমতার বিপরীতে জাতীয় সংসদ কতটুকু নির্বাহীর দায়িত্বশীলতা দাবী করতে সক্ষম তা প্রশ্নসাপেক্ষ ছিল। সংসদ এবং নির্বাহীর অসম ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে নির্বাহীর কর্মকাণ্ডের যথাযথ পর্যবেক্ষণে বা আইন প্রণয়নে সংসদের ভূমিকা বা গুরুত্ব হ্রাস পায়।[১১২] দ্বিতীয় সংসদেই প্রথমবারের মতো সংসদীয় বিরোধী দলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এভাবে আওয়ামী লীগের যশোর এবং বাকেরগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত আসাদুজ্জামান এবং মহিউদ্দিন আহমদকে যথাক্রমে বিরোধীদলীয় নেতা ও উপনেতা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ব্রিটেনে অনুসৃত সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথা অনুসারে বিরোধী দলের নেতাকে একজন কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুবিধা সরকারীভাবে প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় সংসদের মোট কর্মদিবস ছিল ২০৬ দিন, এর মধ্যে ৮ অধিবেশনে ৬৫টি বিল পাসসহ বেশ কিছু সংসদীয় কর্মকাণ্ড চালানো হয়। দ্বিতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনই সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী পাসের মাধ্যমে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল থেকে সামরিক শাসনের আওতায় সকল বিধি-বিধান এবং কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দান করা হয়। এ সংশোধনীটি ২৪১

ভোটে অনুমোদিত হয় যদিও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ (মালেক এবং মিজান), জাসদ, ন্যাপ (মুজাফ্‌ফর), গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং জাতীয় একতা পার্টি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। অপরদিকে মুসলিম লীগ, ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ, জাতীয় লীগ, সাম্যবাদী দল এবং গণফ্রন্টের ২০জন সংসদ সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন। এ সংসদে বিরোধী দলগুলো যার যার রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া উত্থাপন করে সংসদকে সচল রাখে এবং সরকারের সমালোচনা করতে প্রয়াস পায়। দলগুলো একত্রিতভাবে ১৯৮০ সালে ডিস্টার্ব এরিয়াস বিল পাসের মাধ্যমে সরকারের কর্তৃত্বের সম্প্রসারণের প্রবল বিরোধিতা করে। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে ৭২৯৪টি তারকা চিহ্নিত, ৮৩৫টি তারকাবিহীন এবং ৩৫টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এ ছাড়াও ৫২টি মুলতুবী প্রস্তাব, ১৩৩টি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, ১৩টি জনগুরুত্ব সম্পর্কে প্রস্তাব এবং ৬টি অর্ধঘণ্টা আলোচনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। এ সব প্রস্তাবের মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার বিদ্যমান সমস্যাসহ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়, জননীতিসমূহ, কৃষি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, খাদ্য পরিস্থিতি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা, নদী ক্ষয়, শিল্পায়ন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং বৈদেশিক নীতি বিষয়ে বক্তব্য এবং প্রশ্ন উত্থাপন করেন ও সরকারী ব্যাখ্যা দাবী করেন।[১১৩] দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিলসমূহের শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ সংশ্লিষ্ট কমিটির পরীক্ষণের জন্য যথারীতি প্রেরণ করা হয় এবং এর অর্ধেকের ওপর কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়।[১১৪] দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করা হয় এবং প্রথমবারের মতো মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীগণ এ সব কমিটির প্রধান হতে পারবেন না। সংসদের এ সকল কর্মকাণ্ডকে বিবেচনায় আনলে বলা যায় যে এ সংসদ পুরোপুরিভাবে একদলীয় ব্যাপারে পরিণত হয় নি।[১১৫] তবে সংসদে কেবিনেটের দায়িত্বশীলতা না থাকা, রাষ্ট্রপতির অতি ক্ষমতা, সংসদের কর্তৃত্ব হ্রাস এবং সর্বোপরি সংসদীয় সার্বভৌমত্বের অনুপস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংসদের ওই কার্যক্রমকে কার্যকরী বলা যায় না। নির্বাহীর নিজস্ব প্রয়োজনে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মের বৈধতা আদায়ের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ অনেকাংশে ব্যবহৃত হয়েছিল। জেনারেল জিয়ার শাসনামলে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত কাঠামোয় এবং এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থাকেন। নির্বাহী এবং সংসদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অসম সম্পর্ক বিরাজমান থাকায় সংসদীয় কাঠামোতে গণতন্ত্রায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হলেও নির্বাহীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে নির্বাহী তথা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ক্ষমতার ব্যক্তিগতকরণ ঘটে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে জিয়াউর রহমান সামরিক উর্দিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের আবরণে তিনি দেশে সামরিক শাসন বজায় রাখে। এবং তিনি ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশ যাত্রা থেমে দেন। তিনি গণতন্ত্রের কথা বলে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে স্বৈরশাসনের প্রবর্তন করেছিল। ১৯৮১ সালের মে মাসে জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার পর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তবে অচিরেই জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের নেতৃত্বে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাচ্যুত

হন এবং দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ২৪শে মার্চ ১৯৮২ বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়।[১১৬]

জেনারেল এরশাদের শাসনামল

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ পূর্বসূরীর মতো লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরাসরি ক্ষমতা দখল করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের বেসামরিকীকরণের পথ অনুসরণ করে জেনারেল এইচ. এম. এরশাদও গণভোটের আয়োজন করেছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া-জিয়ার মতো তিনিও সামরিক শাসন জারীর মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। তিনি একইভাবে তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থেকে রাষ্ট্রপতি পদে 'নিজেই নিজেকে' নিয়োগ দেন।[১১৭] সামরিক আইন ঘোষণা করতে গিয়ে এরশাদ বলেন, 'দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। ভূতপূর্ব সরকারের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির দরুন দেশে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।'[১১৮] এরশাদ ক্ষমতায় এসে আরও বললেন, দেশে দুবর্ল শাসনের ফলে যে পশ্চাদপদতা দেখা দিয়েছে, এর সমাধান করে তিনি নির্বাচন দেবেন। তিনি আরও বলেন, তাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং যত শিগ্‌গির সম্ভব পরিস্থিতি অনুকূলে এনে সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।[১১৯]

বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংসকরণ

ক্ষমতা দখলের পর এরশাদ বাংলাদেশে যত ধরনের বেসামরিক ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠান ছিল তা হিসাব করে ধ্বংস করে দিতে চাইলেন। ঐ সব প্রতিষ্ঠান যে সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় ছিল না বলাই বাহুল্য। এ সব প্রতিষ্ঠান সবে মাত্র গড়ে উঠেছিল। এ সব ধ্বংস করে দেওয়ার কারণ ছিল সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে, সর্বক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ আমলা আধিপত্য বিস্তার। শুধু তাই নয়, তিনি পরিকল্পনা করলেন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দু'ধরনের আমলা থাকবে– ঊর্ধ্বতন সামরিক আমলা, অধস্তন বেসামরিক আমলা। এ সময় থেকেই দেখা যায় আমলাতন্ত্রে প্রমোশনের হিড়িক। দীর্ঘ ছুটি নিয়ে উচ্চ ডিগ্রি আনার জন্য বিদেশ গমন– যে ডিগ্রির সঙ্গে তাদের পেশার কোনো সম্পর্ক নেই। এর ফলে সামরিক আমলাদের মন্ত্রী করার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল এরশাদ দু'-একজন করে বেসামরিক আমলাকেও মন্ত্রী করা শুরু করেন। ফলে উচ্চপর্যায়ের আমলাদের একাংশ এরশাদের অত্যন্ত কাছের হয়ে ওঠেন। নিজের শাসন সংহত করার পর এরশাদ মনোযোগ দেন প্রশাসনের সামরিকায়নে। প্রথমে আস্তে আস্তে, পরে দ্রুত লয়ে অবসরপ্রাপ্ত (এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সক্রিয়)-দের নিয়ে আসেন তিনি বেসামরিক প্রশাসনের সুযোগ-সুবিধায়। এরশাদ এভাবে সৃষ্টি করেছিলেন প্রশাসনে 'অবসরপ্রাপ্ত' নামে নতুন এক শ্রেণী। এরা সেনাবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা পেতেন এবং একই সঙ্গে ভোগ করতেন বেসামরিক প্রশাসনের সুযোগ-সুবিধা। এক হিসেবে জানা যায়, প্রায় নব্বইটি বিভিন্ন ধরনের সংস্থায় প্রধান পদে এক তৃতীয়াংশ ছিলেন এই অবসরপ্রাপ্তরা। এই অবসর প্রাপ্তদের প্রায়

ক্ষেত্রে এমন সব সংস্থায় দেওয়া হয়েছিল যেগুলো বৈদেশিক মুদ্রা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদান করতে পারত পৃষ্ঠপোষকতা। এ ছাড়া সংস্থার দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রধান পদও দেওয়া হয়েছিল বেশ কয়েকজনকে।[১২০]

শাসনকে বৈধ করার প্রয়াস

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল এরশাদ তাঁর শাসনকে বৈধ করতে প্রয়াস চালান এবং বেসামরিকীকরণ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন করেছেন। তবে তা কারচুপি পূর্ণ হওয়ায় এরশাদের বরাবরই বৈধতার সঙ্কট ছিল। পূর্বসূরীর মতোই এরশাদ 'ইসলামী কার্ড' ব্যবহার করেন সমর্থক গোষ্ঠী তৈরীতে।[১২১] তিনি প্রতি শুক্রবার কোনো না কোনো মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন। আটরশির পীরের মুরীদ হয়ে প্রায়ই তার দরবারে গিয়ে তার পায়ের উপর উপুড় হয়ে দোয়া চাইতে লাগলেন।[১২২] তিনি কেবল মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যাপক হারে বরাদ্দ দেন নি, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিজের বিভিন্ন সংবর্ধনায় ব্যবহার করেন। তিনি সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করেন।[১২৩] ক্ষমতার দম্ভ এরশাদকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তিনি সদর্পে ঘোষণা করতে লাগলেন, তিনিই প্রথমবার এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন।[১২৪] **১৯৮৩** সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও কেবিনেট সদস্যগণের সমন্বয়ে জনদল গঠন করা হয়। ক্রমান্বয়ে এ দলে অন্যান্য দলের দলছুট নেতারা যোগ দেন। এ প্রক্রিয়ায় বিএনপির শামসুল হুদা চৌধুরী ও এম. এ. মতিন, আওয়ামী লীগের কোরবান আলী ও মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং ডেমোক্রেটিক লীগের শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এরশাদের সহযোগী হন। এ সময়ে এরশাদবিরোধী **১৫** ও **৭** দলীয় দু'টি রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে নামে। বিরোধী জোটকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার জন্য **১৯৮৪** সালের আগস্টে এরশাদপন্থী জনদল ও আরও ৪টি সমমনা দল নিয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করা হয় এবং ঐ বছরের অক্টোবর মাস থেকে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করা হয়।[১২৫]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা

এরশাদ সরকারের সময় সর্বস্তরে সামরিক প্রশাসনের প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয় এতে বেসামরিক আমলাতন্ত্রের তরুণরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার আরেকটি কারণ, বিসিএস শিক্ষানবিশ অফিসারদের মিলিটারি একাডেমীতে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ। সিভিল সার্ভিসেও দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল, যার ফলে সিভিল সার্ভিসের একাংশ প্রকাশ্যে সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা শুরু করেছিল। কিন্তু স্বৈরশাসকদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের আঁতাতের কারণে তারা তেমন কিছু করে উঠতে পারে নি।[১২৬] এরশাদের ক্ষমতা দখলের আগে এবং পরবর্তী ছয়মাস সিভিল সমাজ পিছু হটেছিল। কিন্তু এরপর ফের সিভিল সমাজের প্রতিটি অংশ কম-বেশী প্রতিরোধ

শুরু করে এরশাদ শাসনের বিরুদ্ধে এবং এ কারণে এরশাদ শাসনামল কখনই স্থিরতা পায় নি, বৈধতা তো নয়ই। এ প্রতিরোধের মূল ভূমিকায় ছিল সংস্কৃতিকর্মী, পেশাজীবী/আইনজীবী ও ছাত্ররা। সাধারণ জনগণও মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করেছে। প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এ প্রতিরোধ পিছিয়ে দিয়েছে, আর এ জন্য এরশাদের শাসনকালও প্রলম্বিত হয়েছে।[১২৭] ১৯৮৩ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে উপদেশ দিতে গিয়ে এরশাদ মুখোমুখি হলেন সিভিল সমাজের ঘৃণার। জানুয়ারি মাসে আলবদর এবং প্রতারক হিসেবে পরিচিত আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক সমাবেশে এরশাদ বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারিতে হওয়া উচিত কুরআনখানি ও মোনাজাত এবং শহীদ মিনার বা রাস্তায় আল্পনা আঁকা উচিত নয়। জামায়াতে ইসলামেরও একুশ সম্পর্কে মূল্যায়ন ছিল এ রকম। এ উক্তিতে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এরশাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলোও এবার অগ্রসর হয়। আওয়ামী লীগ, জাসদ, বাকশাল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, ওয়াকার্স পার্টি, গণ আজাদী লীগ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয় ১৫ দল। অন্যদিকে বিএনপি, ইউ পি পি, কমিউনিস্ট লীগ, জাতীয় লীগ প্রভৃতি গঠিত হয় ৭ দল। মূলত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-ই ছিল দু'জোটের প্রধান।[১২৮]

১৫ দলীয় জোট ঘোষণা করে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ গণমিছিল বের করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিছিল বের হয়। দুইদিন ধরে রাজপথে খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিশেষ করে ১৫ তারিখ পুলিশ ছাত্রমিছিলের ওপর পাখি শিকারের মতো গুলি করে। ঐ দিন, শিশু একাডেমীতে শিশুদের একটি অনুষ্ঠান চলছিল পুলিশ সেখানে অবস্থানরত শিশুদের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর প্রতিবাদে সারা দেশেই বিক্ষোভ দিবস পালিত হয়। জাফর, জয়নাল এবং জগন্নাথ কলেজের ছাত্র মোজাম্মেল পুলিশের গুলিতে নিহত হন। প্রেসনোটের ঘোষণা অনুয়ায়ী, সারা দেশে ১৪০০জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। জারী করা হয় সান্ধ্য আইন। সরকার ঘোষণা করে– "এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ও তত্ত্বাবধানে কিছুসংখ্যক বিপথগামী ছাত্র ও দুস্কৃতকারী সামরিক আইন লঙ্ঘন করে এক সন্ত্রাসজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাদের সভা সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। তারা সরকারবিরোধী আপত্তিকর ও উস্কানিমূলক শ্লোগন দেয়।"[১২৯] এখানে লক্ষণীয়, সামরিক সরকার (পাকিস্তান আমলে ও বাংলাদেশে জিয়ার আমলে) রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে যে রকম উক্তি করেছিল এরশাদও তাই করেছেন। অন্যদিকে সিভিল সমাজের মাধ্যমিক কারকরা যে প্রতিরোধের আয়োজন করেছিল ২২টি দলের জোট বাঁধাতে তা সংহত হল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কারকদের প্রতিরোধের ফলে এরশাদ ১লা এপ্রিল ১৯৮৩ থেকে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমোদন করেন। ইতোমধ্যে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক বাবলু সামরিক বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলায়। এ ঘটনায় অনেকে খানিকটা বিস্মিত হলেও ছাত্ররা হতবাক হয় নি। কারণ, সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা যে রাজনৈতিক দলসমূহে ভাঙ্গন ধরাতে চাইবে ও চাইছে তা কম-বেশী

সবাই জানত। তিনমাস পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খুললেও ছাত্ররা কালো ব্যাজ পড়ে সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদ জানায়, শোক পালন করে।[১৩০]

১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুইজোট সমঝোতার ভিত্তিতে পাঁচদফা দাবী প্রণয়ন করে। দফাগুলো হল–

১। অবিলম্বে সামরিক আইনের শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

২। অবিলম্বে দেশে জনগণের সকল মৌলিক অধিকারসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার উপর বিধি-নিষেধ তুলে নিতে হবে।

৩। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে অন্য যে-কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই কেবল সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সংবিধান সংক্রান্ত যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবল জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে। অন্য কারো নয়।

৪। রাজনৈতিক কারণে আটক বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দণ্ডিত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

৫। ১৯৮৩ সালের মধ্য-ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্র হত্যাসহ সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ যাবৎকাল ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যার তদন্ত, বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি, নিহত আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক-ক্ষেতমজুরসহ সকলের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সামরিক সমাজ আবার পিছু হটে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ‘সংঘাতের রাজনীতির ভয়াবহতা অনুধাবনের’ আহ্বান জানায়। এর দু’সপ্তাহ পর প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এবং ১৯৮৪ সালের ২৪শে মে প্রেসিডেন্ট ও ২৫শে নভেম্বর সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে।[১৩১]

ক্ষমতাদখলের অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া বৈধকরণের জন্য ১৮৮৫ সালের ৬ই এপ্রিল জেনারেল এরশাদ সেনা পাহারায় গণভোটের আয়োজন করেন। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকা জন্য গণভোটে ৭২.১৪% ভোটারের হ্যাঁ সূচক সম্মতি আদায় করে তিনি নিজের অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার চেষ্টা করেন।[১৩২] জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় জেনারেল এরশাদ ১লা জানুয়ারি ১৯৮৬ জাতীয় পার্টি গঠন করেন এবং মার্চ ১৯৮৬ সালে

সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। প্রধান রাজনৈতিক জোটগুলো এ ব্যাপরে তাদের অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে।[১৩৩]

রাজনৈতিক দলসমূহ সামরিক শাসন প্রত্যাহার, সামরিক আইনে গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি এবং মৌলিক অধিকারের পুনর্বহালের দাবীতে আন্দোলন চালতে থাকে। বিরোধী দলসমূহ নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দিলে জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক দলসমূহকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ না নিলে সামরিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে। এমতাস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।[১৩৪]

এরশাদ শাসনামলে **১৯৮৬** সাল গুরুত্বপূর্ণ। এ বছরের শুরুতেই প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেদিন থেকেই সামরিক শাসনবিরোধী সভা-সমাবেশ মিছিল শুরু হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শেরেবাংলা নগরে এক বিশাল জনসভায় শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন– "সামরিক শাসনের চির অবসান চাই।"[১৩৫] সামরিক কর্মকর্তারা কীভাবে সিভিল সমাজকে শাসন করতে চায় সেই প্যাটার্নের উল্লেখ করে তিনি বলেন– "প্রথমে কিছু উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা রাতের আঁধারে অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করে। তারপর সমাজে ঘৃণিত দুর্নীতিবাজ দলছুটদের নিয়ে একটি দল গঠন করে। আর সেই দলকে দিয়ে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার প্রয়াস পায়।"[১৩৬] এরশাদ চার বছরেও অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করতে পারেন নি। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঘোষিত সংসদ নির্বাচন সম্পর্কেও শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের লালদীঘির ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা দেন– "সামরিক আইনকে গণতন্ত্রের লেবাস পরানোর নির্বাচনী নাটক যে-কোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে।"[১৩৭] **২৫**শে মার্চ রাতে **১৫** ও **৭** দল সারারাত বৈঠক করে। **১৫** দলের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে মত দেয়। খালেদা জিয়া নির্বাচনে যেতে অস্বীকার করেন। দুই জোটের দু'রকম সিদ্ধান্ত সিভিল সমাজকে বিদীর্ণ করে। শেখ হাসিনা এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যান। তিনি নির্বাচনে যাওয়াতে সিভিল সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলের সমর্থকরা খালেদা জিয়াকে 'আপোষহীন নেত্রী' হিসেবে প্রচার করতে থাকে। এর প্রভাব পড়ল শিক্ষাঙ্গনে। ৭ দলীয় জোটভুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলো জানাল, যারা নির্বাচনে গেছে তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ মিছিল করতে দেওয়া হবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে এক সংঘর্ষে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী মাজহারুল হক আসলাম নিহত হয়। যদি শেখ হাসিনা নির্বাচনে জিততেন তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতো। কিন্তু সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচনে যে জেতা যায় না সেটি তিনি হিসেবের মধ্যে নেন নি। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি এরশাদ নির্বাচনে জয় লাভ করে আরও চার বছর শাসন চালাবার বৈধতা পায়। অন্যদিকে **১৫** দল ভেঙ্গে পরিণত হয় ৮ দলে।[১৩৮] **৭**ই মার্চ **১৯৮৬** সালে তৃতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সারণি ১.৯ : তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[১৩৯]

রাজনৈতিক দল	**প্রাপ্ত আসন**
জাতীয় পার্টি	১৫৬
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬
জামায়াতে ইসলামী	১০
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৫
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান)	-
মুসলিম লীগ ও ডেমোক্রেটিক লীগ (যৌথভাবে)	-
মুসলিম লীগ	৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-
জাসদ (রব)	৪
জাসদ (সিরাজ)	৩
ওয়ার্কাস পার্টি	৩
গণফ্রন্ট	-
জাতীয় লীগ	-
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	৭
স্বতন্ত্র	৩২
মোট	৩০০

Dhaka University Institutional Repository

এই নির্বাচনে কারচুপি করে জাতীয় পাটি নিজেদের অনুকুলে ফলাফল নিয়ে আসে। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার এক পর্যায়ে কমিশন হঠাৎ করে মাঝরাতে ফলাফল ঘোষণা বন্ধ করে দেয় এবং পরবর্তীকালে (রাজনৈতিক দলগুলোর মতে এবং যা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়) একটি বানোয়াট ফল ঘোষণা করা হয়।[১৪০] এ নির্বাচনে সংসদের ৩০০ আসনের জন্য ১৫২৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ২৮টি রাজনৈতিক দল তাদের ১০৭৯জন প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করে। তৃতীয় জাতীয় সংসদে এরশাদের জাতীয় পার্টি ১৫৬টি আসন পায় এবং আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী যথাক্রমে ৭৬ এবং ১০টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ সংসদে বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসন জাতীয় পার্টি লাভ করে। সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন বসে ১০ই জুলাই। তবে দেশে সামরিক আইন জারী থাকার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ তা বর্জন করে সংসদ এলাকায় প্রতীকী অবস্থান ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। তৃতীয় জাতীয় সংসদের মেয়াদ ১৩ই জুলাই ১৯৮৭ পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এ সময়কালে সর্বমোট ৪টি অধিবেশন বসে। এ সংসদে ৭৫ কর্মদিবসে ৩৮টি আইন পাস করে। সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংবিধানের ৭ম সংশোধনী প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে পাস করা হয় এবং ২৪শে মার্চ ১৯৮২ থেকে সামরিক আইন জারীসহ সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেওয়া হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে ২৭৯৬টি তারকা চিহ্নিত, ৫৭৫টি তারকাবিহীন এবং ৮টি স্বল্পকালীন প্রশ্ন উত্থাপন ও উত্তর প্রদান করা হয়।[১৪১]

উক্ত দুই অধিবেশনে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ২০৯টি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, যার মধ্যে মাত্র ৫টি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় জাতীয় সংসদের ৪টি অধিবেশনে ৬৮০টি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের মধ্যে ১২৪টির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রিভিলেজ প্রশ্নে ৮৫টি প্রস্তাব আসে এবং এর মধ্যে ২০টি আলোচিত হয়। তৃতীয় অধিবেশনে অর্ধঘণ্টা আলোচনার জন্য ১৬টি প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র একটি গৃহীত হলেও তা বাতিল হয়ে যায়। তৃতীয় জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল ছিল স্বল্প এবং এ সংসদ নির্বাচনে অন্যান্য রাজনৈতিক দল অংশ না নেওয়ায় এবং প্রধানত সরকারের বিপক্ষে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী অসৎ উপায় অবলম্বনের অভিযোগ থাকায় তা জনসমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হয়।[১৪২]

সিভিল সমাজ কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

১৯৮৭ সালের মার্চে মাসে সিভিল সমাজের ৩১জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতির মাধ্যমে দল নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশ এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। সবচেয়ে যা ভয়াবহ তা হল, দেশের প্রায় সকল পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়েছে। এ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে তাঁরা বলেন– “এই নৈরাজ্য হতে মুক্তির পথ

Dhaka University Institutional Repository

অবিমিশ্র গণতন্ত্র। সন্ত্রাসের মাঝে মানুষের ভোটাধিকার হরণের মাধ্যমে যে তথাকথিত প্রহসনমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা হতে দেশকে মুক্ত করতে সংবিধানের পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রকৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ জন্য সংবিধানের অধীনে দল নিরপেক্ষ চরিত্রবান ব্যক্তির সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা হবে; সেই সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে সর্বজনীন গণতান্ত্রিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সর্বনিম্ন সময়ে দলীয় ভিত্তিতে সুষ্ঠু সন্ত্রাসমুক্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, যে জনপ্রতিনিধিগণ সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে যে অগণতান্তিকতা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গনে প্রবেশ করেছে তার নিরসন করবেন। রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত এবং সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিমুক্ত করবার পদক্ষেপও তারা গ্রহণ করবেন।"[১৪৩] সমাজে যে নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য বিরাজমান তা হতে মুক্তির এটিই একমাত্র পথ। বিরোধী রাজনৈতিক জোটগুলো সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করে। যদিও বিরোধী সব রাজনৈতিক দল একই কর্মসূচী পালন করছিল, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ বা বিদ্বেষ তাদের কখনই অপনোদিত হয় নি। প্রতিটি দল আবার উপদলে ছিল বিভক্ত। তা সত্ত্বেও সিভিল সমাজ ছিল যথেষ্ট উজ্জীবিত। এ মনোভাব বোঝা যায়, সংসদে সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদ বিল উত্থাপন করলে। ১২ই জুলাই (১৯৮৭) স্থানী সরকার (জেলা পরিষদ) সংশোধনী বিল পাস করিয়ে নেওয়া হয় কয়েক মিনিটের মধ্যে। এ বিলে জেলা পরিষদে সামরিক কর্মকর্তাদের বেসামরিক প্রশাসনের জড়িত করার ব্যবস্থা ছিল। এর আগের দিন টঙ্গীতে এক বিশাল সভায় খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন– জেলা পরিষদে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি গ্রহণসহ প্রশাসনের সামরিকীকরণের সরকারের যে-কোনো উদ্যোগ সহ্য করা হবে না। বিল সংসদে পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দল সংসদ ত্যাগ করে এবং পরদিন এর প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান করে। যথাযথভাবে হরতালও পালিত হয়। বিরোধী দলগুলোর দাবী পরিণত হয়– এক দফায়। সে এক দফা হল, এরশাদের পদত্যাগ।[১৪৪] আন্দোলনের মুখে এরশাদ বিলে স্বাক্ষর না করে তা ফের বিবেচনার জন্যে সংসদে প্রেরণ করেন।

২৮শে অক্টোবর ১৯৮৭ সালে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া, হাসিনার বাসভবনে একান্ত বৈঠকে মিলিত হয়ে এক যৌথ বিবৃত প্রদান করেন। তাঁরা যৌথ ঘোষণায় বলেন– "স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটানোর জন্য আমরা ১লা ও ১০ই নভেম্বরসহ আন্দোলনের সকল কর্মসূচীর সাফল্যের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাব। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ১৯৭১-এর চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের লক্ষ্য। এরশাদের সরকারের পদত্যাগের লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে আমরা আহ্বান জানাই।"[১৪৫] এ ঘোষণা সিভিল সমাজকে তুমুলভাবে আলোড়িত করে, কারণ সিভিল সমাজের ইচ্ছাই ছিল যৌথ আন্দোলন। ১০ই নভেম্বর 'ঢাকা অবরোধ' ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকার ঢাকায় আসার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিন জোটের এই কর্মসূচীতে বিপুলসংখ্যক মানুষ সমবেত হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় নূর হোসেন নামের আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। তার বুকে সাদা রঙে লেখা

ছিল "স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক"; পিঠে লেখা ছিল "গণতন্ত্র মুক্তি পাক"। শুধু গুলি নয়, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দী করা হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। এর বিপরীতে সিভিল সমাজও প্রত্যুত্তর দেয় শুধু হরতাল করে নয়, রেললাইন তুলে, পুলিশ বক্সে আগুন লাগিয়ে, মন্ত্রীর বাসা আক্রমণ করে। সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২৩জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে বলেন, দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে এরশাদ ২৭শে নভেম্বর ১৯৮৭ সালে সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের সংসদ সদস্যরা পদত্যাগ করে সংসদ থেকে বেরিয়ে আসেন।[১৪৬]

বিরোধী জোটের আন্দোলন জোরদার হওয়ার প্রেক্ষাপটে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৭ তৃতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং জরুরী অবস্থা বলবৎ করা হয়। চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ৩রা মার্চ ১৯৮৮ তারিখে। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক জোট এবং দল এ নির্বাচন বয়কট করে। নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন পায় এবং ৭৬ দলের সমন্বয়ে জাসদ (রব)-এর নেতৃত্বে কথিত 'অনুগত বিরোধী দল' ১৯টি আসন লাভ করে। উল্লেখ্য যে চতুর্থ সংসদে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় সংরক্ষিত কোনো নারী আসন ছিল না।[১৪৭] তিনজোট তাতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। ফলে, নির্বাচন হয় প্রহসনমূলক। এতে, এরশাদের বৈধতা অর্জনের চেষ্টা আবার ব্যর্থ হয় এবং শুধু দেশের সিভিল সমাজের কাছে নয়, দেশের বাইরেও তিনি ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।[১৪৮] গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এরশাদ নির্বাচনী প্রথাকে এমনভাবে বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন যে, সিভিল সমাজের যেন সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে যায় নির্বাচন থেকে এবং তারা নির্ভর করে সামরিক আমলাতন্ত্রের ওপর। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সামরিকায়নের এটি ছিল একটি প্রচেষ্টা।[১৪৯] চতুর্থ জাতীয় সংসদে ১৬৮টি কর্মদিবসে সর্বমোট ৭টি অধিবেশন হয় এবং ১৪২টি আইন পাস হয়। এ সংসদে ৫৮১২টি তারকাযুক্ত, ৯৩১টি তারকাবিহীন এবং ৯টি স্বল্পকালীন প্রশ্ন গৃহীত হয় ও উত্তর প্রদান করা হয়। ৩৩৭টি মুলতুবী প্রস্তাবের মধ্যে ৫টির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দৃষ্টি আকর্ষণী-সংক্রান্ত ১৪৫৯টি নোটিশের ১৫১টি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয় এবং জনগুরুত্ব সম্পর্কে স্বল্পকালীন আলোচনার ক্ষেত্রে ৫৬টি নোটিশের মধ্যে ৯টির ওপর আলোচনা চলে। প্রিভিলেজ প্রশ্নে ৬৬টি নোটিশের ১০টি গ্রহণ করা হয়। তবে এ সকল সংসদীয় কর্মকাণ্ড নির্বাহী নিয়ন্ত্রণের পরিচায়ক ছিল না। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে সংসদের স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন থাকে ফলে নির্বাহীর স্বার্থবিরোধী বা প্রধান জাতীয় ইস্যু নিয়ে বিতর্ক বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ ও জনসমর্থিত না হওয়ায় বৈধতার সঙ্কট সৃষ্টি হলে সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। চতুর্থ সংসদে নির্বাহী আদেশ অনুমোদন অব্যাহত থাকে এবং জেলা পরিষদের মতো বিতর্কিত বিল এবং সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিল পাস করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৯ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদে সংবিধানের নবম সংশোধনী বিল সংসদে পাস করে রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি প্রত্যেকে পাঁচ বছর মেয়াদী দুই টার্ম ক্ষমতায় থাকার বিধান চালু করা হয়।[১৫০]

এরশাদের সময় নির্বাচনে কারচুপি ও সংঘর্ষ

১৯৮৫ সালের ১৬ই ও ২০মে দুই পর্যায়ে ৪৬০টি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন হয়।[১৫১] ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আপত্তির কারণে বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলার নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। এ ছাড়া আইন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে আরও ২৫টি উপজেলার নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে সীমানা নির্ধারণের জন্য আদালতে মামলা ঝুলছে। অপর দু'টি উপজেলায় দু'জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হন। ফলে ৪২৬টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১৫২] গোলযোগ হয় ২০০টি নির্বাচন কেন্দ্রে এবং নিহত হয় ৮জন। নির্বাচনে ভোটাররা উৎসাহী ছিলেন না এবং গড়ে ভোট পরে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ। *একতা* পত্রিকা মন্তব্য করে, অতীতে দেশে কোনো নির্বাচনেই এত বেশী হাঙ্গামা হয় নি। অনেক জায়গায় যেমন, শ্রীনগরে "প্রার্থী সমর্থকদের চাপের ফলে যে গ্রামের জন্য যে ভোট কেন্দ্র নির্দিষ্ট ছিল সেখানে ভোট না দিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো কেন্দ্রে ভোট দিয়েছে। ভোটার নয়, প্রার্থী ও সমর্থকরা ইচ্ছামতো ভোট দিয়েছে। একটি কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ২১২৪জন। ঐ কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ২০৩৫টি। এই কেন্দ্রে ১০০ পাতার ব্যালট প্রার্থী সমর্থকদের হাতে একবারে ছিঁড়ে না দেওয়ায় সহকারী প্রিজাইডং অফিসারকে নাজেহাল হতে হয়েছে।"[১৫৩] লস্করপুরে প্রিজাইডিং অফিসারকে গৃহবন্দী ও আলিমপুরে প্রিজাইডিং অফিসারকে লাঠিপেটা করা হয়। পত্রিকাটি মন্তব্য করে– 'ভোট নামক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ন এবং দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।'[১৫৪]

উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পূর্বেই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদেশী পর্যবেক্ষক আসবেন বলে সরকার বলেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার তার কথা রক্ষা করতে পারে নি। তদুপরি যারা স্বেচ্ছায় এসেছিলেন তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় নি। যারা আসেন সরকার তাদেরকে গাইড করতে চান। এতে পর্যবেক্ষক দল রাজী হন নি। তবে ঢাকাস্থ বিদেশী কূটনীতিকরা একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল গঠন করেন। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে যান এবং নির্বাচন পযবেক্ষণ করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা ও গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে বেশ কিছু স্থানীয় পর্যবেক্ষক দল গঠন করা হয়। এদিকে ফাদার টিমের নেতৃত্বে পর্যবেক্ষক দল উপজেলা নির্বাচন সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে দেখা যায়, 'এই নির্বাচনকে সৎ ও সুষ্ঠু করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন।'[১৫৫] মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ ওয়াশিংটনভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের পর্যবেক্ষকরা ১০টি উপজেলায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে বলেন, 'প্রভাবশালীদের প্রভাব নির্বাচনের নিরপেক্ষতা এবং সুষ্ঠু পরিবেশ ক্ষুণ্ন করেছে।' ফাদার টিম আরও বলেন, অনেক কেন্দ্রেই সকালবেলা ভোট ভালোই চলছিল। কিন্তু দুপুর গড়াতে না গড়াতেই প্রভাবশালীদের দাপটে ভোটে মারাত্মক কারচুপি শুরু হয়। শুরু হয় সন্ত্রাস।

বিভিন্ন স্থানের খবর বিশ্লেষণ করে এ দল বলেন, নির্বাচনের কারচুপির সঙ্গে মন্ত্রীবর্গও যে জড়িত ছিলেন তার প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে।[১৫৬]

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অবাধ নির্বাচন গণকমিশনের আমন্ত্রণে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দু'জন সদস্য ও বিবিসির একজন সাংবাদিক ঢাকায় আসেন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে। তাঁরা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন– "যদিও তাঁদের তিনজনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন; কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিষ্কার ও অভিন্ন। এতে অপরাহ্নে সশস্ত্র ব্যক্তিদের দ্বারা ভোট গ্রহণ নস্যাৎ করার কথা বলা হয়। তাঁরা লাঙ্গল ব্যাজধারীদের (জাতীয় পার্টি) উল্লেখ করে বলেন, নির্বাচনে কারচুপির জন্য প্রধানত জাতীয় পার্টি দায়ী। যে নির্বাচন বাংলাদেশে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারত ও হওয়া উচিত ছিল তাকে জাতীয় পার্টি গণতন্ত্রের জন্য ট্রাজেডিতে পরিণত করেছে।"[১৫৭] ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী–

১. এমন কোনো আসন খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে জাপা প্রার্থীর বিজয়ী হয়েছেন অথচ সন্ত্রাস হয় নি।

২. বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে কখনও ভোটকেন্দ্রে সেনাবাহিনী দেখা যায় নি যা এবার দেখা গেছে।

৩. বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বেতার-টেলিভিশনে যেভাবে ফলাফল রদবদল ঘোষিত হয়, সন্ধ্যা ছ'টায় ফলাফল ম্যালিপুলেশনের তথা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ক্যু ঘটেছে বলে জনমনে প্রবল সন্দেহ ছড়িয়ে পড়েছে।[১৫৮]

স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায় এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। পরাজিত শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন– "সরকার ও জাতীয় পার্টি এবার শুধু ভোটের কারচুপিই করে নাই, ভোট ডাকাতি করেছে।"[১৫৯] এরশাদ এভাবে সব রকমের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করত।

দু'টি উদাহরণ উল্লেখ করছি। ১৯৮৭ সালে নওগাঁয় উপ-নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মাহবুব জামান লক্ষাধিক ভোট পান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী পান ১৬ হাজার ভোট। অথচ আসনটি সব সময় ছিল আওয়ামী লীগের।[১৬০]

এরশাদের এই নির্বাচনের সামরিকায়নের বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছিল। বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার (বাখরগঞ্জ-৪) নির্বাচনী ফলাফল ঝালকাঠির জেলা জজ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে এক রায়ে বাতিল করেন। ঐ আসনে জাতীয় পার্টি মাইদুল ইসলামকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছিল। সম্ভবত এই প্রথম বাংলাদেশে কারো আসন বাতিল করা হয়। ট্রাইব্যুনাল তার রায়ে যে মন্তব্য করে তাতেই এরশাদ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট হবে– "প্রকৃতপক্ষে কোনো নির্বাচন হয় নি... ভোটাররা ভোট দিতে পারে নি... বাদী-বিবাদি উভয়ে ভোট কেন্দ্র দখল করে ব্যালটে সিল মারার প্রতিযোগিতা করেছে– ভোটারের চেয়ে ব্যালট বেশী, রিটানিং অফিসার খেয়াল-খুশি মতো ভোটের সংখ্যা বসিয়ে মাইদুল ইসলামকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন... এরূপ কার্যকলাপ

দেশে চলতে থাকলে দানবীয় শক্তির কাছে ভালো মানুষকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।"[১৬১] ১৯৮৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ৩০০০ কেন্দ্রে সংঘর্ষ হয়েছিল। এরশাদ চেয়েছিলেন এভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সর্ম্পকে মানুষকে আস্থাহীন করে তুলতে। মানুষ আস্থাহীন হয়েছিল নির্বাচন নিয়ে নয়, বরং এরশাদকৃত নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে এবং নির্বাচনের এই সামরিকায়নের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই সিভিল সমাজে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং সারা দেশ জুড়ে দাবী ওঠে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর সুষ্ঠু নির্বাচনের ভার অর্পণ করতে হবে যাতে সিভিল সমাজের প্রতিনিধিরা সার্বভৌম একটি সংসদ গড়ে তুলতে পারে। অন্তিমে এরশাদকে দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। [১৬২]

১৯৯০ সালের উপজেলা নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কারচুপি কোথাও সন্ত্রাসের মাধ্যমে, কোথাও টাকা বা ক্ষমতার সুবাদে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ৯০টি উপজেলায় গোলাগুলি আর খুনাখুনিতে মারা গেছে ২২জন, আহত হয়েছে হাজারের উপর। ভোট প্রদান ও ভোট গ্রহণের চেয়ে স্থগিতের হারও কম নয়। ঘোষিত ফলাফল নিয়ে প্রতিবাদ, হরতাল, অবরোধ, অগ্নিসংযোগ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাত্রায় নতুন সংযোগ হয়। এই নির্বাচনে প্রার্থীরা দল-মত নির্বিশেষে সবাই কারচুপি করেছেন।[১৬৩] তবে সরকার সমর্থকরা সুবিধা বেশী পেয়েছেন। এ সব প্রার্থী তিনটি পন্থা অনুসরণ করেছেন :

এক. নির্বাচনের পূর্বেই ব্যালট পেপারে সীল মেরে বাক্সে ভরে দেওয়া, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে কয়েকজন মন্ত্রী এই পদ্ধতি চালু করেন। ১৯৯০ উপজেলা নির্বাচনে সর্বপ্রথম টেকনাফে এটি চালু করা হয়। খবর ছড়িয়ে পড়ায় এবং নির্বাচন স্থগিতসহ অপরাধীরা গ্রেফতার হওয়ায় সেটি আর ছড়াতে পারে নি।

দুই. নির্বাচন শুরু হবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কেন্দ্র দখল করে ব্যালট বাক্স ভরে দেওয়া, এটি সহিংসতার সঙ্গে ঘটেছে হাটহাজারী, বেড়া, ছাগলনাইয়া, মাধবপুর, কোম্পানীগঞ্জ, মতলব ইত্যাদি উপজেলায়। মতলব উপজেলার নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সারোয়ার অদুদ চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, আমি নিজেই ভোট দিতে পারি নি। নির্বাচনের আগের দিন একজন ক্ষমতাবান প্রাক্তন মন্ত্রী জাতীয় পার্টির সশস্ত্র ব্যক্তি ও প্রশাসনের সহায়তায় আমার নিজস্ব কেন্দ্রসহ ৬টি ইউনিয়নের প্রিজাইডিং অফিসারদের আটক রেখে প্রায় সবকটি কেন্দ্রের ব্যালট পেপারে জাপা প্রার্থীর পক্ষে সীল মারানোর ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে সরকার সরকার সমর্থক নন এমন প্রার্থীও কিন্তু নীরবে বসে ছিলেন না।

তিন. ভোট ডাকাতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোটকেন্দ্র দখল করা, পর্যবেক্ষকদের মতে, ১৯৯০-এর উপজেলা নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটার ছিল খুবই নগণ্য, কিন্তু ভোট পড়েছে অনেক বেশী। এই নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন স্থানের ভোট কেন্দ্রগুলোতে প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ, বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, বোমাবাজি আর ভোটারবিহীন উৎসব।

এই নির্বাচনে প্রধান বিষয় ছিল ভোট ছিনতাই, ভোট ডাকাতি এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা। মানবাধিকার সমন্বয় কাউন্সিল পর্যবেক্ষক দল তাদের পর্যবেক্ষণে বলেছেন, সরকারের কৃষি প্রতিমন্ত্রী কোনো এক জনসভায় বলেন, জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে ভোট না দিলে সরকারী সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যাবে। পর্যবেক্ষক ফাদার টিম তাদের বক্তব্যে বলেন, দুপুর ১টার মধ্যে নওয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোট সম্পূর্ণ করা হয়। এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা।[১৬৪]

১৯৯০ সালের উপজেলা নির্বাচনে ব্যালট ছিনতাই, ভোট ডাকাতি, ভোটকেন্দ্রে সন্ত্রাস একটি নিয়মমাফিক ব্যাপার ছিল তারই প্রমাণ দৈনিক পত্রিকাগুলোতে পাওয়া যায়। ১৪ই মার্চ থেকে ১২ দিন ধরে উপজেলা নির্বাচন চলে। এই সম্পর্কিত কিছু কিছু পত্রিকার শিরোনাম নিচে দেওয়া হল :

টেকনাফে বিক্ষুব্ধ জনতার ঘেরাও, বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে সীল মারা, ১৭ হাজার ব্যালট পেপার উদ্ধার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অপসারিত, শেষ পর্যন্ত ফাদার টিমের অনুমতি মিলল না, চট্টগ্রামে দু'টি উপজেলায় সন্ত্রাস, গুলি-৬টি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত, হাটহাজারীতে নির্বাচনী মিছিলে গুলি, আহত ২০, ভোটবাক্স ছিনতাই, কেন্দ্র দখল, লোহাগাড়ায় ব্যাপক সন্ত্রাস : নিহত ১ আহত ২৫, শ্রীপুরে ভোটার কম ভোট বেশী, ভুয়া ভোটে ছড়াছড়ি উপজেলা নির্বাচন। নিহত ৩, ইউএনও কার্যালয় ঘেরাও, জাতীয় পার্টি ভোট ডাকাতি ছাড়া একটি আসনেও জয়ী হতে পারছে না, ভোট কেন্দ্র দখলের ব্যর্থ চেষ্টা, চেয়ারম্যান প্রার্থী গুলিবিদ্ধ, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নিহত, গোপালগঞ্জে প্রিজাইডিং অফিসার অপহরণ, নোয়াখালীতে গুলি, প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে প্রার্থিতা প্রত্যাহার, প্রার্থী অপহৃত, প্রিজাইডিং অফিসারসহ বহু আহত, কাউখালীতে প্রার্থী নিখোঁজ, ভোট কারচুপিতে মন্ত্রীরা সরাসরি জড়িত, গুলিতে ছাত্র নিহত, আহত অর্ধশতাধিক, দু'জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার গ্রেফতার, উপজেলা নির্বাচনে কারচুপি ও সন্ত্রাস, সাভারে নিহত ১। চাটখিলে ৩টি কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ, ছাত্র গুলিবিদ্ধ, সংঘর্ষ, ভোটকেন্দ্র দখল, খুলনায় সংঘর্ষ আহত ৩০ জন ৫,০৯৮টি ব্যালট পেপার কোথায় গায়েব হল ইত্যাদি।[১৬৫] নির্বাচন কমিশন তাদের সীমিত ক্ষমতায় ১৯৯০ সালের উপজেলা নির্বাচন পরিচালনা করেন। তবে নির্বাচনের ফলাফল যাচাইয়ের প্রক্রিয়া অনেকটা জটিলতর হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন ফলাফল গোপনে রাজনৈতিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করে। এই পদ্ধতিটি পূর্বে ছিল না। রিটার্নিং অফিসারেরা নির্বাচনী ফলাফল পাঠানোর সময় প্রার্থীদের রাজনৈতিক পরিচয় দিয়েছেন, আর কমিশন সচিবালয় থেকেও ফলাফল সংগ্রহের সময় প্রার্থীদের রাজনৈতিক পরিচয় জানতে চাওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে 'কন্ট্রোল রুম' বা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়। এ ছাড়াও নির্বাহী বিভাগে একটি হটলাইন স্থাপন করা হয়েছিল। নিরাপত্তায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের উপর নির্দেশ ছিল 'ডেথলেস' নির্বাচন করতে হবে। বাস্তবে ঘটেছে এর বিপরীত। সরকারী সূত্র অনুযায়ী উপজেলা নির্বাচনে নিহতের সংখ্যা ১৬জন। বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস, ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপকহারে ভোটপ্রদান আর ককটেল-বোমা ফোটানোর মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে উপজেলা নির্বাচন ১৯৯০।[১৬৬]

এরশাদের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান

নব্বই সালের গোড়া থেকেই এরশাদের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ফেব্রুয়ারিতে খালেদা জিয়া সাতদলীয় জোটের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেন– এক দফা আন্দোলন জোরদার করতে হবে। এই এক দফা ছিল এরশাদ সরকারের পতন। অন্যান্য জোটও বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করতে থাকে যার মধ্যে হরতাল ছিল প্রধান। এপ্রিলে, বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে আওয়ামী লীগের এক জনসভা থেকে ঘোষণা করা হয়– "দেশের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যে সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করতে বাধ্য থাকবে। তবে, নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।"[১৬৭] ১৯৯০ সালে জুলাই মাসে ৮, ৭ ও ৫ দল অভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে সারা দেশে ২৯ই জুলাই 'গণবিক্ষোভ দিবস' পালনের আহ্বান জানায় এবং সাফল্যের সঙ্গে তা পালিত হয়। এরশাদ পতনের আন্দোলন গতি পায় অক্টোবর থেকে। ১০ই অক্টোবরে সমস্ত বিরোধী দল সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী ঘোষণা করে। 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' শ্লোগান দিয়ে ছাত্র-জনতা মুখোমুখি হয় বিডিআর (তৎকালীন), সশস্ত্র পুলিশ ও জাতীয় পার্টির কর্মীদের। মতিঝিলে জাতীয় পার্টির অফিস থেকে গুলি ছুড়লে ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন ১৭জন ও নিহত হন তিনজন (মতান্তরে বিভিন্ন জায়গার সংঘর্ষে নিহত হন ৫ জন) নিহতদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাহিদ হোসেন। ছাত্ররা জাহিদ হোসেনের লাশ ক্যাম্পাসে নিয়ে আসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা নেত্রীর তাঁর লাশ দেখতে আসেন। ক্যাম্পাসে এক আবেগময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে বাদ দিয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। ১০ই অক্টোবর থেকে পরবর্তী কয়েকদিন রাজপথে মিছিল, সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ১২ই অক্টোবর এক সমাবেশে ছাত্রনেতারা ঘোষণা করেন– যদি দুই নেত্রী ঐক্যবদ্ধ না হন তাহলে তাদের দু'জনের বাসভবন ঘেরাও করা হবে। ১৩ তারিখে তেজগাঁয় নিহত হন মনিরুজ্জামান নামে এক ছাত্র। ঐ দিনই সরকার ঢাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন।[১৬৮]

এ সময় সিভিল সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এরশাদ, সামরিক বাহিনী ও জাতীয় পার্টির দুর্নীতি, নিপীড়ন ও সিভিল সমাজবিরোধী কার্যকলাপ তুলে ধরা ও তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান। এরশাদ পতনের বছর পতনের বছর দু'তিনেক থেকেই এই ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐ সময় বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকা পালন করে বিশেষ ভূমিকা। লেখক এবং সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদকদের এই ভূমিকা সিভিল সমাজে এরশাদ ও জাতীয় পার্টি বিরোধী মনোভাব সংহত করে ও তা প্রতিরোধে মানসিক শক্তি যোগায়।

এরশাদ পতনের দিন নির্দিষ্ট হয়ে যায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে। ছাত্রদের সমর্থন জানায় পেশাজীবীরা। রাজনৈতিক দল বা জোটগুলোর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তখনও ছিল। কিন্তু, মাধ্যমিক কারকদের ঐক্যের ফলে তাঁরাও সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের। অন্যদিকে, স্বৈরাচারী সরকার তার সমগ্র শক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করতে চেয়েছে যার প্রমাণ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘটনাবলী। ১০ই অক্টোবরের পর যৌথ নেতৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ও পেশাজীবীরা রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর এ পরিপ্রেক্ষিতে চাপ অব্যাহত রাখে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে "ছাত্র সমাজকে সকল ভেদাভেদ ও দলীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে পাড়ায়-মহল্লায়, গ্রাম-গঞ্জে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কমিটি গঠনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের লক্ষ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। শুধু তাই নয়, ১৯ই অক্টোবর ১৯৯০-এ গণ-আন্দোলনের নিহতদের স্মরণে এক শোক মিছিল শেষে ছাত্র ঐক্যের সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হয় সরকার পতন না ঘটিয়ে তারা ঘরে ফিরবেন না। ২৪ তারিখ দেশের ৬৪জন বিশিষ্ট ব্যক্তি জোট ও বিভিন্ন দলের প্রতি চলমান আন্দোলনকে গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত করার আহ্বান জানান। ২৭ তারিখ রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে রেল ও মহাসড়ক অবরোধের আহ্বান জানানো হয়।[১৬৯]

এরশাদ সরকার গড়ে ওঠা ঐক্য বিনষ্ট করতে না পেরে আন্দোলন থেকে দৃষ্টি ফেরানোর জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন যোগায়। ভারতে তখন বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পাঁয়তারা চলছিল। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে 'দৈনিক ইনকিলাব' প্ররোচনামূলক সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। উল্লেখ্য, 'ইনকিলাব'-এর মালিক আব্দুল মান্নান ছিলেন এরশাদের সহযোগী। ৩১শে অক্টোবর সারা দেশে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সরকার স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ক্রিয় থাকে। সিভিল সমাজ ও রাজনৈতিক নেতাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় দাঙ্গা রোধ করা সম্ভব হয়। প্রাণহানি না হলেও ব্যাপকভাবে হিন্দুমন্দির ধ্বংস ও সম্পত্তি লুট হয়। তবে, স্বৈরাচারী সরকার যে লক্ষ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল তাতে সফল হয় নি। নাগরিক সমাজকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যায় নি।[১৭০]

বিরোধী দলের আন্দোলন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট এরশাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তন করতে হলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় অবশ্যই বজাই রাখেই তা করতে হবে। গুটি কয়েক লোকের বিক্ষোভ কখনও তার সরকার পরিবর্তনে সক্ষম হবে না। এ জন্য সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন, বিরোধী দলের কিছু বলার থাকলে তাদের অবশ্যই আলোচনায় বসতে হবে।[১৭১]

ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের অধ্যাদেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা ১১ই নভেম্বর নিজেরাই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। মাধ্যমিক কারক, বিশেষ করে ছাত্রদের চাপে ১৯ই নভেম্বর রাজনৈতিক জোটগুলো একটি যৌথ ঘোষণা দিতে বাধ্য হল। এ ঘোষণায় বলা হল– এরশাদের পতনের পর একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। ঘোষণায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাও দেওয়া হল।[১৭২] এ ছাড়া আন্দোলনের সম্মিলিত রূপরেখা প্রণয়ন করে, যা নিম্নরূপ–

“দেশবাসী বুকের রক্ত দিয়ে যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল হত্যা, ক্যু প্রভৃতি অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা বদলের অবসান ঘটিয়ে সাংবিধানিক পন্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল ও হস্তান্তর নিশ্চিত করা। এ জন্য আমাদের সংগ্রামের দাবীর কেন্দ্রীয় বিষয় হল একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু অসাংবিধানিক ধারায় অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী এরশাদ সরকার প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ছলে-বলে-কৌশলে তার ক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে কুক্ষিগত রাখার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অতীতের প্রতিটি নির্বাচনে ভোট চুরি, ভোট জালিয়াতি, ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালটবাক্স ছিনতাই, এমনকি নির্লজ্জ ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ক্যু এবং অবশেষে ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ঘোষণার নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের অব্যাহত প্রক্রিয়া চলে আসছে। এমতাবস্থায় এই সরকারের অধীনে কোনো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। এরশাদ ও অবৈধ এরশাদ সরকারের অধীনে কোনো জাতীয় নির্বাচনে আমরা ১৫, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট অংশ গ্রহণ করব না, তা রাষ্ট্রপতি বা সংসদ যে-কোনো নির্বাচনই হোক না কেন, এ সব নির্বাচন শুধু বর্জনই নয়, প্রতিহতও করব। একমাত্র একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই আমরা ১৫, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট কেবলমাত্র সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব।”[১৭৩]

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে রাজনৈতিক জোটগুলোর একটি যৌথ ঘোষণা করে। জোটের ঘোষণায় বলা হয়– “আমাদের চলমান আন্দোলনের মূল দাবী ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ–

১. হত্যা, ক্যু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তার সরকারের শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কল্পে :

ক) সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তথা সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের (ক) ৩নং ধারা এবং ৫৫ অনুচ্ছেদের (ক) ১নং ধারা এবং ৫১ অনুচ্ছেদের ৩নং ধারা অনুসারে এরশাদ ও তার সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত তিন জোটের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োগ করবেন। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ) এই পদ্ধতিতে উক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

২। ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। তার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো মন্ত্রী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না।

খ) অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করবেন।

গ) ভোটারগণ যাতে করে নিজেরা বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই আস্থা পুনস্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ঘ) গণ-প্রচারমাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক দলকে প্রচার-পরিচালনার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৪। ক) জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোনো পন্থায় কোনো অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।

খ) জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে।

গ) মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে।”[১৭৪]

এ সরকার নির্বাচন পরিচালনা করবে এবং গঠিত হবে সার্বভৌম একটি সংসদ। স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে এত বছর পর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে এটি ছিল একটি শক্তিশালী ভিত্তি। নভেম্বর মাসে সারা দেশেই সংঘর্ষ হয়েছে। একই সঙ্গে সিভিল সমাজের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কারকরা নিজেদের দ্বন্দ্ব ভুলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে একটি অলিখিত সমঝোতায় পৌঁছায়।[১৭৫] সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মধ্যস্থতায় ১৯শে নভেম্বর ১৯৯০ সালে তারা যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। উক্ত ঘোষণায় জেনারেল এরশাদের পদত্যাগসহ গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ার উল্লেখ থাকে। উক্ত আন্দোলনে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন এবং সিভিল সমাজ অংশগ্রহণ করে এবং তা ক্রমান্বয়ে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।[১৭৬] সরকারী

বাহিনী ছাড়াও ছাত্রদলের অসন্তুষ্ট গ্রুপের (যাদের সঙ্গে অনুমান করা হয় সরকারের যোগাযোগ ছিল) সঙ্গে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সংঘর্ষ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এ সংঘর্ষ শুরু হয় এবং তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। সে সময় ২৭শে নভেম্বর ডা. শামসুল আলম খান মিলন নিহত হন। ২৭শে নভেম্বর সরকার সারা দেশে জরুরী অবস্থা ও কারফিউ ঘোষণা করে।[১৭৭]

গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য সিভিল সমাজের ছিল এটি অন্তিম সংগ্রাম। ২৭শে নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত দিনগুলো ছিল সিভিল সমাজের জন্য গৌরবের। ২৭শে নভেম্বর সাংবাদিকরা সংবাদপত্র বন্ধ করে দেন।[১৭৮] এরশাদ সরকার শেষ আঘাত হানার জন্য ২৭শে নভেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক ইউনিয়ন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে এর প্রতিবাদে সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। এরশাদের জামানার শেষের ৮ দিন দেশে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নি, সাম্প্রতিক আন্দোলনে এটা এক মারাত্মক অস্ত্রের মতো ভূমিকা পালন করেছে। নীরবতা বা অনুপস্থিতি যে এত মারাত্মক অস্ত্রে হতে পারে ৯০-এর মতো আর কখনো তা অনুভূত হয় নি।[১৭৯] ২৮শে নভেম্বর সকালে কারফিউ ও জরুরী অবস্থা অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররা শহীদ মিনার পর্যন্ত মিছিল করে যান। ২৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পদত্যাগ করেন এবং ছাত্র শিক্ষকদের চাপে উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া পদত্যাগে বাধ্য হন। বিভিন্ন সংঘর্ষে মানুষ নিহত ও আহত হতে থাকে। কিন্তু রাজপথে মিছিল স্ফীত হতে থাকে। সামরিক সমাজের প্রতিনিধি এরশাদ ও তাঁর সরকার প্রশাসনের ওপর থেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সরকারী কর্মচারীরাও ৩রা ডিসেম্বর বেরিয়ে আসেন সচিবালয় থেকে।[১৮০] অবশেষে ৪ঠা ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সংসদ ভেঙ্গে দেয়। ৫ই ডিসেম্বর বিরোধী ঐক্যজোটসমূহ প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে অন্তর্বর্তী[১৮১] সরকারের প্রধান হিসেবে মনোনীত করে।[১৮২] ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০ বিকেলের মধ্যে টেলিভিশনে এরশাদের পদত্যাগের সচিত্র সংবাদ প্রচারিত হয়। রেডিওতে ঘন ঘন বিজয় সঙ্গীত বাজিয়ে 'এরশাদের পতন হয়েছে' 'জনতার বিজয় হয়েছে' বলে ঘোষণা করা হতে থাকে। মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। এরশাদের পদত্যাগের খবরে রাজধানীতে মানুষের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার নামে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশংকায় প্রধান দুই বিরোধী দলের দুই নেত্রী প্রচার মাধ্যমে আসেন। রেডিও-টেলিভিশনে এসে তারা শান্ত থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।[১৮৩] এরশাদের পদত্যাগের পরপরই তিনজোটের রূপরেখা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১৮৪] ৯০-এর দশকে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের সরকারকে স্রেফ অস্ত্র দেখিয়ে হটিয়ে দিয়েছিলেন। ডাকাত যেমন অস্ত্র দেখিয়ে গৃহস্তের ঘর লুটে নিয়ে যায় তেমনি তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা লুটে নিয়েছিলেন। সামরিকায়নের চেষ্টা করে তিনি অপমানটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে দিতে লাগলেন। এমন একটা সময় এল যখন তিনি ও তার স্ত্রী রাষ্ট্রকে মনে করতেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মানুষ আর কোনো উপাদান ছিল না। মানুষের দাম ছিল একটি বুলেটের চেয়েও কম। ঐ আমলে রাজপথের শহীদদের

হিসাব নিলেই এ কথা প্রমাণিত হবে।[১৮৫] এ সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের এই গণ-অভ্যুত্থান এবং এরশাদের পতন হয়। জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণ-অধিকার ফোরাম আয়োজিত 'স্বৈরাচারের পতন ও গণতন্ত্রে উত্তরণ' শীর্ষক আলোচনায়, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ বলেন, স্বৈরশাসকের পতন ঘটেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্বৈরশাসনের অবসান হয় নি। স্বৈরশাসকরা বিগত দিনের যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙ্গে দিয়েছে তা সুসংহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ খুবই কঠিন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করতে হলে শুধু এই নির্বাচন যথেষ্টে নয়। পরবর্তী সংসদ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে হতে হবে।[১৮৬]

রাজনৈতিক জোটগুলোর যৌথ ঘোষণা মোতাবেক বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং ৯০ দিনের মধ্যে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯০ সালের শেষে বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।[১৮৭] ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো সংসদ পুরো কার্যকাল শেষ করে নি। তাই নেই এর ধারাবাহিকতা, নেই উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ১৯৭৩-এর সংসদ শেষ হয় ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর। জেনারেল এরশাদ একাই ভেঙ্গেছেন তিনটি সংসদ-১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চে, ১৯৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর এবং ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বরে। এ দেশে কোনো রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকাল সমাপ্ত করেন নি। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব নিহত হন ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে সপরিবারে। রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত হন ১৯৮১ সালের ৩০শে মে, চট্টগ্রামে। জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করেন ৬ই ডিসেম্বরে ১৯৯০ সালে। অন্যান্য রাষ্ট্রপতিও পদত্যাগ করেছেন বাধ্য হয়েই। দেশে সরকার পরিবর্তিত হয়েছে হত্যা বা ক্যু-এর মাধ্যমে, সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় নয়। শুধুমাত্র নব্বই-এ সরকারের পরিবর্তন তার ব্যতিক্রম। নব্বই-এর গণ-অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতি পঞ্চম জাতীয় সংসদ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণেই অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচন, ১৯৯১ সালের ২৭ই ফেব্রুয়ারি, অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন। এমনটি আর অতীতে ঘটে নি। জনগণের বহুদিনের দাবী– 'যার ভোট সে দেবে, যাকে খুশি তাকে দেবে'-বাস্তবায়িত হয় এ সাধারণ নির্বাচনে। এতদিন বাঙালী এ ধরনের একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যই নিরন্তর সংগ্রাম করেছে। যাতে সে তার ইচ্ছানুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। পূর্বের সব নির্বাচন থেকে ১৯৯১ সালের নির্বাচন ছিল নিরপেক্ষ এবং মোটামুটি সুষ্ঠু। রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়ায় সিভিল সমাজও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রায় বিনা সংঘর্ষে নির্বাচন করেছে যা বাংলাদেশের সিভিল সমাজের সজীবতা ফের তুলে ধরে নতুনভাবে।[১৮৮]

বাংলাদেশে নির্বাচন বিভিন্ন ক্রান্তিকালীন সময়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। সংযুক্ত পাকিস্তানে ১৯৫৪ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে উন্মুক্ত এবং সুষ্ঠু হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং সব নির্বাচন জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব রাখে যার ফলে এক পর্যায়ে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর

মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্গবন্ধুর আমলে ১৯৭৩ সালে নির্বাচন হয় নির্বাচিত সরকারের অধীনেই। নির্বাচন নিয়ে কোনো অভিযোগ ওঠে নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারচুপির অভিযোগ ওঠে। বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তার কারণে তখন কোনো বিরোধী দলের বড় ধরনের সফলতা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বললে চলে। ৭৫-এর পর নির্বাচন প্রক্রিয়া আবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়। উল্লেখ্য জিয়া এবং এরশাদ রাষ্ট্রকে পাকিস্তানীকরণ করতে চেয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সামরিক ও আমলাতন্ত্রের শাসন এবং নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ ও কারচুপি ব্যাপক প্রচলন হয়।

জিয়া ‘হ্যাঁ-না’ ভোটের প্রচলন করেন এবং আইয়ুব মতো ভোট কারচুপির চালু করেন। বিরোধী দলগুলো প্রতিবাদ ও আন্দোলন না করে সহযোগিতা করে সামরিক স্বৈরশাসককে। ফলে পাকিস্তানী ধারা আবার প্রতীয়মান হয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে নির্বাচনকে মূল্যহীন করার প্রচেষ্টা করা হয়। এরশাদ ও জিয়া একইভাবে একই প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা করায়াত্তের প্রচেষ্টা চালায় আইয়ুবে খানের মতো। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে এরশাদ আমলে নির্বাচনকে যেভাবে প্রহসন ও প্রভাবিত করা হয়েছিল তা আর কখনও হয় নি। এরশাদের স্বৈরশাসন প্রতিরোধে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল কারণ এই দুর্শাসন আর বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনের বিকল্প নেই।

১৯৭৫-এর পর আর একটি বিষয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উঠে আসে, তা হল নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব নয়।

রাজনীতিবিদররা ঐ শাসকদের সহযোগিতা করেছিল, তারাই আবার ঐকমত্যে পৌঁছান নির্বাচিত সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না। ১৯৯০ সালে সেই জন্যই প্রথমবারে মতো অন্য ধরনের সরকার হল যা পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বীজ বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এই ধরনের সরকার রাজনীতিবিদ ও রাজনীতির প্রতি যে অনাস্থা তা তারা বুঝতে পারেন নি।

স্বাধীনতা অর্জনের পরে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর ক্রমান্বয়ে জনগণের আস্থা হ্রাস পেতে থাকে। এর মূল কারণ হল রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর এবং প্রভাবশালীদের নির্বাচনে অসদুপায়সহ অনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন। এ অবস্থার আরও অবনতি ঘটে যখন রাজনৈতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এভাবে নিজস্ব রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধকরণ এবং গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে রাষ্ট্র শাসনকে বৈধতা দানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হয়। কাজেই সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া যেমন প্রার্থী মনোনয়ন থেকে শুরু করে নিরীক্ষণ, প্রচারণা, ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা সর্বক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদের নিজ স্বার্থ প্রাধান্য পায় এবং অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রভাবে প্রভাবিত হয়। নির্বাচনকালীন সময়ে ক্ষমতাসীনদের সরকারী যন্ত্রের ব্যবহার এবং বিভিন্নভাবে সৃষ্ট সন্ত্রাস পক্ষপাতমূলক ভূমিকা রাখে কিন্তু রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ইলেকশন কমিশন নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ হয়েছে বলে সরকারীভাবে ঘোষণা দেয়। এভাবে নির্বাচনী ফলাফল প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পূর্ব

নির্ধারিত বলে ধারণা করা হয়। এ কারণে দেশে ১৯৭৯, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮-এর সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৮, ১৯৮১ ও ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন; ১৯৭৭ ও ১৯৮৫ সালের দু'টি গণভোট রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব বা অবদান রাখে নি। যার জন্য বিদ্যমান রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হয় এবং চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও অস্থিতিশীলতা দীর্ঘায়িত হয়। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থার সঙ্কট অবশেষে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়।[১৮৯]

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু বাকশাল গঠন নিয়ে ফের দেশ অস্থিতিশীল হয়। অপরদিকে, চরিত্রগত দিক দিয়ে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না; উভয়ের জন্ম হয়েছিল সেনা ছাউনিতে। উভয়ের নেতৃত্বে ছিলেন দুই সেনাপ্রধান, জিয়াউর রহমান এবং হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তারা ক্ষমতায় পাকাপোক্তভাবে টিকে থাকার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছে, বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামরিকীকরণ করেছে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এরশাদের সময় নির্বাচনে ভায়োলেন্স হয়ে এল এবং একই সাথে চলতে থাকে নির্বাচনে ভোট কারচুপির মহাউৎসব। ফলে সে সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নটি উঠে আসে।

তথ্যপঞ্জি

[১] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২০

[২] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৫৯

[৩] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪

[৪] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, শিখা প্রকাশনী , ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪৩-৪৪

[৫] এমাজউদ্দীন আহমদ ,*বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের রূপ*, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), গণতন্ত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪২

[৬] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৪

[৭] *বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের রূপ*, পৃ. ৪২

[৮] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৪

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬

[১০] *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, পৃ. ৪৫-৪৬

[১১] যুক্তফ্রন্ট শুধু মুসলমান আসনেই নির্বাচন করেছিল এবং ২৩৭টি মুসলিম সিটের মধ্যে পেয়েছিল ২২৮টি। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৪৩টি, কে এস পি ৪৮টি, নেজাম-ই-ইসলাম ২২টি, গণতন্ত্রী পার্টি ১৩টি ও খেলাফতে রাব্বানী ২টি।
বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, পৃ. ১৬

[১২] মো. কামাল উদ্দিন, *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, শৈলী প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১০, পৃ. ৪৬

[১৩] ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১২৪

[১৪] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ : দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পটভূমি, ১৯০৫-১৯৫৮ (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৩৮৯

[১৫] *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ১২৪

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪

[১৭] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৪

[১৮] *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ১২৬

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

[২০] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৪-৫

[২১] *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ১২৬-১২৭

[২২] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৫-৬

[২৩] *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, পৃ. ১৯১

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

[২৫] ১৫ই মে ফজলুল হক যে-দিন আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করলেন সে-দিন দাঙ্গা বাধানো হয় আদমজীতে। প্রশাসন তখনও মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণে ছিল না । তাই দেখা যায়, যতক্ষণ না বেশ কিছু হত্যাকাণ্ড হয় ততক্ষণ প্রশাসন নীরব ছিল।*১ দাঙ্গায় দেড় হাজারের মতো শ্রমিক নিহত হয়।

বাঙালী শ্রমিকদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ছিল অধিক। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সেই দাঙ্গার পেছনে কমিউনিস্টদের সরাসরি হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তোলে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক তৎক্ষণাৎ সে অভিযোগ খণ্ডন করে আদমজী কর্তৃপক্ষের একতরফা নীতিকে ঘটনার জন্য দায়ী করেন।*২ ২৩শে মার্চ ১৯৫৪ চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিলে বাঙালী বনাম বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তাতে ১৩ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে।*৩ কেন্দ্রীয় সরকার যে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে কয়েকদিনের মধ্যে। আদমজীর দাঙ্গার দু'দিন পরে প্রতিরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মীর্জাকে গর্ভনর করে পাঠানো হয় পূর্ববঙ্গে। মীর্জা ঢাকায় পৌঁছার দু'দিন পর ১৯৫৪ সালে ১৯শে মে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির একজন স্থপতি ছিলেন মীর্জা নিজে। যুক্তফ্রন্ট যে এর বিরোধী তা তিনি জানতেন। ১৯৫৪ সালের ১৪ই এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের পক্ষে মওলানা ভাসানী চুক্তির বিরোধিতা করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মীর্জা ও তাঁর অনুসারীরা ভাবছিলেন, এ চুক্তি বাতিলে যুক্তফ্রন্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

*১ *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৬

*২ *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* ১৭৫৭-২০০০, পৃ. ১৯২

*৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

[২৬] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৬

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

[২৮] *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* ১৭৫৭-২০০০, পৃ. ১৯৩

[২৯] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, পৃ. ২১

[৩০] পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (যিনি ছিলেন একজন বাঙালী কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পুতুল মুসলিম লীগের সদস্য) ঐ দিন এক বেতার ভাষণে ফজলুল হককে চিহ্নিত করলেন একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে যিনি মূলত পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যহীন। মোহাম্মদ আলী অভিযোগ করে বলেন, 'যুক্তফ্রন্ট প্রদেশের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিল এবং তা পরিণত হচ্ছিল সে শক্তিতে যা প্রদেশকে বিরুদ্ধাচারী করে তুলেছিল কেন্দ্রের, এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের বিরুদ্ধে।'*১ যে মন্ত্রিসভা সব নিয়ম-কানুন মেনে ক্ষমতায় এসেছে, দু'সপ্তাহের মধ্যে তাকে বাতিল করা কোনোক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

*১ *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৭

[৩১] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৭

[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮

[৩৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

[৩৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-৯

[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

[৩৬] *প্রাগুক্ত*

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১১

[৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

[৩৯] যত দিন যেতে লাগল আওয়ামী লীগে ভাসানী, সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপে মধ্যে ফাটল তত জোরদার হতে লাগল। ভাসানী অনুসারীদের দাবী ছিল এবং যাতে তারা দীর্ঘদিন ধরে ছিল সোচ্চার তা হল– পূর্ব-পাকিস্তানে সত্যিকার স্বায়ত্তশাসন এবং পাশ্চাত্যের সামরিক চুক্তিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বন।

সোহ্রাওয়ার্দী গ্রুপ এ নীতি মানতে রাজী ছিলেন না। সোহ্রাওয়ার্দী ও আতাউরের নিয়ন্ত্রণে তখন ছিল পৃষ্ঠপোষকতার আধার– লাইসেন্স, পারমিট, সরকারী-আধাসরকারী পদে চাকরি। আর এ সব তাঁরা এমনভাবে বিতরণ করতে লাগলেন যাতে দলে তাদের অনুসারী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায় ভাসানীর অনুসারী সংখ্যা। ১৯৫৭ সালের ২৪শে জুলাই ভাসানী আওয়ামী লীগের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে (২৫ ও ২৬শে জুলাই) ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। এখানে কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এ অঞ্চলের প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকরা বা রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে যে সহিষ্ণুতা প্রয়োজন তা দেখান নি এবং অধিকাংশ সময় এর বিপরীতে গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী স্বার্থকে। বাংলাদেশের পরবর্তী ঘটনাসমূহও তা-ই প্রমাণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করার জন্য তারা আমলাতন্ত্রের সাহায্য নিতে গররাজী ছিলেন না এবং আমলাতন্ত্রও নিজেদের আধিপত্য ও ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য গ্রহণ করত এ সুযোগ।

[৪০] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১১-১৪

[৪১] *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ১৩৭

[৪২] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৪-১৫

[৪৩] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২২

[৪৪] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫

[৪৫] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২১

[৪৬] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৭৮

[৪৭] *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ১৫০-১৫১

[৪৮] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২২

[৪৯] *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, পৃ. ২২৪

[৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪

[৫১] *প্রাগুক্ত*

[৫২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

[৫৩] *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ১৫৬-১৫৭

[৫৪] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ২২

[৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

[৫৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

[৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

[৫৮] *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ১৭৭

[৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০

[৬০] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১*, (ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ২৪৭

[৬১] *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ১৮০

[৬২] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৩৩

[৬৩] *প্রাগুক্ত*

[৬৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫

---

[৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮
[৬৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩
[৬৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
[৬৮] *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, পৃ. ২৭৯-২৮০
[৬৯] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১*, পৃ. ৫৮৬
[৭০] *প্রাগুক্ত*
[৭১] *প্রাগুক্ত*
[৭২] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৪৬
[৭৩] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৩-২৪
[৭৪] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৮০
খসড়া সংবিধান রচনার জন্য ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালে ১৭ই এপ্রিল থেকে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত তারা ৯৩টি অধিবেশনে মিলিত হন। ১২ই অক্টোবর বিল আকারে তা গণপরিষদে পেশ করা হয়। ৩০ তারিখ পর্যন্ত এর ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা নভেম্বর তৃতীয় পাঠের পর বিল পাস হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে তা কার্যকরী হয়। মওদুদ আহমদ বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান প্রধান যে বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল– ১. সংসদীয় গণতন্ত্রভিত্তিক পদ্ধতি ২. মৌলিক অধিকারসমূহের গ্যারান্টি ৩. আটকাদেশ বহাল রাখার আইনসমূহের বিলুপ্তি ৪. জরুরী অবস্থা ঘোষণার অধিকার সম্বলিত বিধানাবলী বর্জন ও মৌলিক অধিকার স্থগিত রহিতকরণ ৫. সমাজতন্ত্র ৬. আমলাতন্ত্র পুনর্গঠন ৭. বাঙালী জাতীয়তাবাদ ৮. কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ ৯. বিকেন্দ্রীকরণ ১০. যুদ্ধ ঘোষণায় সংসদের সম্মতি গ্রহণ ১১. দল পরিবর্তনের জন্য সংসদ সদস্যদের অধিকার রহিতকরণ ১২. বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ১৩. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিধি প্রণয়ন ১৪. ভোটার হওয়ার যোগ্যতার বয়সসীমা হ্রাস। [সংবিধান সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মওদুদ আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৭]
[৭৫] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৮০
[৭৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০-৮১
[৭৭] *নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট*, বাংলাদেশ।
file:///C:/Users/User/Documents/ElectionResultFact.php.htm
[৭৮] এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন*, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যাণ্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫৫
[৭৯] Lawrence Ziring, *Bangladesh from Mujib to Ershad :An Interpretive Study*, Dhaka : UPL, 1992, p. 101
[৮০] তারিক হোসেন খান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৭৬
[৮১] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম, (সাল নেই)
[৮২] বদরুদ্দীন উমর, *বাঙলাদেশে সংসদীয় গণ*তন্ত্র, সাহিত্যিক, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪৮
[৮৩] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৬২৭
[৮৪] *Lawrence Ziring*, op.cit., p. 101
[৮৫]*প্রাগুক্ত*

---

[৮৬] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৮১
[৮৭] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৪-২৬
[৮৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
[৮৯] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ৮৩
[৯০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪
[৯১] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৬
[৯২] *প্রাগুক্ত*
[৯৩] ৩রা নভেম্বর এক সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ঐ দিনই কার্যত খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে, যদিও ৫ই নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা হয়। ৬ই নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে যখন ৩রা নভেম্বর সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, ঠিক এর পাশাপাশি সে সময় খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সেনা সদস্যরা ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে বন্দী অবস্থায় থাকা জাতীয় চার নেতাকে অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। খন্দকার মোশতাক ও তার সহযোগীদের আশঙ্কা ছিল, খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের মধ্য-দিয়ে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক নীতির পুনরুত্থান ঘটবে। সে সম্ভাবনাকে নেতৃত্বহীন করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ চার সহযোগীকে তড়িৎ সিদ্ধান্তে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।
বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, পৃ. ৩৫০-৩৫২
[৯৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩
[৯৫] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৬
[৯৬] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৪৫
[৯৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫
[৯৮] সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৭
[৯৯] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৪৫
[১০০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭
[১০১] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৭
[১০২] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৭৭
[১০৩] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৭
[১০৪] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৭৭
[১০৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৮
[১০৬] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৭
[১০৭] *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ১৫-১৬
[১০৮] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৭
[১০৯] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৭৯
[১১০] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৭
[১১১] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৭৯
[১১২] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৭-২৮
[১১৩] Al Masud Hasanuzzaman, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, UPL, Dhaka, p. 90
[১১৪] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৯

[১১৫] *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, পৃ. ৯০
[১১৬] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ২৮
[১১৭] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৮০
[১১৮] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১২৫
[১১৯] মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিনকাল*, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২০৩
[১২০] বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করার লক্ষ্য জেনারেল এরশাদ এক দশক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাজ করে গেছেন এবং ঐ সব কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হয়েছে ১৯৯০ সালের গণ-আন্দোলনের পটভূমি। প্রথমে প্রশাসন দিয়েই শুরু করতে হয়। কারণ বাংলাদেশে এটিই হল সবচেয়ে শক্তিশালী বেসামরিক প্রতিষ্ঠান। এর নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশের উন্নয়ন। জেনারেল এরশাদ প্রথমে বেসামরিক আমলাকে তোষণ করেছেন, তারপর নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের সামরিকায়নও শুরু করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল অন্তিমে বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে সামরিক আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে বেসামরিক আমলারা শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু এর পর থেকে এবং বিশেষ করে এরশাদের আমলে সামরিক আমলারাই হয়ে উঠলেন শক্তিশালী। জিয়াউর রহমানের আমল থেকেই শুরু হয়েছিল এ প্রক্রিয়া। তবে তাঁরা উচ্চপদস্থ বেসামরিক আমলাদের সঙ্গে সমঝোতা করেই এগিয়েছেন। এর একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও ছিল। শেখ মুজিবের পর যে সব সামরিক আমলা অধিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁরা উচ্চ পর্যায়ের বেসামরিক আমলাদের অধস্তন ছিলেন মুজিব আমলে বা তারও আগে। মাঝে মাঝে তাঁরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন বটে কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। আর বেসামরিক আমলারা যেহেতু সব সময়েই রাজনৈতিক আধিপত্য অপছন্দ করেন তাই তাঁরাও বেশী আপত্তি করেন নি।

বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮), পৃ. ৪৭-৪৮

[১২১] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৫৩
[১২২] *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ১৭
[১২৩] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৫৩
[১২৪] *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ১৭-১৮
[১২৫] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩০
[১২৬] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৪৭-৪৮
[১২৭] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১২৭
[১২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯
[১২৯] *প্রাগুক্ত*
[১৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯-১৩০
[১৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০
[১৩২] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৮০
[১৩৩] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩০
[১৩৪] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৮০
[১৩৫] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৩৫
[১৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

[১৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫
[১৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫-১৩৬
[১৩৯] *বাংলাদেশের নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, পৃ. ৫৫
[১৪০] সৈয়দ আতিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম ১৯৯৬ এবং ২০০১ : একটি বিশ্লেষণ*, (পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ২২৭
[১৪১] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩০
[১৪২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
[১৪৩] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৩৬-১৩৭
[১৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭
[১৪৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭-১৩৮
[১৪৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮
[১৪৭] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩১
[১৪৮] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৩৮-১৩৯
[১৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
[১৫০] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩১
[১৫১] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৫৫
[১৫২] *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, পৃ. ১৬২
[১৫৩] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৫৫
[১৫৪] *প্রাগুক্ত*
[১৫৫] *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, পৃ. ১৬৪
[১৫৬] *প্রাগুক্ত*
[১৫৭] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৫৬
[১৫৮] *প্রাগুক্ত*
[১৫৯] *প্রাগুক্ত*
[১৬০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
[১৬১] *প্রাগুক্ত*
[১৬২] *প্রাগুক্ত*
[১৬৩] *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, পৃ. ১৬৪
[১৬৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪-১৬৫
[১৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৬
[১৬৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬
[১৬৭] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৭০
[১৬৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭১
[১৬৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১
[১৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১-১৭২
[১৭১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ই নভেম্বর ১৯৯০
[১৭২] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৭২

[১৭৩] নীল কমল বিশ্বাস (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতি : একাত্তর থেকে আটানব্বই*, এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৮১

[১৭৪] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একাত্তর থেকে আটানব্বই*, পৃ. ৩৮১-৩৮২

[১৭৫] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৭২

[১৭৬] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩১

[১৭৭] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৭২

[১৭৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

[১৭৯] *সংবাদ*, ১লা জানুয়ারি ১৯৯১

[১৮০] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৭২

[১৮১] তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী সাহাবুদ্দীন আহমদ উপ-রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। যাকে আমরা অন্তর্বর্তী কালীন সরকারের প্রধান বা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বলেছি।

[১৮২] Moudud Ahmed, *Bangladesh A Study of the Democratic Regimes*, UPL, Dhaka, 2012, p. 32

[১৮৩] *রাজনীতির তিন কাল*, পৃ. ২৪৭

[১৮৪] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৭২

[১৮৫] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক(১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৬৫

[১৮৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯০

[১৮৭] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩১

[১৮৮] *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ১৭২-১৭৩

[১৮৯] *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, পৃ. ১৩২-১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৯১ সালের নির্বাচন ও খালেদা জিয়ার সময়কাল

গণ-আন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নিকট ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এর মাধ্যমে অবসান হয় জেনারেল এরশাদের ৯ বছরের শাসনামলের। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ধারণা ১৯৯০ সালে বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়। এ দাবীর প্রধান এবং তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচার উৎখাত এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণ।[১] তিনজোটের রূপরেখা অনুসারে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর অনধিক তিন মাসের মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে গণতন্ত্রে উত্তরণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[২] সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করেন। অতঃপর রাষ্ট্রপতি এরশাদ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। সদ্য নিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। ফলে উপ-রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। তাঁর কার্যকাল শুরু হয় ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর এবং শেষ হয় ১৯৯১ সালের ৯ই অক্টোবর।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ক্ষমতা গ্রহণের পরই সাহাবুদ্দীন আহমদ সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি তার সরকারের চারটি মৌল লক্ষ্যের কথা বলেন–

১. তিন মাসের মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন।

২. দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন।

৩. জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রীপরিষদ না থাকায় দৈনিক কার্যক্রম পরিচালনা।

৪. প্রশাসনিক সংস্কার ও বেসামরিকীকরণ।

এ সব উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তিনজোট প্রদত্ত ৩১জন বিশিষ্ট ব্যক্তির তালিকা থেকে ১৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেন।[৩] অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে একটি নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। নির্বাচনকে সফল ভাবে আয়োজনের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে

সব পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল– নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ও কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন, ১৯৭২ সালের জনপ্রতিনিত্ব অধ্যাদেশ সংশোধন, নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনীবিধি প্রয়োগ ইত্যাদি। এ সকল ব্যবস্থা ১৯৯১-এর নির্বাচন ও চলমান প্রক্রিয়ার ওপর জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং ভোটারগণ এর ফলে ১৯৯১-এর নির্বাচন গণতান্ত্রিক উপায়ে সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে নির্বাচন নামক প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থাশীল হয়ে ওঠেন।

নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সরকার গঠনের একমাত্র মাধ্যম হল– নির্বাচন। তাই নির্বাচন পরিচালনার জন্য দরকার একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা তৈরী, ভোটগ্রহণ তত্ত্বাবধায়ন, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনী অভিযোগ মোকাদ্দমা মীমাংসার লক্ষ্যে নির্বাচনী ট্রাইবুনাল গঠন করা নির্বাচন কমিশনের কাজ। বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম ভাগে ১১৮ অনুচ্ছেদ থেকে ১২৬ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ও তার কাজ নিয়ে বিস্তারিত বলা রয়েছে।[৪] সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা তবুও ক্ষমতাসীন দলীয় সরকার নির্বাচন কমিশনের উপর সরাসরি না হলেও নির্বাচনের উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে নির্বাচন কমিশন সংস্কার নিয়ে হয়েছে আন্দোলন। নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা ফিরে আনার জন্য কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হয়। তাই, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়। এরই অংশ হিসেবে বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে ১৯৯০ সালের ২৪ই ডিসেম্বর তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনের পদ থেকে সরিয়ে বিচারপতি মোঃ আব্দুর রউফকে ১৯৯০ সালে ২৫ই ডিসেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বিচারপতি নয়িম উদ্দিন আহমদ নির্বাচন কমিশনে কর্মরত ছিলেন ১৯৯০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত এবং আমিন উর রহমান খানের স্থলে ১৯৯০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে বিচারপতি সৈয়দ মিসবাহ উদ্দিন হোসেনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৫] নবনির্বাচিত কমিশনারগণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সহযোগিতায় জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরে আনেন এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করতে সক্ষম হন।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১৯৯১

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১৯৯১ ছিল জনগণের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে আস্থা ফিরে আনার একটা নির্বাচন। জনগণ যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা ফিরে পায় সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে মতো সন্ত্রাসী তৎপরতা, ভোট কারচুপি ইত্যাদি এবার যাতে সংঘটিত না হয়

তার জন্য নির্বাচন কমিশন কঠোর নির্বাচনী আইন ও নিরাপত্তা প্রহরার মাধ্যমে অনাস্থা দূর করে আস্থা ফেরানোর উদ্যোগ নেয়। ২২শে জানুয়ারি ১৯৯১ থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়।[৬] এ নির্বাচন চলাকালে নিহত হয়েছিল ১৫জন, আহত ৮২৫জন এবং নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল ১৭০টি কেন্দ্রে।[৭] এরশাদের সময়ে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল নির্ধারণ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১৯৯১ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওই নির্বাচনের ভুলত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক দল সমূহের ইশতেহার

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন তাদের দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল– নির্বাচনের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তখন নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করে। দু'টি দলেরই প্রধান লক্ষ্য জয়লাভ করা। তাদের মেনিফেস্টো বক্তৃতা-বিবৃতিতে স্বৈরাচার-বিধ্বস্ত একটি দেশ কী কী উপায়ে পরিত্রাণ পেতে পারে বা স্বনির্ভর হতে পারে তার স্পষ্ট কোনো রূপরেখা নেই। গণমানুষ তা বুঝলেও তাদের চাওয়া ছিল নির্বাচনটা হোক। একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অন্তত শুরু হোক।[৮] নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো যথারীতি নিজ নিজ নির্বাচনী মেনিফেস্টো নিয়ে প্রচারণা চালায় এবং ভোটারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আওয়ামী লীগের প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ। অন্যান্য বিষয় ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার, সংবিধানের চার মৌলনীতি যথা 'বাঙালী' জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আস্থা, সকল কালাকানুন বাতিলকরণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জোট নিরপেক্ষ বিদেশ নীতি এবং দক্ষ সামরিক বাহিনী গঠন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ১৯৯১-এর নির্বাচনকে দেশের ভবিষ্যৎ সরকার ব্যবস্থার ওপর গণভোট হিসেবে আখ্যায়িত করে সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য তাঁর দলকে সংবিধান সংশোধনের নিমিত্তে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে জয়ী করতে ভোটাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহারের সমালোচনা করেন এবং তাদের সময়ে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের পরিবর্তে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন।[৯] এ ছাড়াও আওয়ামী লীগ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা ওয়াদা করে। উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, কৃষি খাতে উন্নয়নের জন্য ভর্তুকী প্রদান ও কৃষকদের পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত বিদ্যমান কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ এবং দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করার ঘোষণা দেয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের ব্যবহার,

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার প্রচেষ্টার কথা বলা হয়। এ ছাড়াও ইশতেহারে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।[১০]

অপর দিকে বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল জেনারেল জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন। বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া জেনারেল জিয়ার 'উন্নয়নের রাজনীতি'-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে স্বনির্ভর অর্থনীতি, কৃষি উন্নয়ন, বহুদলীয় ব্যবস্থা, জন প্রশাসন, গ্রাম সরকার, খাল খননসহ দেশের সার্বিক অগ্রগতির নীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন। বিএনপি সংবিধানে সংযোজিত ইসলামী নীতি ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর হওয়া এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জোট নিরপেক্ষতা, সার্কের উন্নয়ন, মুসলিম দেশসমূহের সাথে উন্নত সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেয়।[১১] দুর্নীতিমুক্ত সৎ সরকার প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন নিশ্চিত করা, সর্বপ্রকার কালাকানুন বাতিল করে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং গণপ্রচার মাধ্যমসমূহকে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণ, যমুনা বহুমুখী ও মেঘনা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ওয়াদা বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে যুক্ত করে।[১২]

এ ছাড়াও বিএনপি তার ইশতেহারে, জেনারেল এরশাদের নয় বছরের স্বৈরশাসন ও গণতন্ত্র ধ্বংসের জন্য তাঁকে দোষারোপ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিএনপির অবদান ও সাফল্য তুলে ধরে। বিএনপি সরকার পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে নীরবতা পালন করে। নিজ দলের প্রতি ভোটার আকর্ষণের কৌশল হিসেবে বিএনপি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ এবং ৮.৫ একর জমির ওপর থেকে ভূমি রাজস্ব মওকুফের অঙ্গীকার করে।[১৩]

এ দু'টি দলের নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে দু'টি বিষয়ই প্রাধান্য পাচ্ছে– ১. এরশাদের বিচার কে কম চায় আর কে বেশী চায়? এবং ২. অতীতে কোন দল কী কী খারাপ কাজ করেছিল। সাধারণ মানুষ তাদের অবশ্য ধারণা– দু'টি দলেরই ব্যর্থতা ছিল। দু'টি দলই কম-বেশী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রুদ্ধ করেছিল এবং দু'টি দলই তখন এরশাদের বিচার তেমনভাবে চায় নি। মিজানুর রহমান চৌধুরীর কথায় তা বোঝা যায়, মুক্ত এরশাদের চেয়ে বন্দী এরশাদ শক্তিশালী। অর্থাৎ এখন আদালতে তিনি কখন কী বলে বসেন, তখন লেগে যাবে আরেক হট্টগোল, কারণ, এরশাদের শাসন আমলে কম-বেশী সবাই আপোস করেছে।[১৪]

নির্বাচনে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী দল জামায়াতে ইসলামী পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে। অন্যান্য বিষয়সহ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা নির্মাণও এ দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল।

জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি তাৎক্ষণিকভাবে পরাজিত পক্ষ হিসেবে নির্বাচনী রাজনীতিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ ক্ষেত্রে তাদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অনুমতি দান করে। যদিও এ দলের জ্যেষ্ঠ নেতাগণ অন্তরীণ ছিলেন তথাপি দলের অন্যান্য নেতাকর্মী দলীয় কর্মসূচী প্রদান করে যার মধ্যে ছিল– বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম এবং নির্বাহী ও আইনসভার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি।[১৫] জাতীয় পার্টি নির্বাচনী প্রচারণায় আঞ্চলিকতার ব্যবহার করে। তারা বিশেষ অঞ্চলকে বেছে নেয় প্রচারণার জন্য। এ দলের নেতা-কর্মীরা রংপুরের মানুষকে বুঝানো চেষ্টা করে তাদের অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য জাতীয় পার্টির বিকল্প নেই এবং একই সাথে বুঝাতে সক্ষম হয় তাদের এলাকার সন্তান এরশাদ বিপদে পড়েছেন। তাকে রক্ষা করার জন্য ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে হবে।[১৬] রংপুরের বিষয়টি এক হিসাবে এক ধরনের আঞ্চলিকতা। পাকিস্তান আমলেও পূর্ববঙ্গে নানা কারণে আঞ্চলিকতা বিকশিত ছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আঞ্চলিকতাও যে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তা অস্বীকারের উপায় নেই। ব্যাপক অর্থে আঞ্চলিকতার ইতিবাচক দিক থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থে ও স্বার্থে তা ব্যবহার করলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হয়ে ওঠে সঙ্কটময়, বিভক্ত হয়ে যায় সমাজ। এক নায়ক বা স্বৈরশাসকরা এ জিনিসটিই চান। কারণ তাদের কাছে রাষ্ট্র বা সমাজ নিজ থেকে বড় নয়। আর তখন এরশাদ ও তার সহযোগীরা, ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিকতাকে।[১৭] এরশাদের আমলে যা বিকশিত হয়েছে তাতো পুঁজিবাদ নয়, লুটেরাবাদ। ফলে, অনগ্রসর অশিক্ষিত সমাজে মৌলবাদ, আঞ্চলিকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, লোভ ইত্যাদি বিকশিত হয়। সব মিলিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা জিইয়ে রেখে স্বৈরাচারী শাসক ও সহযোগী নিজেদের বিকশিত করে।[১৮]

নির্বাচনী আচরণবিধি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশন অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করে। ৬৭টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে মত বিনিময়ের পর কমিশন ১৬ দফাভিত্তিক এই আচরণবিধি তৈরী করে। দফাগুলো নিম্নরূপ–

১. নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অবশ্যই মেনে চলতে হবে;
২. স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পূর্বশর্ত। কিন্তু কেবল আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টা একটি সুশৃঙ্খল নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে এই ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে;
৩. কেবল নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে;

৪. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও প্রার্থীকে নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে তাদের কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করতে হবে এবং নির্বাচন-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে;

৫. নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুস্থ নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যেন ভোটাররা নির্ভয়ে ও অবাধে নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন;

৬. এমন কিছু করা যাবে না যাতে অযথা উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ ব্যাহত হয়। নির্বাচনী প্রচারণা যাতে উত্তপ্ত বাগ্‌যুদ্ধে পরিণত না হয়, সে জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে বাক্ সংযম ও পরমতসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে;

৭. নির্বাচনী প্রচারাভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীর সমালোচনা করা স্বাভাবিক, তবে অশালীন ও উস্কানিমূলক বক্তব্য-বিবৃতি, শ্লেষ, বিদ্রূপ, কটাক্ষ ইত্যাদি পরিহার করা উচিত। এই লক্ষ্যে নির্বাচনকালে একদল অন্যদল সম্পর্কে এমন কোনো বক্তব্য রাখবে না যাতে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে বিরোধ ও সংঘাতের উপক্রম হয়, তবে সংশ্লিষ্ট দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচনী সমন্বয় কমিটি দ্বারা উত্তেজনা প্রশমন ও বিরোধ-মীমাংসা করতে হবে;

৮. সকল রাজনৈতিক দলকেই সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। দলীয় শক্তির প্রদর্শন ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য কোনো দল কোনো রকম সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেবে না। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে সকল রাজনৈতিক দল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করবে নির্বাচনী প্রচারণাকালে অথবা ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্রে কিংবা ভোটকেন্দ্রের আশপাশে যদি কোনো ব্যক্তি অস্ত্রসহ পুলিশের নিকট ধরা পড়ে তবে তাকে ছাড়ানোর জন্য কোনো রাজনৈতিক দল কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করবে না;

৯. রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ থাকবে। প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড করা যাবে না;

১০. যে-কোনো ধরনের নির্বাচনী অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য নিকটস্থ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে;

১১. অর্থ বা প্রলোভনের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা এবং নিজের ও পরিবারের জন্য ছাড়া অন্য ভোটারদের জন্য কোনো রকম যানবাহন ভাড়া বা ব্যবহার করা নির্বাচনী অপরাধ; এ সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকতে হবে;

১২. পেশী-শক্তির সাহায্যে ভোটকেন্দ্র দখল বা ভোটকেন্দ্রে কোনো রকম অবৈধ তৎপরতার মাধ্যমে ভোট সংগ্রহের অপচেষ্টা প্রতিরোধের জন্য সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তুলতে হবে। অবৈধভাবে সংগৃহীত ভোট কোনো কাজে আসবে না, নির্বাচন কমিশন এই সকল কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করে দেবে;

Dhaka University Institutional Repository

১৩. নির্বাচনী প্রচারণা ও ভোট সংগ্রহের স্বার্থে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী তার নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবে না;

১৪. অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গুজব ও চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা যাবে না;

১৫. ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে বা নিষিদ্ধ চৌহদ্দির মধ্যে কোনো দলের নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না এবং ভোটকেন্দ্রের মধ্যে কোনো প্রকার প্রচারণামূলক তৎপরতা চালানো যাবে না;

১৬. ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়া কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। রাজনৈতিক দলসমূহকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাদের দলীয় কর্মীগণ যেন ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা না করেন। কেবল পোলিং এজেন্টগণ নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থেকে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে যাবেন।[১৯]

প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত বিধিসমূহ লংঘনকারীর জন্য সর্বনিম্ন দু'বছর এবং সর্বোচ্চ সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং একই সঙ্গে জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যয়সীমা লংঘনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করে ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এবং সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করে এই ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।[২০]

নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ উপলক্ষে ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২:০১ মিনিট থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ পর্যন্ত সকল প্রকার জনসভা, মিছিল ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধত্ব আদেশ ৭৮(১) ধারার বিধান অনুসারে উপর্যুক্ত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনো জনসভায় যোগদান করতে পারবেন না। এ ছাড়াও ওই সময়সীমার মধ্যে কোনো শোভাযাত্রা বা মিছিলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী ব্যক্তি ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধত্ব আদেশ-এর ৭৮(২) ধারার বিধান অনুসারে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ সাত বছর এবং ন্যূনতম দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[২১]

ভোট উৎসব ও শঙ্কা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা বাংলার মানুষ নির্বাচনী প্রচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। মুখরিত হয়ে ওঠে ঢাকা শহর। এর প্রধান সড়কগুলো ছাড়াও অলিতে-গলিতে তৈরী করা হয় অগণিত নির্বাচনী ক্যাম্প, রাস্তার মোড়ে মোড়ে তৈরী হয় নানা রঙের গেট, প্রার্থীদের প্রতিকৃতি-ব্যানার, প্রচার-মিছিল, দেয়ালে দেয়ালে চিকা, পোস্টার আরও কত আয়োজন।[২২] ভোটযুদ্ধ জমে ওঠে গ্রামাঞ্চলেও। প্রতিটি এলাকায়

কমপক্ষে আট-দশজন প্রার্থী। প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা নির্ধারিত হলেও মোট দশজন প্রার্থীর মোট ব্যয় ত্রিশ লক্ষ টাকা পেরিয়ে যায়। প্রতি সন্ধ্যায় আধনেংটো, নেংটো শিশুরাও 'নৌকা নৌকা' বা 'ধানের শীষ' বলে চিৎকার করে শ্লোগান দেয়। তাদের মিছিল শেষ হতো প্রার্থীর বাসার সামনে। প্রতিজনের ভাগ্যে জোটে একটি করে লজেন্স বা টোস্ট বিস্কুট। তাতেই তারা খুশি।[২৩]

ভোট নিয়ে মানুষের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। দীর্ঘ দিন দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হয় নি। নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া নির্বাচনে দ্বিধার কারণ জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের প্রচুর টাকা ব্যয় এবং তাদের দ্বারা সংখ্যা লঘুদের হুমকি প্রদান।[২৪] অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)* গ্রন্থে বলেন, "টাকার ব্যয় অস্ত্রের মাস্তানীর চেয়েও কম নয়। যিনি যোগ্য, সৎ, বিবেকবান তাঁর পক্ষে একটি নির্বাচনে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করা দুরূহ। খরচ তারাই করতে পারবেন যাদের অর্থ বৈধ উপায়ে আসে নি। তা হলে নির্বাচনে জিতবেন কারা? অবৈধ টাকার মালিক যারা তারা এবং তারা জিতলে কতখানি গণতন্ত্র চাইবেন তাও ভেবে দেখার বিষয়। কারণ, গণতন্ত্র মানে জবাবদিহি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে তো পার্লামেন্টে বিভিন্ন লুটের কথা আসবে।"[২৫]

নির্বাচনে কালোটাকার ব্যবহার শুরু হয়েছিল এরশাদের সময় থেকে। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা এই প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত। অথচ এ প্রক্রিয়ায় রোধ করার কথা ছিল আন্দোলনকারী দলগুলোর। মানুষ তাই বিভ্রান্ত। তারা আগের নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বর্তমান নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে তেমন আলাদা করতে পারছেন না। গণ-আন্দোলনের মতো একটি বিষয়কেও বাঙ্গালী কতটা হাস্যকর করে তুলতে পারে তার প্রমাণ এই প্রাক-নির্বাচনী অবস্থা। আমরা সবাই আশা করেছিলাম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী, সৎ, বিবেচক এবং যারা গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদেরই দাঁড় করানো হবে প্রার্থী হিসেবে। দরকার হলে দলের সঙ্গে দলের সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবে। একটি গণ-অভ্যুত্থানের পর তাই তো হওয়ার কথা। 'জনগণ' বা 'ভোটার' আন্তরিকভাবে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকার থেকে আন্দোলনকারী নেতৃত্বের পার্থক্য করাও মুশকিল হয়ে উঠেছে।[২৬]

পোস্টারগুলোতে প্রার্থীদের পক্ষে এমন সব কথা বলা হয়, এলাকাবাসীরা জানেন যা সত্য নয়। পূর্ববর্তী সরকার মৌলবাদকে যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন তার ফলে আরও জটিলতা দেখা দিয়েছে। সে সময় ঢাকা শহরেই তাদের বিশাল বিশাল তোরণে লেখা হয়– পাল্লায় ভোট দিলে তাতে নাকি আল্লাহ্ খুশি হবেন? এই রকম শেরক্-ই কথাও ব্যবহৃত হয় নির্বাচনী প্রচারে। 'বিসমিল্লাহ' 'লা ইলাহা ইল্লালাহ' 'আল্লাহু আকবর' ইত্যাদি যেনতেনভাবে ব্যবহার করা হয়। ধর্ম যেন আর ধর্ম রইল না।

ফলে এরপর পশ্চাৎপদ অশিক্ষিত সমাজে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনীতি করা দুস্কর হয়ে উঠবে বলে মনে হয়।[২৭]

সব মিলিয়ে এরপর 'সব সম্ভবের দেশে' মানুষের আর নিয়তিবাদী হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এর কারণ চারদিকে বিশ্বাসহীনতা। পূর্ববর্তী সরকার সৃষ্টি করেছিলেন ব্যাপক বিশ্বাসহীনতা। মানুষ ভেবেছিলেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্বাসের দিগন্তের উন্মোচন করবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর এ ধরনের কোনো কোনো আচরণ মানুষের মনে সৃষ্টি করতে পারে বিশ্বাসহীনতা। এই নিয়তিচক্র বা বিশ্বাসহীনতার চক্র থেকে বের হতে না পারলে প্রগতি দূরে থাক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই দুস্কর হয়ে উঠতে পারে। পূর্ববর্তী সরকারের বিশ্বাসহীন ব্যবহার সৃষ্টি করেছিল গণ-আন্দোলন। তাই আশা করা হয় রাজনৈতিক দলগুলো মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে, কথা ও কাজে মিল থাকবে। এরশাদের মতো যদি শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার কথা ও কাজে মিল না থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত তৈরী হতে পারে আরেকটি ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পটভূমিকা।[২৮]

সংসদ নির্বাচন ১৯৯১

২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ অনুষ্ঠিত হয় দেশের পঞ্চম সংসদ নির্বাচন। সরকারী দলবিহীন জাতীয় নির্বাচন এটিই প্রথম। সারা দেশে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করা হয়। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১। মুন্সীগঞ্জ ৩ এবং কুষ্টিয়া ২ আসনে দু'জন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।[২৯] পঞ্চম সংসদীয় নির্বাচনে সংসদে ৩০০ আসনের জন্য ৭৫টি রাজনৈতিক দল এবং ২৭৮৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিএনপি সংসদের ৩০০টি আসনের সবগুলোতে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী ৮ দলীয় জোট ২৬৪জন প্রার্থী দাঁড় করায়। জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও বাকশাল যথাক্রমে ২৭২, ২২২ এবং ৬৮ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অন্যান্য দল যারা পঞ্চাশের অধিক প্রার্থী মনোনয়ন দেয় তারা ছিল জাসদ (রব), জাসদ (ইনু), ফ্রিডম পার্টি, মুসলিম লীগ (কিউ), ইসলামী ঐক্যজোট এবং জনতা দল। এ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল ৪২৪জন।[৩০]

সারণি ১.১০ : পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[৩১]

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট প্রাপ্ত আসন
বিএনপি	১৪০	২৮	১৬৮
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৮৮	-	৮৮
জাতীয় পার্টি	৩৫	-	৩৫
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৮	-	২০
বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৫	-	৫
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পাটি (সি.পি.বি.)	৫	-	৫
ইসলামী ঐক্যজোট	১	-	১
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	১	-	১
গণতন্ত্রী পার্টি	১	-	১
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পাটি (এন. ডি.পি.)	১	-	১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (শাজাহান সিরাজ)	১	-	১
বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পাটি	১	-	১
স্বতন্ত্র/ নির্দলদীয়	৩	-	৩
মোট	৩০০	৩০	৩৩০

নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়া বলেছিলেন, সরকার নিরপেক্ষ নন, কারচুপি হতে পারে। ফল প্রকাশিত হওয়ার পর সঙ্গত কারণেই বিএনপি কোনো অভিযোগ করে নি। শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগে এ ধরনের কোনো মন্তব্য করেন নি। কিন্তু নির্বাচনের পর বলেছেন, সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। হ্যাঁ, প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে জাল ভোট পড়েছে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের আকার ভোটার অনুযায়ী যদি আরও

ছোট না হয় তাহলে এ ধরনের কারচুপি বন্ধ করা দুরূহ। ভোটার তালিকায়ও বেশ বড় সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে যারা আগে ভোটার ছিলেন। এ প্রক্রিয়াটি গত এরশাদ শাসনামলে সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করা সত্ত্বেও অনেকে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখেছেন তার নাম তালিকাভুক্ত করা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্বের নির্বাচনগুলোর তুলনায় এ নির্বাচন যে স্বচ্ছ ও অবাধ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।[৩২] পঞ্চম সংসদীয় নির্বাচনে শতকরা পঞ্চান্ন ভাগেরও বেশী ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।[৩৩] এই সংসদ নির্বাচনে ৩১.৪৪ শতাংশ জাতীয়তাবাদী দল, ৩১.১৩ শতাংশ আওয়ামী লীগ, ১১.৬৯ শতাংশ জাতীয় পার্টি এবং ১১.৭৩ শতাংশ জামায়াতে ইসলামী পক্ষে ভোট পড়ে।[৩৪] ভোটে ভায়োলেন্স তেমন হয় নি বললেই চলে। গ্রামাঞ্চলে উৎসবের সাজ ছিল। মহিলারা নতুন কাপড় পড়ে সাজগোজ করে ভোট দিয়েছেন। ফলে এমন নির্বাচন সম্পর্কে অতি অভিযোগ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে।[৩৫] কারণ, এ নির্বাচনকে দেশী ও বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী অবাধ ও সুষ্ঠু বলে আখ্যায়িত করে। ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের নেতা পিটার শোর বলেন, "আমরা যা দেখেছি তাতে নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর আমাদের আস্থা বেড়ে গেছে। এই নির্বাচনে বেসামরিক ও সামরিক রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। এটা দেখে আমরা অভিভূত।"[৩৬] জাপানী পর্যবেক্ষক দলের নেতা হিরোইহি ফুকুদা বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। তারা আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচনে বিজয়ী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এখন একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশে সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট হবে।[৩৭] কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক গ্রুপ বলেছে, পার্লামেন্ট নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণের জন্য এক 'বিজয়'। গ্রুপের চেয়ারম্যান দাতো পাথমানাবান বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া ও ভোটগ্রহণ প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ।[৩৮] নির্বাচনের ফলাফল রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণের পূর্বাভাসের অনুরূপ ছিল না এবং এতে বিএনপি ১৪০টি আসন লাভ করে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। অন্যান্য দলের আসনপ্রাপ্তির সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ : জাতীয় পার্টি ৩৫টি, জামায়াতে ইসলামী ১৮টি, বাকশাল ৫টি, সিপিবি ৫টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট, ওয়ার্কার্স পার্টি, ন্যাপ (মুজাফ্ফর), জাসদ (সিরাজ), এনডিপি ও গণতন্ত্রী পার্টি প্রত্যেকে ১টি করে আসন পায়। এ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ৩টি আসন লাভ করেন।[৩৯] নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সিভিল সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন, ভোটাররা এবার সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। অতীতে ব্রুট মেজরিটির সুবাদে ক্ষমতাসীন দল যেভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, তার অভিজ্ঞতা ভাল নয়। এবারই প্রথমবারের মতো জনগণ কাউকে ব্রুট মেজরিটি দেয় নি। এ সংসদের গঠন চেক এন্ড ব্যালেন্সের সুযোগ রয়ে গেছে। এটি সংসদীয় স্বৈরাচারের ব্যাপারে সর্তক সিদ্ধান্ত ছিল।[৪০]

উল্লেখ্য, নির্বাচনের ফলাফল অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল আওয়ামী লীগের নিকট আশানুরূপ হয় নি। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতা ড. কামাল হোসেন, আমির হোসেন আমু, আব্দুল মান্নান এবং জিল্লুর রহমান পরাজিত হন। দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ঢাকার ২টি আসনে একই পরিণতি ঘটে। এ

প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ আনেন এবং তা জনগণের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে মত প্রকাশ করেন। তবে গণতন্ত্রের স্বার্থে তিনি নির্বাচনী ফলাফল গ্রহণ করেন এবং সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের ঘোষণা দেন। পঞ্চম সংসদীয় নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও সরকার গঠনের জন্য জাতীয় সংসদে প্রয়োজনীয় ১৫১টি আসন এ দলের ছিল না। তবে জামায়াতে ইসলামীর সাথে এ ক্ষেত্রে সমঝোতা হলে সরকার গঠনে বাধা দূর হয় এবং এভাবে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বিএনপি পার্লামেন্টারি পার্টির প্রধান বেগম খালেদা জিয়াকে কেবিনেট গঠনের আহ্বান জানান।[৪১]

তখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ খালেদা জিয়াকে প্রধান করে ৩০ সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সংবিধান অনুযায়ী তখনো নির্বাহী ক্ষমতার মালিক ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। তবে তিনি মন্ত্রিপরিষদের কোনো কাজেই হস্তক্ষেপ করতেন না। সাহাবুদ্দীন আহমদ কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি ছাড়া খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ ছিলেন। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে খালেদা জিয়া সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন করা হয়। এই দুইটি সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের পূর্ব পদে ফিরে যাওয়া এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।[৪২]

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ

২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথমবারের মতো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায় এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের রীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়।[৪৩] অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, "বাংলাদেশ যে সব সম্ভবের দেশ তা আবার প্রমাণিত হয়েছে। নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণ করেছে যে এ দেশ সম্পর্কে অতি সহজে বিজ্ঞজনরা যে সরলীকরণ করেন বা 'যৌক্তিক' ভাবেন তা ঠিক নয়। অজ্ঞ লোকজনই দেখা যায় নীরবে ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নিয়ে নেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত দেখা যায়, বিজ্ঞজনরা, অজ্ঞজনদের উপাদান হিসেবে মনে না করে সিদ্ধান্ত দেন, আর অজ্ঞজনরা ঠিক উল্টো কাজটি করেন। এবং আশ্চর্য যে এখন পর্যন্ত তাদের কোনো সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয় নি। নির্বাচনের আগের দিন এবং ফলাফল গণনার সময়, প্রাথমিক পর্যায়ে সবাই নিশ্চিত ছিলেন যে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে, দ্বিতীয় বিএনপি, তৃতীয় জামায়াত। জাতীয় পার্টিকে কেউই ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি। সকালে দেখা গেল প্রায় প্রতিটি পূর্বাভাসই ভুল প্রমাণিত হয়েছে।"[৪৪]

নির্বাচন পরবর্তীকালে সবাই নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণে ব্যস্ত। উপাত্ত ও বিশ্লেষণের ভারে সবাই ন্যূব্জ। আওয়ামী লীগের পরাজয়ের ১০১টি কারণ হয়ত ব্যক্ত করা হবে। *বাংলাদেশের রাজনীতি :*

একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮), গ্রন্থে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন আওয়ামী লীগের পরাজয়ের বেশ কিছু কারণ তুলে ধরেন :

১. স্বাধীনতার পর যে প্রবল প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা বিনষ্ট হয়েছিল অঙ্কুরে এবং যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল গভীর ক্ষতের গত জেনারেশন এখনো তা ভোলে নি । বর্তমান মেরুকরণে তবু তারা সহানুভূতিশীল ছিল আওয়ামী লীগের প্রতি। কিন্তু প্রাক-নির্বাচনী সভাগুলোতে আওয়ামী লীগের বক্তৃতা-বিবৃতিতে ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করা হয় যাতে রাজনীতির বদলে প্রকাশ পেত ব্যক্তিগত ক্ষোভ, তা বিরক্ত করেছে সেই জেনারেশনকে। একই সাথে ব্যর্থ হয় নতুনপ্রজন্মের মন জয় করতে।

২. অন্যদিকে বিএনপি পারতপক্ষে ওদিকে যায় নি। তারা তাদের সাফল্য প্রচার করেছে। সংবাদপত্রসমূহ ছিল বিএনপির প্রতি সহানুভূতিশীল। কারণ সেগুলোর মালিকরা ১৯৭৫ সালের পরই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন। বিএনপির প্রচারের কাছে আওয়ামী লীগ দাঁড়াতে পারে নি।

৩. নতুনপ্রজন্ম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ছিল শিশু অথবা দেখেই নি মুক্তিযুদ্ধ। তবে তারা হয়ত কিশোর বয়সে দেখেছে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াকে বা অনবরত শুনেছে তাঁর পক্ষে প্রচার। পরবর্তীকালে দেখেছে তারা এরশাদকে। ফলে এ দু'জনের তুলনায় জিয়াই হয়ে উঠেছেন তাদের কাছে উজ্জ্বল। এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার স্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়াই অধিকার করেছেন তাদের কল্পনাকে। নতুনপ্রজন্ম চায় অদোদুল্যমান নেতৃত্ব। খালেদা জিয়া তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। সেনাবাহিনী থেকে বিএনপি উদ্ভূত বা এর চরম দক্ষিণপন্থী ঝোঁক– এর মতো বিষয়গুলো ভুলেছে তারা বহিরঙ্গ দেখে। তাদের কারণে বিএনপির চরিত্র হয়ত পরিবর্তন হতে পারে। না হলে এক সময় সেনা শাসন, জামায়াত শাসন প্রশ্নে এরা দলত্যাগ করতে পারে।

অন্যদিকে, নতুনপ্রজন্মের কাছে সে সময় আওয়ামী লীগের তেমন কোনো আকর্ষণ ছিল না। জন্ম থেকেই সে বড় হয়েছে আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রচারণার শুনার মধ্যে দিয়ে। সামরিক শাসক জিয়া ও এরশাদের সময় বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অনবরত চলেছে প্রচারণা। আর ষাট-সত্তরের যে তরুণরা আওয়ামী লীগ গড়ে তুলেছিল তারা মধ্য বয়স্ক, চাকরি-বাকরি-সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সংগঠন ছিল ঠিকই কিন্তু সেখানে সবাই নেতা এবং সবাই সবার বিরুদ্ধে। কর্মী প্রায় নেই। নতুনপ্রজন্মকে কর্মী হিসেবে দলে টেনে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল আওয়ামী লীগ। এ দলের নেতারা খুব সম্ভব আত্মতৃপ্তিতে ভুগছিলেন। তারা ধারণা করেছিল এই– নৌকা মার্কা হলেই সবাই ভোট দিয়ে যাবে। কিন্তু তারা এ বিষয় ভুলে গিয়েছিল দীর্ঘ দিন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালান হয় এবং নতুনপ্রজন্ম তা গ্রহণ করে। তাদের দায়িত্ব ছিল নতুনপ্রজন্ম কাছে মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের কৃতিত্ব তুলে ধারা– তা করতে তারা ব্যর্থ হয়। বিএনপির কর্মীরা নির্বাচনের আগে ঘরে ঘরে গেছেন দলের জন্য প্রচারের জন্য। আওয়ামী লীগের কর্মীরা ছিলেন অনুপস্থিত। ফলে নির্বাচনের ফলাফল আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যায়।

৪. গণ-আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ ও আট দলের দোদুল্যমানতা নতুনপ্রজন্মের কাছে এ বিষয়টিই তুলে ধরেছে যে বিএনপি অনমনীয় ও সাহসী। আর তরুণপ্রজন্মের কল্পনাকে অধিকার করে থাকে সাহসী নেতৃত্ব। শেখ মুজিব যে রকমভাবে অধিকার করেছিলেন গত প্রজন্মের কল্পনাকে। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া দু'জনেই এরশাদের বিচার দাবী করেছেন কিন্তু প্রচারের কারণে মানুষ বুঝেছে আওয়ামী লীগ এরশাদের প্রতি অধিক নমনীয়। এ নমনীতা ভোটাদের খুশি করতে পারে নি।

৫. আওয়ামী লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব যতটা প্রচার পেয়েছিল বিএনপির ততটা নয়। বিএনপি থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের অনেকে জাতীয় পার্টিতে ছিলেন বা সহানুভূতিশীল জাতীয় পার্টির প্রতি এ তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নি। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগে পুরোনো পরীক্ষিত নেতাদের, দেশে যাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল তাদের অযথা কোণঠাসা করার প্রচেষ্টা শহুরে মধ্য শ্রেণী ভালো চোখে দেখে নি, যেমনটি দেখে নি ১৯৭২-১৯৭৩ সালে তাজউদ্দীন আহমদ ও আরও কিছু পুরোনো নেতাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। আওয়ামী লীগে এ ধরনের প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বের একাংশের প্রশ্রয় দেওয়া দলকে আরও দুর্বল করে দেয়। ফলে নেতিবাচক ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঢাকার দু'টি আসনে শেখ হাসিনার পরাজয়ের এটি হয়ত একটি কারণ।

৬. এতসব সত্ত্বেও লক্ষণীয় যে ভোটের পার্থক্য মাত্র দশমিক ৩১ ভাগ। এবং এতেই আসন সংখ্যার পার্থক্য দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশে। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ও আট দলীয় জোটের আসন ভাগাভাগি নিয়ে প্রহসনের সৃষ্টি, প্রাক-নির্বাচনী বক্তৃতা জনমনে সৃষ্টি করেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার। এ কারণে বিপক্ষের ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ভোট কমে যায়। তা ছাড়া আট দলের আসন প্রহসন না হলে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের আসনের পার্থক্য আরও কমে আসত।

তবে, সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পেরে খুশি এবং অনেকে সে সময় বলেছে, প্রতিটি নির্বাচনের আগে এ রকম নির্দলীয় সরকার হলে মন্দ হয় না।[৪৫] এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রচারণায় বেশ পিছিয়ে ছিল। ১৯৭৫ পরবর্তীকালে যে সংবাদপত্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রায় সবগুলোই বিএনপির প্রতি সহনুভূতিশীল। এই সংবাদপত্রগুলো বিএনপির ইতিবাচক দিকগুলো নতুনপ্রজন্মের কাছে তুলে ধরে পাশাপাশি আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রচারণাও চালায়। ফলে নির্বাচনে বিএনপি সাফল্য লাভ করে।

৫ম জাতীয় সংসদে সংসদ সংসদের পেশার বিবরণ

সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের মধ্যে ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং শিল্পপতিদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের শতকরা ৫৩ ভাগ এ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির যথাক্রমে শতকরা ৬৬, ৫১ এবং ৬৩ ভাগ সংসদ সদস্যই এই শ্রেণীর এবং জাতীয় সংসদে তাঁরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী।[৪৬] রাজনৈতিক নিয়োগ ও মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার

ফলে দেশের নির্বাচনিক রাজনীতিতে অভিজ্ঞতাহীন শিল্পপতি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলাগণ প্রবেশ করতে থাকেন ও সাফল্য পান।[৪৭] পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের মধ্যে সামরিক আমলা ৪%, বেসামরিক আমলা ২.৩৩%, ব্যবসায়ী ৩৮.৬৭%, আইনজীবী ১৯.৩৩%, রাজনীতিবিদ ১৭.১৭%, অন্যান্য ৬%।[৪৮] লক্ষণীয় রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের প্রাধান্য তুলনামূলক কম। অপর দিকে ব্যবসায়ী, আইনজীবী, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের প্রভাব প্রবল– যা রাজনীতির জন্য শুভকর নয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম

নির্বাচন হওয়ার আগে তো বটেই, নির্বাচনের পরও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি বিষয়– সংসদ। কেমন হবে অবাধ নির্বাচনে নির্বাচিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ? এ সংসদ কি হবে শেখ মুজিবুর রহমানের আমলের সংসদের মতো? নাকি হবে জিয়াউর রহমানের আমলের মতো? নাকি এরশাদীয়? সংসদে প্রবল প্রতাপশালী নেতা থাকলে সংসদের কার্যাবলী আবর্তিত হয় তাঁকে কেন্দ্র করেই। আর সেই নেতার দল যদি অতি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় সংসদে, তাহলে সে সংসদ হারায় ঔজ্জ্বল্য, অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বও। শেখ মুজিবের আমলে সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিলেন তিনি, সংসদ হয়ে উঠেছিল আর্কষণহীন। জিয়াউর রহমান ছিল তাঁর দলের মূল ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির ভিত্তি তখন দৃঢ় করা হয়, ফলে সংসদ গুরুত্ব হারায়। তবে, খানিকটা আগ্রহ ছিল তখনও সংসদ বিষয়ে। এরশাদীয় সংসদ হয়ে উঠেছিল গুরুত্বহীন। আসলে এরশাদ সংসদকে তা-ই করতে চেয়েছিলেন, যাতে সার্বভৌম হিসেবে সংসদের কোনো মর্যাদা না থাকে। নতুনপ্রজন্মকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সংসদ প্রধান কোনো বিষয় নয়। তিনি অনেক ক্ষেত্রে তাতে সফলও হয়েছিলেন। সুতরাং এরশাদীয় সংসদ সম্পর্কে যত কম আলোচনা করা যায় ততই ভাল। ১৯৯১-এর নির্বাচনে মানুষ ভোট দিয়েছে উৎসবের মতো। অনেক অঞ্চলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। তাতে বোঝা যায় কালোটাকার প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি সত্যিকার অর্থেই জনপ্রতিনিধি। ১৯৯১ এর সংসদে বঙ্গবন্ধু, জিয়া বা এরশাদ আমলের মতো কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নি। শুধু তাই নয়, ১৯৯১-এর সংসদে সরকার ও বিরোধীদলে আছেন বাংলাদেশের দুই 'ক্যারিশমা'– যাঁরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করেন। ফলে, সংসদ হয় ঝামেলাপূর্ণ; প্রকম্পিত হয় সংসদ আবেগঘন ও ক্রুদ্ধ বক্তৃতায়। এক কথায় যাকে বলে সংসদ অধিবেশন হয় জমজমাট। সংসদের প্রধান উপাদান সংসদ সদস্যগণ। অথচ, কোনো আমলেই তাঁরা প্রধান উপাদান হয়ে ওঠেন নি। বঙ্গবন্ধু, জিয়া বা এরশাদ আমলে তাঁদের করণীয় কিছুই ছিল না। শুধু কণ্ঠ ভোটে অংশগ্রহণ করা ছাড়া। শুধু তাই নয়, ক্রমাগত তাঁদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একজন সংসদ সদস্যের যে মর্যাদা ছিল, ক্রমে তা হ্রাস পেতে পেতে এরশাদ আমলে লুপ্ত হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল এবং স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর আমলে অসংখ্য ফরমান, আইন ইত্যাদির মাধ্যমে এমন সব পরিবর্তন করেছেন, যা সংসদ ও গণতন্ত্রের জন্য নেতিবাচক। এ রকম একটি ফরমান হল 'ওয়ারেন্ট

অব প্রিসিডেন্স'। পৃথিবীর প্রতিটি সরকারের 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' আছে। এ নিয়ম সরকারে বা রাষ্ট্রে কার কী অবস্থান তা নির্ণয় করে। আবার এই মর্যাদার ভিত্তি নির্ধারণ করে রাষ্ট্রের চরিত্র। গণতন্ত্রের একটি অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বেসামরিক কর্তৃত্ব। যে সব দেশে গণতন্ত্র আছে সে সব দেশে সম্পূর্ণ বজায় আছে বেসামরিক কর্তৃত্ব। তা যদি না থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে সেখানে গণতন্ত্র নেই। একটি সভ্য দেশে 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স'-এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান নির্ধারিত নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তারপর বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং তারপর বেসামরিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সবশেষে সামরিক কর্মকর্তাদের।[৪৯] বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের মর্যাদা অনেক নিচে। কিন্তু এ অবস্থা কেন সংসদ সদস্যগণ মেনে নেন তা বোধগম্য নয়। আমাদের কাছে এমন সংসদ কাম্য নয়।[৫০] তবে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোতে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে জাতীয় সংসদ এবং এ মৌলিক ক্ষমতা চর্চার পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠান করারোপ, সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, সংসদীয় তদারকি, সরকারের দায়িত্বশীলতা দাবী, নির্বাচন ও অপসারণ, সংবিধান সংশোধন, নির্বাহীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনসহ সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব পালন করে। নব প্রেক্ষাপটে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন এবং সংসদ প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন জোয়ার এনে দেয় ও গণতন্ত্র বিনির্মাণসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকায়নে নতুন আশার সঞ্চার করে।[৫১]

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। রচিত হয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো। তবে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের এখনো তৈরী হয় নি গণতান্ত্রিক মন।[৫২] পঞ্চম জাতীয় সংসদের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য ছিল শক্তিশালী সুসংগঠিত বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং এ সংসদের ৩৩০টি আসনের মধ্যে বিরোধীদের আসন সংখ্যা ছিল ১৫৮টি যা অতীতের চারটি সংসদের কোনোটিতেই দৃশ্যমান হয় নি। পঞ্চম সংসদ গঠনের পর দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের প্রশ্ন এসে যায়। বস্তুত এরশাদ সরকারের পতনের প্রাক্কালে এ ব্যাপারে তিন রাজনৈতিক জোটের যৌথ ঘোষণা এবং জাতীয় সংসদে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণে তিনজোটের ঘোষণা বাস্তবায়নের তাগিদ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলোকে সংসদীয় ব্যবস্থা ও সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্রিয় করে তোলে। জাতীয় সংসদের বাইরে আওয়ামী লীগ ছাড়াও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান এবং সিভিল সমাজ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার হয়। আওয়ামী লীগ তার এ নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে বদ্ধপরিকর হয়ে জাতীয় সংসদে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পেশ করে এবং জামায়াতে ইসলামী ও পাঁচ জোটভুক্ত সংসদীয় দলগুলো এ প্রস্তাবে সমর্থন প্রদান করে। সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিরোধীদলীয় উপনেতা এ ব্যাপারে সংবিধান সংশোধনী বিলের নোটিশ প্রদান করেন। আওয়ামী লীগ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির কার্য মেয়াদের বৈধতা ও প্রধান বিচারপতি পদে তাঁর ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আরও একটি সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপন করে। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সরকারী দল শুধুমাত্র প্রধান বিরোধী দলের চাপই নয়

বরঞ্চ বিএনপির বিভিন্ন নেতাকর্মী ও সমর্থকগোষ্ঠীর দাবীরও সম্মুখীন হয়। বিরোধী দল এবং সরকারী ব্যাকবেঞ্চারদের দাবীর প্রেক্ষাপটে বিএনপি নেতৃত্ব অবশেষে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি শাসিত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা রোধে সংসদীয় কাঠামো উপযুক্ত বলেও ধারণা করা হয়। পঞ্চম সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে শাসক দল বিএনপি সংবিধান (একাদশ সংশোধনী) বিল ১৯৯১ ও সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধনী) বিল ১৯৯১ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করে। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়া এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন-সংক্রান্ত উক্ত বিল দু'টি যথারীতি রিপোর্ট প্রদানের জন্য নির্ধারিত ১৫ সদস্যবিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটির নিকট পাঠানো হয়। অবশেষে কমিটির রিপোর্ট সর্বগ্রাহ্য হয় এবং ৬ই আগস্ট ১৯৯১ জাতীয় সংসদে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। পরবর্তী কর্মদিবসে প্রথম বিলটি ২৭৮-০ ভোটে পাস হয় এবং দ্বিতীয়টির ওপর দুইবার ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রথমে তা ৩০৬-০ ভোট এবং দ্বিতীয়বার ৩০৭-০ ভোটে পাস হয়। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর ওপর ১৯৯১-এর সেপ্টেম্বর মাসে গণভোট শেষে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৩]

সর্বসম্মতিক্রমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু হলে গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারি কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিকায়নের নতুন আশার সঞ্চার হয় এবং নির্বাচিত নেতৃত্বের ওপর এ ব্যাপারে যথাযথ দায়িত্ব বর্তায়। এ জন্য সংসদীয় প্রথার অনুসরণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কৃতির ধারণ ও পালন আবশ্যক হয়ে পড়ে। তবে সংসদীয় আচার-অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সংসদীয় সমঝোতা প্রতিষ্ঠা দুরূহ হয় প্রধানত ট্রেজারি বেঞ্চ ও বিরোধী দলের পারস্পারিক অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের কারণে। সমঝোতার মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও এ কাঠামো 'প্রধানমন্ত্রীর সরকার' গঠন করে ও সংসদ সদস্যগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। ফলে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতি সমস্যাসঙ্কুল হয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যগণের স্বাধীনতা খর্ব করে এবং প্রধানমন্ত্রীর বিপক্ষে ভোট প্রদান বা গ্রুপ গঠন অসম্ভব হয়ে যায়। ট্রেজারি বেঞ্চ ও বিরোধী দলের মধ্যকার মতানৈক্যের কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন স্পীকারে নির্বাচন সংক্রান্ত সংসদীয় প্রথা অনুসরণ সম্ভবপর হয় নি। এর প্রতিফলন হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে দু'টি পক্ষের বিপরীতমুখী অবস্থান দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সংসদীয় কার্যক্রমকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে থাকে। পারস্পারিক অসহযোগিতার কারণে সংসদ থেকে বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াকআউট বয়কট পর্যন্ত গড়ায়। বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনতে সরকারী দল চার-দফা সমঝোতা স্বাক্ষর করলেও তা রক্ষিত হয় নি। বিরোধী দল নিজ দাবী অর্জনে সংসদের বাইরে হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে এবং সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৫ই আগস্ট ১৯৯২ অনাস্থা প্রস্তাবের সাতটি নোটিশ প্রদান করে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, ন্যাপ, সিপিবি, ওয়ার্কার্স পাটি এবং গণতন্ত্রী পার্টি। ওই নোটিশগুলোর মধ্যে স্পীকার বিরোধীদলীয় উপনেতা আনীত নোটিশটি সংসদে আলোচনার জন্য অনুমোদন করেন।

দেশের সার্বিক ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার চিত্র উপস্থাপন করে অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিরোধীদলীয় নেতাসহ আওয়ামী লীগের আব্দুর রাজ্জাক, মতিয়া চৌধুরী, রহমত আলী, আজিজুর রহমান ও মির্জা আযম, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সিপিবির শামসুদ্দোহা, জাসদ সিরাজের শাজাহান সিরাজ এবং জামায়াতে ইসলামীর শেখ আনসার আলী। ট্রেজারি বেঞ্চ ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক ও যুক্তি পেশের পর স্পীকার ওই অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করেন। অনাস্থা প্রস্তাবটি যথারীতি ১৮৬-১২২ ভোটে পরাজিত হয়। জামায়াতে ইসলামী ভোটদানে বিরত থাকে এবং এনডিপি ও ইসলামী ঐক্যজোটের সংসদ সদস্যগণসহ দু'জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য সংসদে অনুপস্থিত থাকেন। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে অনাস্থা প্রস্তাবের কার্যকারিতা না থাকলেও বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদে এ সংসদীয় অস্ত্রটির প্রয়োগ সংসদ সদস্যগণের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্র তৈরী করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ সর্বমোট ২২টি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং ১৮৪টি বিলের মধ্যে ১৭৩টি বিল পাস করে। এর মধ্যে নতুন বিলের সংখ্যা ছিল ৬৫ এবং বাকী ৩৫ ভাগ বিল আসে অধ্যাদেশ আকারে। অধ্যাদেশ জারীর পর সে সব বিলের অনুমোদন সংসদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। উক্ত বিলসমূহের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যকই সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে পরীক্ষা ও পর্যালোচনার জন্য পেশ করা হয়। এমন কি কমিটির নিকট বিল প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায়ও সংসদের অনুমোদন লাভ করে যা সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে বলে অভিযোগ আনা হয়। উল্লেখ্য, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ২২টি অধিবেশনের মধ্যে বিরোধী দল প্রথম ১৩টি অধিবেশন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিল তবে ১৩তম অধিবেশনের পর আর সংসদে ফিরে যায় নি। উক্ত সময় পর্যন্ত তারা সরকারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহসহ নির্বাহীর দায়িত্বশীলতা দাবীকরণে বিভিন্ন সংসদীয় মেকানিজম ব্যবহার করে। বিরোধী দল প্রদত্ত ৬১ বিধি অনুযায়ী ৩৮টি মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হয় এবং এর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগের ২৫টি, জামায়াতে ইসলামীর ৭টি, এনডিপির ৩টি এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ এবং জাতীয় পার্টির ১টি করে। বিরোধী দলগুলো সংসদে ২৫১টি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, ৬২টি জনগুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব (বিধি ৬৮), ১২টি অর্ধঘণ্টা আলোচনার (বিধি ৬০) প্রস্তাব এবং ১৬৩টি স্পেশাল প্রিভিলেজের ওপর প্রস্তাব উত্থাপন করে। এ সকল নোটিশে সংসদ সদস্যগণের নির্বাচনী এলাকার সংশ্লিষ্ট ছাড়াও, অবকাঠামো গঠন, দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, সন্ত্রাস, মৌলবাদের উত্থান, ছাত্র রাজনীতি, খাদ্য ও বন্যা পরিস্থিতি, গোলাম আযম ইস্যু, বৈদেশিক সম্পর্ক, নদী ভাঙ্গন, পরিবেশ ইত্যাদি স্থান পায়।[৫৪]

বিরোধী দলের পাশাপাশি ট্রেজারি বেঞ্চের সংসদ সদস্যগণও উপরোক্ত বিভিন্ন সংসদীয় বিধি ব্যবহার করার প্রয়াস পান। নব প্রেক্ষাপটে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন থেকে বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কটের কারণে সংসদীয় কার্যক্রমের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে।[৫৫] পঞ্চম সংসদ ৫ই এপ্রিল

১৯৯১ থেকে ২৪শে নভেম্বর ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোট ৪০০ কর্মদিবসের মধ্যে বিরোধী দল ৬০বার ওয়াকআউট করে।[৫৬]

খালেদা জিয়া সরকারের অর্থনৈতিক সাফল্য

গণতান্ত্রিক সরকারের সময় অর্থনীতিতে একটা স্থিতিশীলতা আসে এবং একই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পযর্ন্ত জিডিপির একটা চিত্র তুলে ধরা হল– ১৯৯১ সালে ৩.৩%, ১৯৯২ সালে ৫.০%, ১৯৯৩ সালে ৪.৬%, ১৯৯৪ সালে ৪.১%, ১৯৯৫ সালে ৪.৯%, ১৯৯৬ সালে ৪.৬% প্রবৃদ্ধি হয়।[৫৭] যেখানে সামরিক সরকারের সময়ে জিডিপি ১৯৮৫ সালে ৩.২%, ১৯৮৬ সালে ৪.২%, ১৯৮৭ সালে ৩.৭%, ১৯৮৮ সালে ২.২%, ১৯৮৯ সালে ২.৬% এবং ১৯৯০ সালে ৫.৯%। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জিডিপি ২-এর ঘরে অথবা ৩-এর ঘরে এবং প্রবৃদ্ধি অস্থিতিশীল। সেখানে গণতান্ত্রিক সরকারের সময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল ছিল। গণতান্ত্রিক সরকারের সময় থেকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। অধিকাংশ সময়ই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৪-এর উপর ছিল।[৫৮] গণতান্ত্রিক পরিবেশে আরও বেশী প্রবৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিএনপি সরকার তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৯১-পরবর্তী সময়ে দৃশ্যত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটলেও রাজনৈতিক মঞ্চে প্রধান দুই দলের চলমান দ্বন্দ্ব এবং বৈরী সম্পর্ক দলীয় ব্যবস্থা ও দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো চালু হলেও এর কার্যকারিতার অভাবে কর্তৃত্ববাদী মনোভাব এবং প্রতিবাদী ও বিরোধিতার রাজনৈতিক আচরণ অব্যাহত থাকে। ফলে হরতালের সংস্কৃতি দৃঢ় হয় এবং সাংবিধানিক অধিকারের নামে হরতাল রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ক্রমাগতভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই সময়ে জাতীয় পর্যায়ে ৬৭টি হরতাল আহ্বান ও পালন করে। সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন এবং হরতাল পালনের কারণে বছরে শতকরা পাঁচভাগ জিডিপির ক্ষতি হয়।[৫৯] অর্থাৎ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ইতিবাচক হলে প্রবৃদ্ধি ১০-এর কাছাকাছি হতে পারত। তারপরেও বলা যায়, গণতান্ত্রিক যুগের সূচনাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও একটা ইতিবাচক সূচনা হয়।

ইশতেহার বাস্তবায়নে খালেদা জিয়া সরকারের ব্যর্থতা

নির্বাচনী প্রচারণাকালে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকটকৃত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ভোট প্রদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়। এ সকল দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো তাদের নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। তবে এ দেশের প্রেক্ষাপটে অনেক সময় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সফল রূপায়ণ হতে দেখা যায় না। অনেকে ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারসমূহ এবং নিজস্ব সামর্থ্যের মধ্যে ব্যাপক ফারাক পরিদৃষ্ট হয়। বিএনপি যমুনা বহুমুখী ও মেঘনা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা কৃষি ঋণ মওকুপের মতো কিছু ওয়াদা বাস্তবায়ন করতে পারলেও বেশীর ভাগ ওয়াদা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, বেতার টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকারপূরণের

শিথিলতা ও বাস্তবায়নের অভাব দৃশ্যমান হয়েছে।[৬০] বিরোধী দল আনীত বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের বিল সরকার পাস করতে দেয় নি। বিএনপি কালাকানুনগুলো বাতিলের কথা ওয়াদা করেছিল কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তারা দুর্নীতিমুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। এবং সে সময় দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। সরকার ও বিরোধী দল সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হওয়ায় বহুদলীয় সংসদ একদলীয় সংসদে পরিণত হয়। শ্রমিকদের অবস্থা পরিবর্তনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সাফল্য পরিলক্ষিত হয় নি।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ফিরে এল আবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দিন। বাংলাদেশে ১৯৭৫ পরবর্তীকালে অধিকাংশ আন্দোলন হয়েছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের সময় মানুষ হয়ে উঠেছে উদ্দীপ্ত, ভেবেছে পুরনো ভুলত্রুটি ভুলে যাত্রা শুরু হবে নতুনভাবে। কোনো দল যদি ভুল করেও থাকে তবে তারা তা শুধরে নেবে। কোনোবারই তা পূরণ হয় নি। বৃত্তাকারে ঘুরেছে নিয়তি। খালেদা জিয়াকে, নতুনপ্রজন্ম নীতির উপর বিশ্বাস করেই জয় এনে দিয়েছিল। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি নির্বাচনে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যেগুলোর জন্য তিনি এবং তাঁর দল জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। প্রথমেই ধরা যাক– মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুজ্জ্বল রাখবেন।[৬১] মুক্তিযোদ্ধা জিয়া ও একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে একাত্তরের ঘাতকদের আঁতাত হয়। ফের প্রমাণিত হয় বিএনপি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে কথা বলেছে তা সত্য নয়।[৬২] **১৯৯১** সালের ২০শে মার্চ বিএনপি সরকার **১১** সদস্যবিশিষ্ট কেবিনেটের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ২টি জামায়াতকে প্রদান করে বাকী ২৮টি আসনসহ সংসদে বিএনপি **১৬৮**টি আসন লাভ করে। ৫ই এপ্রিল **১৯৯১** আওয়ামী লীগকে সংসদে সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে ঘোষণা করে এবং এর প্রধান শেখ হাসিনাকে সরকারীভাবে বিরোধীদলীয় নেতা করা হয়। [৬৩]

১৯৯০-এর আন্দোলনের পর আশা করা গিয়েছিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পূর্ববর্তী ধারা থেকে আলাদা হবে। কিন্তু, দেখা গেল পূর্ববর্তী প্যাটার্ন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তাঁর *বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রক্রিয়া ও ঐকমত্যের উপাদান* গ্রন্থে কয়েকটি উদাহরণ দেন–

১. **১৯৮৭** সালে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের গণমিছিলে গুলি চালিয়ে ২০জনের বেশী মানুষ হত্যা করা হয়। এর জন্য মানুষ দায়ী করেছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাকে যিনি চট্টগ্রাম পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলতো বটেই খালেদা জিয়াও তাকে অভিযুক্ত করে বিচারের দাবী তুলেছিলেন। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ঐ অফিসারকে প্রমোশন দেওয়া হয়।

২. এম. কে. আনোয়ার ছিলেন এরশাদের আমলে মন্ত্রিপরিষদের সচিব এবং অভিযোগ করা হয় তিনি ছিলেন এরশাদের প্রিয়ভাজন। নির্বাচনের আগে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দিতে এলে আওয়ামী লীগ তাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। কারণ, তিনজোটের রূপরেখায় ছিল এরশাদ সমর্থক কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা আমলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। এম. কে. আনোয়ার তখন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিএনপি তাকে গ্রহণ করে, নির্বাচনে মনোনয়ন দেয় এবং তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলে তাকে মন্ত্রী করা হয়।

৩. একইভাবে তিনজোট ঘোষণা করেছিল, ভবিষ্যতে হত্যা, ক্যু বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা রোধ করা হবে। এ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হতে পারত **১৯৭৫** সালের 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' রদ যা পঞ্চম সংশোধনী হিসেবে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ, শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার সদস্যগণকে যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার করা চলবে না। আওয়ামী লীগ বিলটি উত্থাপন করলে তা বিবেচনার জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। বিশেষ কমিটি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। যে অদৃশ্য শক্তি বিএনপি নিয়ন্ত্রণ করছে বা যে শক্তি এই ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বাধা দিয়েছে তা নিরূপণ করা কঠিন নয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন অনেক সামরিক অধিকর্তা এবং রাজনৈতিকভাবে উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি চান নি এই অধ্যাদেশ রদ হোক; শুধু তাই নয়, বিএনপির জন্ম ক্যান্টনমেন্টে এবং এ দলের অনেক নেতা লাভবান হয়েছেন সামরিক ক্যুর কারণে। সুতরাং বিএনপির পক্ষে সম্ভব ছিল না এ ব্যাপরে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাদের পক্ষে সম্ভব নয় সামরিক বাহিনীর অপার সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করা।

৪. এ পরিপ্রেক্ষিতে আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সামরিক ব্যয় বা আনুষঙ্গিক কোনো বিষয় নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা হয় না, এমনকি এ বিষয়ে কোনো সংসদীয় কমিটিও গঠন করা হয় নি। জেনারেল এরশাদ নিজেকে রক্ষার জন্য 'পিএসএফ' নামে আলাদা একটি দেহরক্ষী দল গঠন করেছিলেন এবং অধ্যাদেশে বলা হয়েছিল এ রক্ষীদলের কেউ যদি কাউকে হত্যাও করে তাহলে তার বিচার করা যাবে না। 'পিএসএফ' লুপ্ত করার জন্য দাবী উঠেছিল। বেগম জিয়া এক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন করেছিলেন– 'পিএসএফ' প্রেসিডেন্টের নয় প্রধানমন্ত্রীর দেহ রক্ষা করবে। অন্য একটি বিষয় ,'ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্স' অনুযায়ী সচিব ও একজন মেজর জেনারেলের পদ সমান। এ কারণে প্রতিরক্ষা সচিবের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর যা সিভিল সমাজ বা কর্তৃত্বের বিরোধী। আওয়ামী লীগ সংসদে এরশাদ আমলে ঘোষিত এই 'প্রিসিডেন্স' বদলের প্রস্তাব এনেছিল তা বিশেষ

> কমিটি থেকে কখনও সংসদে আসে নি। এ সমস্ত বিষয় এ ধারণাই সৃষ্টি করে যে, রাষ্ট্রের কাজই হচ্ছে সামরিক শক্তিকে সেবা করা, উল্টোটা নয়।[৬৪]

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আশা করা হয়েছিল, গণতন্ত্র আস্তে আস্তে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াবে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র হবে টেকসই। কিন্তু অচিরেই দেশের মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। বিএনপির অধীন অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনগুলোতে আমরা বুঝতে পারি নির্বাচনী ব্যবস্থায় সামরিক স্বৈরশাসকদের সময় যে রূপ কারচুপি করা হতো তার ব্যতিক্রম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের অধীনে হয় নি।

ঢাকা মিরপুর উপ-নির্বাচন

৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩-এ অনুষ্ঠিতব্য মিরপুর আসনে উপ-নির্বাচনের আগে মিরপুর থানার ১৫জন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বদলী করা হয়। এদের মধ্যে ৬জন হিন্দু। এ বদলীর ঘটনায় বিরোধী দলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের নেতারা এ ঘটনাকে পুলিশ বাহিনীকে দলীয়করণের প্রচেষ্টা বলে অবহিত করেন।[৬৫] উপ-নির্বাচনে বেসরকারী ফলাফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন ৭৯ হাজার ৬ শ' ৯০ ভোট পেয়ে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত হন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল আহমদ মজুমদার পান ৭৫ হাজার ৮ শ' ৯২ ভোট। অর্থাৎ ভোটের ব্যবধান ৩ হাজার ৮ শ' ৩ ভোট।[৬৬] *দৈনিক সংবাদ*, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ সংবাদ পরিবেশন করে, ৩ তারিখ রাত ৮টায় কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয়ে মোট ১১৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ১০৫টি কেন্দ্রের ফল পাওয়া যায়। সেই ফল অনুযায়ী কামাল মজুমদার বিপুল ভোটে এগিয়ে ছিলেন।[৬৭] এ নির্বাচনে সরকারী দলের সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিনকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ বিএনপির এ বিজয়কে চ্যালেঞ্জ করে। ফলে নির্বাচন কমিশন ভোট পুনঃগণনা করে এবং বিএনপি প্রার্থীকেই বিজয়ী ঘোষণা করে। ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগ ১৬ কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন দাবী করে এবং এর প্রতিবাদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা ১১ আসনের অন্তর্গত সমগ্র এলাকায় অর্ধ দিবস হরতাল আহ্বান করে।[৬৮] ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ মিরপুর উপ-নির্বাচনে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করার প্রতিবাদে ৬ই ফেব্রুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। পুলিশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম, নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াকে লাঠিপেটা করে।[৬৯]

মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচনে ভোট কারচুপি অভিযোগ

শাসক দলের বিরুদ্ধে সংসদীয় উপ-নির্বাচনে বিশেষত মাগুরা-২ আসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে বিরোধী দল ভবিষ্যতের সকল নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের জন্য দাবী জানিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলে ও লাগাতার হরতালসহ বিভিন্ন বিক্ষোভের কর্মসূচী পালন করতে থাকে। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালে মাগুরা থেকে নির্বাচিত বিশিষ্ট

পার্লামেন্টারিয়ান আসাদুজ্জামান ইন্তেকাল করেন। ৯০ দিনের মধ্যে এই শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন এসে যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়। মাগুরার এই আসনটি দীর্ঘদিন যাবৎ আওয়ামী লীগ পেয়ে এসেছে। অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে প্রতিবারই এই আসন থেকে নির্বাচিত হয়। ফলে স্বভাবতই সকলের ধারণা ছিল, উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জিতবে। কিন্তু সেনা ছাউনী থেকে আসা মাগুরার আরেক নেতা বিএনপি সরকারের মন্ত্রী মাজিদ উল হক নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে আসনটি 'ম্যাডামকে' উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা আঁটে।[৭০] এবং তার পরিপকল্পনায় ও সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে বিএনপি মাগুরা নির্বাচনের ফলাফল যে-কোনো উপায়ে নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগ ১৭ই মার্চ ১৯৯৪ নির্বাচন কমিশনে ক্ষমতাসীন বিএনপির বিরুদ্ধে ৬ দফা অভিযোগ দায়ের করে। আওয়ামী লীগের ৬ দফা অভিযোগের মধ্যে ছিল স্থানীয় আনসার-ভিডিপি সদস্যদের বিএনপির পক্ষে প্রচার চালাতে ও ভোট দিতে নির্দেশ দেওয়া, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থানার ওসিদের বদলী ও নতুনদের নিয়োগ দেওয়া, ধানের শীষের পক্ষে কাজ না করলে ৩জন ইউপি চেয়ারম্যানকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক করার হুমকি প্রদান, ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন এবং প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রী-এমপিদের নির্বাচনী প্রচারে উন্নয়ন অঙ্গীকার প্রদান। আওয়ামী লীগ দাবী করে, ক্ষমতাসীন দলের সব নেতৃবৃন্দ ও তাদের প্রার্থী সরকারী পদ-পদবীর সুবিধা ব্যবহার করে নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করেছেন। মাগুরা-২ সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দু'দফা (৭ ও ১৭ই মার্চ ১৯৯৪) নির্বাচনী প্রচার চালায় এবং ১৮ই মার্চের প্রচারকালে তিনি 'উন্নয়নের জন্য' বিএনপি প্রার্থীকে ভোট প্রদানের আহ্বান জানায়। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারকালে এবং পৃথকভাবে এ নির্বাচনী এলাকায় বেশ ক'জন মন্ত্রীও নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ সাংবাদিকদের এ বিষয়টি অবহিত করে দাবী করে বলেন, ঢাকায় সরকারী দায়িত্ব ফেলে রেখে ও অবহেলা করে মন্ত্রীরা এক সপ্তাহ যাবৎ ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে সরকার দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন।[৭১] মাগুরা-২ শূন্য আসনের উপ-নির্বাচন ১৯৯৪ সালের ২০ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৫জন প্রার্থী ছিলেন। এতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীর মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নির্বাচন কমিশন এ আসনের ফলাফল ঘোষণা করলেও আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে সে ফল প্রত্যাখ্যান করে।[৭২] নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ (বা প্রার্থীগণ) মাগুরা-২ উপ-নির্বাচনে মোট ১৬টি ভোটকেন্দ্রে অনিয়ম বা ভোট-কারচুপি হয়েছে বলে দাবী করলেও ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে মোট ২৫টি কেন্দ্রে অনিয়ম বা ভোট-কারচুপির অভিযোগ করা হয়েছিল।[৭৩] ২০ই মার্চের ভোট প্রদান শেষ হবার আড়াই ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ৬.৩০ আওয়ামী লীগ প্রার্থীর শহরের বাড়ীতে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ প্রেস ব্রীফিংয়ে শেখ হাসিনা নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও সহিংসতার অভিযোগে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখান করেন এবং বলেন, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি

হয়েছে এবং আমরা ফলাফল প্রত্যাখ্যান করছি। এটি এখন প্রমাণিত, এ সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না এবং আমরা একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন চাই।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনী এলাকার ১৯টি ইউনিয়নের মধ্যে বিএনপি কর্মীরা ১৩টি দখল করে রাখে এবং নির্বাচনে কারচুপি করে। তিনি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগে মাগুরা ত্যাগ করে নীল নকশার বাস্তবায়নে বিএনপিকে সাহায্য করার জন্য সিইসিকে অভিযুক্ত করেন। তিনি ডিসি এবং এসপিকে তাদের সরকারী পদমর্যাদা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ব্যবহারের জন্য অভিযুক্ত করেন এবং বলেন, দায়িত্ব পালনে ৪৫টি মোবাইল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের কোনোটিকেই দায়িত্ব পালনের জন্য যানবহন দেওয়া হয় নি।[৭৪] জাতীয় পার্টি নেতা কাজী জাফর আহমেদ ২০শে মার্চ রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে মাগুরা-২ আসনে নতুন নির্বাচন দাবী করে ভোট ডাকাতির দায়ে সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন এবং বলেন, ভোট ডাকাতি করে বিএনপি গণতন্ত্র হত্যা করেছে।[৭৫]

এই উপ-নির্বাচন সরকার এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে পরে। এমনকি নির্বাচনের দু'দিন আগে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বাছাই করা কিছুসংখ্যক চিহ্নিত ঘাতককে নির্বাচনী কাজে সরকারকে সহায়তা দানের শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। ভোটের দিন তাদেরকে বিভিন্ন কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮ই মার্চ ১৯৯৪ শালিখা উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিস প্রাঙ্গণে মুক্তিপ্রাপ্ত এই সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে তাদের অস্ত্রের সাফসাফাই করে। এ খবর পাওয়ার পর মাগুরা সদরে উপস্থিত স্বয়ং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঢাকায় ফিরে আসেন। ২০ই মার্চের নির্বাচনে অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসহায় নির্লিপ্ততার মধ্যে বিএনপি প্রার্থীকে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। এই নির্বাচনে প্রকাশ্য কারচুপি বিরোধী দলের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করে এবং এই সরকারের অধীনে আর কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় বলে বিরোধী দল ঘোষণা দেয়। দাবী ওঠে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের। নির্বাচন করে ক্ষমতা আসা বিএনপি'র শাসনামলে প্রধানতঃ দু'টি উপ-নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকারের সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিশেষ করে, মিরপুরের উপ-নির্বাচন থেকেই কারচুপির অভিযোগ ছিল।

১৯৯৪-এর ২০ই মার্চ মাগুরার উপ-নির্বাচনে ফলাফল একতরফাভাবে নিজেদের পক্ষে নিয়ে নেওয়ায় সরকার দেশ-বিদেশেও সমালোচিত হয়। ১৯৯৪-এর এই দু'টি উপ-নির্বাচনের পরেই বিরোধী দল স্থির সিদ্ধান্তে আসে যে, ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না। এ দু'টি উপ-নির্বাচনের ঘটনা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করে। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে রূপরেখা দেওয়া হয় এতে সরকারী দল ছাড়া সবাই ঐকমত্য প্রকাশ করে। তবে প্রধানতঃ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত সংসদের ভেতরে ও বাইরে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলন করতে থাকে। আন্দোলনের

এই পর্যায়ে বিরোধী দলগুলোর অধিবেশন বর্জন অব্যাহত থাকে। অবশ্য তাদেরকে সংসদে আনার জন্য স্পীকার উদ্যোগ নেন। তিনি বিরোধী দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু বিরোধী দল ৪ঠা মে সংসদ অধিবেশন এবং ৬ই জুনের বাজেট অধিবেশনও বর্জন অব্যাহত রাখে। সংসদ বর্জনের পাশাপাশি রাজপথের আন্দোলনও চলতে থাকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীসহ অন্যান্য দাবীতে বিভিন্ন তারিখে হরতাল পালিত হয়। এই হরতাল শুধু আওয়ামী লীগ দলগতভাবে একাই করে নি। সময় সময় জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ যৌথভাবেও সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে।

৭ই এপ্রিল ১৯৯৪, বিরোধী দলের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী চলাকালে দু'জনের মৃত্যু হয়। আহত হয় শতাধিক। বিএনপি-আওয়ামী লীগ উভয় দলই দাবী করে নিহতরা তাদের দলের। দু'দলই জানাজা পড়ায়। এই মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে ১০ই এপ্রিল বিরোধী দলগুলোর ডাকে হরতাল পালিত হয়। ২৬শে এপ্রিল জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ মিলে সারা দেশে আবার হরতাল আহ্বান করে। আন্দোলনের এ পর্যায়ে বিরোধী দলগুলো সংসদ অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত থাকে।[৭৬]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা

২৭শে জুন ১৯৯৪ সালে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়, উপ-নির্বাচনে ব্লুপ্রিন্ট অনুযায়ী প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করে সরকার নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছেন। এ সব কারণে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংসদ নির্বাচনের আগে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে। এ জন্য সাংবিধানিক বিধানের দাবী করা হয়। এই দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সংসদ অধিবেশন বর্জনসহ সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সরকার সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এবং অগণতান্ত্রিক বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে। বেগম জিয়া এক পর্যায়ে এমন শ্লেষাত্মক মন্তব্যও করেন, 'একমাত্র শিশু ও পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়।'[৭৭] সরকারী দল এর পরিবর্তে নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার প্রস্তাব পাঠায়। এতে বিরোধী দল সন্তুষ্ট না হয়ে পরবর্তী উপ-নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে নির্বাচন কমিশনকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার জন্য সরকার সংসদে একটি বিল উত্থাপন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন গঠিত সম্মিলিত বিরোধী দল আরও ইস্পাত কঠিন সংকল্প গ্রহণ করে সরকারের এই প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করে। আন্দোলনরত দলগুলো এই সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচন কিংবা উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দেয়। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল সংসদে উত্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিলে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত আছে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখার সার-

সংক্ষেপ ছিল, সরকারকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ৯০ দিন আগে পদত্যাগ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করবেন। এই প্রধান নির্বাহী নির্দলীয় ব্যক্তিদের নিয়ে তার মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। তিনি বা তার মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবলুপ্ত হয়ে যাবে।[৭৮]

এদিকে ২৯শে জুন ১৯৯৪ বিরোধী দলসমূহের সংসদ বর্জনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি রীট আবেদন দাখিল করা হয়। ৭ই জুলাই ছিল বগুড়া-৪ আসনের উপ-নির্বাচন। সকল বিরোধী দল এই প্রথমবারের মতো বিএনপি সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন বয়কট করে ঐ দিন বগুড়ায় হরতাল আহ্বান করে। আগস্টের শেষ সপ্তাহে সংসদকেন্দ্রিক সরকার বিরোধী আন্দোলনের নতুন মাত্রা যোগ হয়। ২৫শে আগস্ট জাতীয় সংসদে সম্মিলিত বিরোধী দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সরকারের পক্ষ থেকে অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য বিরোধী দলসমূহের প্রতি বার বার আহ্বান জানানো হয়। এ অবস্থায় ৩১শে আগস্ট সংসদে সরকারী ও বিরোধী দলের দুই উপনেতার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর বিরোধী দলের ডাকে ঢাকা অবরোধ পালনকালে সংঘর্ষে কয়েক শ' লোক আহত হয়। প্রতিবাদে পরদিন ঢাকায় আধা-বেলা হরতাল পালিত হয়। ১২ই সেপ্টেম্বরও হরতাল ছিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একটা আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ দিনও সারা দেশে হরতাল পালিত হয়।[৭৯]

রাজনীতিকদের কেয়ারটেকার সরকার গঠনের প্রস্তাব

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর, *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ* গ্রন্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, অভাবিত প্রতিপত্তির অধিকারী এবং মহাযুদ্ধবিজয়ী রাষ্ট্রনায়ক চার্চিল ক্ষমতায় থাকলে নির্বাচন অবাধ হবে না, এ যুক্তিতে ব্রিটেনেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী উঠেছিল। সে দেশের রাণী তখন কিন্তু রাজনীতিক চার্চিলকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সমস্যা সমাধান করেছিলেন। ভারতেও সংসদে খুব সামান্য সংখ্যক সংসদ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট নেতা চন্দ্র শেখরের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল। বাংলাদেশে যদি খালেদা জিয়ার অধীনে নির্বাচন করা না যায়, তাহলেও, রাজনীতিকদের নিয়েই কেয়ারটেকার সরকার হতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারে কর্তৃত্ব করার জন্য বিচারপতি, এনজিও প্রধান, ধনবান শেঠ বা অন্য কাউকে হাজির করার প্রয়োজন নেই। তাদের হাজির করলে, গণতন্ত্র এবং রাজনীতিকদের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকে না। তাতে নানা দিক থেকে চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখা দিতে বাধ্য। রাজনীতিকদের সৃষ্ট সমস্যা রাজনীতিকরাই সমাধান করুন এটাই সব

থেকে উত্তম।[৮০] তিনি তার প্রস্তাবে বলেন, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আর বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা, দু'জনই সংকল্পবদ্ধ প্রতিপত্তির মানুষ। তাঁরা ক্ষমতাশূন্য হয়ে নির্বাচনের মাঠে নামুক। উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী, উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, এল কে সিদ্দিকি, গ্রহণযোগ্য খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, ধারাবাহিকতার জন্য অর্থমন্ত্রী পদে সাইফুর রহমান, মোহাম্মদ নাসিম, তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, জামায়াতের এডভোকেট শেখ আনসার আলী, বামফ্রন্টের রাশেদ খান মেনন– এমন ১১জনকে নিয়ে একটা রাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার গঠন করলে তাতে সংবিধানও বাঁচে। রাজনীতিকও বাঁচে। দেশও বেঁচে যায়। এঁরা দায়িত্বশীল হবেন, জাতির জন্য বড় কাজ করার একটা সুযোগ পাবেন এর মাধ্যমে নেতৃত্বের পরীক্ষাও দিতে পারবেন। ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হতে পারবেন। নানা দল মিলে একসঙ্গে কাজ করার একটা প্রক্রিয়া যে দেশে গড়ে উঠেছে, তা দেখে জনগণ ভোটদানের চাইতে বড় তৃপ্তি পাবেন।[৮১]

কমনওয়েলথ মহাসচিবের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ

নির্বাচন নিয়ে উদ্ভূত এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে কমনওয়েলথ মহাসচিব প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে অবাধ নির্বাচনের জন্য তিন দফা সুপারিশ করেন। অবশেষে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ কমনওয়েথ মহাসচিবের মধ্যস্থতায় রাজনৈতিক সংকট নিয়ে আলোচনা করতে দুই নেত্রী আনুষ্ঠানিক সম্মতি দেন। পরদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে সারা দেশে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর এক সভায় শেখ হাসিনা আন্দোলনের পাশাপাশি সংলাপে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। কিন্তু পহেলা অক্টোবর মানিক মিয়া এভিনিউর জনসভায় খালেদা জিয়া 'বিরোধী দলের দাবী অসাংবিধানিক' বলে মন্তব্য করলে আবার অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময় কমনওয়েলথ মহাসচিব এই সংলাপের মধ্যস্থতা করার জন্য স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে সাবেক অস্ট্রেলীয় গর্ভনর স্টিফেন নিনিয়ানকে মনোনীত করেন। ঐ দিনই প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নেই।' স্টিফেন নিনিয়ান ৮ই অক্টোবর সংলাপ প্রশ্নে দুই নেত্রীর কাছে বার্তা পাঠিয়ে ১৩ই অক্টোবরে ঢাকা আসেন। ৩১ই অক্টোবর নিনিয়ান সংলাপের স্বার্থে আন্দোলনের চূড়ান্ত কর্মসূচী না দেওয়ার জন্য শেখ হাসিনার প্রতি অনুরোধ জানান।[৮২] বিএনপি সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাদের প্রধানমন্ত্রীকে সরকার প্রধান হিসেবে রেখে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির এক নতুন প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাব মতে, বেগম খালেদা জিয়া সরকার প্রধান হবেন। বিলুপ্ত সংসদের সদস্যদের মধ্য থেকে ৯জন মিলে একটি মন্ত্রী পরিষদ হবে যাদের ৪জন প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করবেন আর ৫জন নিয়োগ করবেন বিরোধীদলীয় নেত্রী। এই মন্ত্রী পরিষদের কেউ নির্বাচনে প্রচারণা চালাতে পারবেন না। বিরোধী দল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে নিনিয়ান স্টিফেনের উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত বিরোধী দলের রাজপথের আন্দোলন আরও তীব্রতা লাভ করে এবং সারা দেশে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ৬ই নভেম্বর বিরোধীদলের সকল সংসদ সদস্য সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী আদায়ের আন্দোলনে তৎকালীন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের এই সিদ্ধান্ত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সিদ্ধান্ত মতে, ৮ই নভেম্বর আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা তাদের পদত্যাগপত্র দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে জমা দেন। জাতীয় পার্টির সদস্যরাও তাদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। ৯ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে বিরোধী দলের অবস্থান ধর্মঘটে ব্যাপক সংঘর্ষে প্রায় দুই শতাধিক আহত হয়। আন্দোলনের এই পর্যায়ে অন্যান্য দলও সম্পৃক্ত হয়। ১০ই নভেম্বর বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ডাকে সারা দেশে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১২ ও ১৩ই নভেম্বর বিরোধীদলীয় সদস্যদের ডাকে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ১১ই ডিসেম্বর হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন বর্জনকে অবৈধ ঘোষণা করে অবিলম্বে অধিবেশনে যোগদানের নির্দেশ দেয়। অবশ্য পরদিন সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্টের ঐ রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করে। এই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার জন্য সরকার আবেদন করলে তাও না-মঞ্জুর হয়। দিনে দিনে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেনে নিতে বেগম খালেদা জিয়া ক্রমাগত অস্বীকৃতি এবং এই কনসেপ্টের বিরুদ্ধে নানা কটূক্তি ও বিরূপ মন্তব্য বিরোধী দলগুলোকে আরও মরিয়া করে তোলে। ২২শে ডিসেম্বর বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পদত্যাগপত্র গ্রহণের জন্য স্পীকারের কাছে একটি চিঠি দেওয়া হয়। ২৪শে ডিসেম্বর সারা দেশে ৮ ঘণ্টা অবরোধ পালিত হয়। সম্মিলিত বিরোধী দল ভিন্ন-ভিন্নভাবে জনসভা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে বিএনপিকে রাজী করাতে না পারলে সংসদ থেকে পদত্যাগ করার ম্যান্ডেট জনগণের কাছ থেকে গ্রহণ করে। অবশেষে ২৮ই ডিসেম্বর স্পীকারের কক্ষে সম্মিলিত বিরোধী দলের সঙ্গে সরকারের প্রতিনিধিদের আলোচনা হয়। আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ায় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের মোট ১৪৭জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন।[৮৩] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন ছিল তাদের দাবী। এ দাবীতে ১৯৯৪ সালের প্রায় ৯ মাস ধরে আন্দোলন করেছে তারা। তারপর আলটিমেটাম অনুযায়ী পদত্যাগপত্র পেশ করা হয়। বিরোধী দলের পদত্যাগপত্র পেশের পর সংকটে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা।[৮৪]

বিরোধী দলসমূহ তাদের দাবীগুলোসহ পদত্যাগপত্র স্পীকারের কাছে জমা দেয়। এ সব দাবীগুলোর মধ্যে ছিল, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, সংসদ বাতিল এবং ৯০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন, সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি অথবা অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতিকে সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ; সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন– এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন; অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা; নির্বাচনের অব্যাহতি পরে সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ; সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে ভবিষ্যতে অন্তত আরও তিনটি নির্বাচন অনুরূপভাবে করা ইত্যাদি। দাবীতে আরও বলা হয়, এই ব্যবস্থাকে

কার্যকর করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে পুনর্গঠিত করতে হবে। ২৯শে ডিসেম্বর সারা দেশে ৮ ঘণ্টার হরতাল পালিত হয়। ১৯৯৫ সালে ২রা জানুয়ারি থেকে আবার তিন দিন হরতাল চলে। এ সময় সরকার এক নতুন কৌশলের আশ্রয় নেয়। স্পীকারকে বলা হয়, পদত্যাগের বিষয়টি প্রলম্বিত করার জন্য। তিনিও টালবাহানা শুরু করেন। ৮ই জানুয়ারি তিনি এ সব পদত্যাগপত্র যাচাই-বাছাই করতে বসেন। ২৪ ও ২৫শে জানুয়ারি আবার হরতাল পালন করা হয়। বিরোধী দলসমূহ অবিলম্বে এমপিদের পেশ করা পদত্যাগপত্রগুলো গ্রহণের দাবী জানাতে থাকে। ২৬শে জানুয়ারি শেখ হাসিনা সংসদ বিলুপ্ত করার দাবী জানান। ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জন ও পদত্যাগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি রীট পিটিশন দায়ের করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন স্পীকার পদত্যাগের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি স্থগিত রাখেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি এমপিদের পদত্যাগ প্রসঙ্গে রীট বিবেচনার জন্য হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে পহেলা মার্চ ১৯৯৫ বিরোধীদলীয় সদস্যদের সংসদ অধিবেশন বর্জনের এক বছর পূর্তি হয়। এ সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী আদায়ে চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরোধী দলের ডাকে একের পর এক হরতাল এবং একই সাথে অবরোধও পালিত হতে থাকে। সরকার ও বিরোধীপক্ষ দুই মেরুতে চূড়ান্ত অবস্থান নেওয়ায় সংকট থেকে উত্তরণের কোনো উদ্যোগই কার্যকর হচ্ছিল না। জুলাই মাসে দেশে বন্যা পরিস্থিতি মারাত্মক অবনতি ঘটে। ফলে জুলাই-আগস্ট দু'মাস আন্দোলন কার্যত কিছুটা স্থিমিত হয়ে পড়ে। ২রা সেপ্টেম্বর থেকে ৩২ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল শুরু হলে আন্দোলন পরিস্থিতি আবার চাঙ্গা হতে শুরু করে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সেক্রেটারী রবির র‍্যাফেল ঢাকায় আসেন। তিনি দু'পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় না। এ অবস্থায় ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় ৭২ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল। ৭ই অক্টোবর থেকে শুরু হয় তিনদিনের ধর্মঘট। আবার ১৬ই অক্টোবর থেকে শুরু হয় ৯৬ ঘণ্টার হরতাল। এ হরতাল পালনকালে গুলিতে দু'জন নিহত হয়। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকে। ১১ই নভেম্বর থেকে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত পালিত হয় ৬ দিনব্যাপী হরতাল। ৯ই ডিসেম্বর থেকে আবার ৭২ ঘণ্টার হরতাল শুরু হয়। এইভাবে একের পর এক কর্মসূচী বিরোধী দলীয় জোট পালন করতে থাকে। কিন্তু সরকারী দল কোনো দিকেই ভ্রুক্ষেপ করে নি ফলে দেশ এক অনিশয়তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

সে সময় বিভিন্ন আইনের মারপ্যাঁচে বিরোধী দলের আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য রাষ্ট্রপতি ১৪৭জন বিরোধীদলীয় সদস্যের ওয়াকআউট, সংসদ অধিবেশন বর্জন ও অনুপস্থিতির কারণে সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্জনকারী সদস্যদের সংসদ সদস্যপদ শুন্য হয় কি না, এই মর্মে সুপ্রীম কোর্টের মতামত জানতে চান। সুপ্রীম কোর্ট ৬৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ বর্জনকে 'অনুপস্থিতি' হিসেবে গণ্য হবে বলে একটি পরামর্শমূলক রায় প্রদান করে। উল্লেখ্য, ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকলে সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। অতঃপর সংসদ সচিবালয়ের এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৯৫ সালের জুন মাসের ২০ তারিখ থেকে সংসদ বর্জনকারী বিরোধীদলীয় সদস্যদের

আসনগুলো শূন্য বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিন অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান করার প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। তবে বন্যাজনিত কারণে ওই সময় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয় বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয় এবং এ নির্বাচনের সময়সীমা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বিরোধী দল এই উপ-নির্বাচন প্রতিহত করার সংকল্প ঘোষণা করে। এই প্রহসনমূলক উপ-নির্বাচনের খেলা বন্ধ করে অবিলম্বে সংসদ বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবী জানায়। অবশ্য উপ-নির্বাচন জনগণের তীব্র প্রতিরোধের মুখে অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। এদিকে পঞ্চম জাতীয় সংসদের পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হয়ে আসার কারণে নতুন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়। সরকার এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে।

সকল দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটা সমঝোতা উদ্যোগ পহেলা জানুয়ারি ১৯৯৬ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর ৪ঠা জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত নেতাদের এক বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী না মানায় ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের অধীনে ঘোষিত ১৫ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সময় সরকারকে নির্বাচন অনুষ্ঠান থেকে বিরত রাখতে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষিত হতে থাকে। ৭ই জানুয়ারি থেকে শুরু হয় ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল, ৯ই জানুয়ারি আবার ৩৫ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল ডাকা হয়। এর মধ্যেও ক্ষমতাসীন বিএনপির প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করে। সরকার বিরোধী দলহীনও নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে অটল থাকে। এ সময় তিনদলের বৈঠকে ২৩শে জানুয়ারির মধ্যে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সে অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে ১৪১জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। সে সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ঢাকার বাইরে সফরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হতে থাকে। ২৪শে জানুয়ারি তার সিলেট সফরের প্রতিবাদে সেখানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ২৫শে জানুয়ারি প্রতিবাদের মুখে তিনি তার খুলনা সফর বাতিল করে দেন। পরবর্তী তিন দিন খুলনা-বাগেরহাটে হরতাল পালিত হয়। পহেলা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর বই মেলা উদ্বোধন করতে গেলে তারও প্রতিবাদ করা হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রতিবাদে ফেনীতে হরতাল পালিত হয়। পরদিন সেখানে তার তিনটি সভা পণ্ড হয়ে যায়। ঐ দিন এবং তার পর দিন ৮ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এ সময় আন্দোলন পরিস্থিতি এমন তুঙ্গে থাকে যে, সচিবালয়ে সভা করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোনোরূপ নির্বাচনী দায়িত্ব পালন না করার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারী কর্মচারীরা সচিবালয়ের অভ্যন্তরে মিছিল সমাবেশ করতে থাকে। নীলনক্সার নির্বাচন ঠেকাতে ১৩ই ফেব্রুয়ারি সর্বাত্মক অবরোধে সারা দেশ অচল হয়ে পড়ে। হরতালে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। সহিংসতার আগুন জ্বলে ওঠে দাউদাউ করে। ছিনতাই হয় ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার। এ অবস্থার মধ্যে পরদিন ১৫ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বিরোধী দলহীন সংসদ নির্বাচন। সে দিন ছিল বিরোধী দল ঘোষিত দেশব্যাপী

'গণকারফিউ'।[৮৫] ১৫ই ফেব্রুয়ারি নগণ্যসংখ্যক ভোটারের উপস্থিতিতে ২৫০টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হয়। এর অধিকাংশ এলাকায় বিরোধী দলের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষ ঘটে। ইতঃপূর্বে ৪৮টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপক আন্দোলনের মুখে বাকী ২টি আসনে নির্বাচন করা সম্ভব হয় নি। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিএনপিই বলতে গেলে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল। বাকী নামসর্বস্ব সরকারী মদদপুষ্ট ৪২টি দলের ৯৯৩জন প্রার্থী এবং ৪৫৭জন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন বলে দেখানো হয়। সরকারী দল ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। একদলীয় নির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীর ব্যাপারে বিরোধী দল কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। তারা সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মাক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে।[৮৬] সংবাদপত্রের সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনে মাত্র পাঁচ থেকে দশ ভাগ ভোটার উপস্থিতির কারণে সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা দারুণভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তা ছাড়া ব্যাপক ভোট কারচুপি এবং অন্যান্য অসদাচরণের অভিযোগও ওঠে। এভাবে ষষ্ঠ সংসদীয় নির্বাচন বিতর্কিত হয়ে যায়। দেশী এবং বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকগোষ্ঠীও এ নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিএনপিকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী আসন লাভ করে। ফ্রিডম পার্টি একটি আসন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ দশটি সংসদীয় আসন লাভ করে।[৮৭] সারা দেশে ব্যাপক সহিংসতায় নিহত ১২জন, আহত সহস্রাধিক, ভোটারবিহীন একদলীয় নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ওই নির্বাচনে ৪ সহস্রাধিক কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয় নি। সারা দেশে গণকারফিউ পালিত হয়। অধিকাংশ কেন্দ্রে সরকারী দল নিজেরাই সিল মেরেছে।[৮৮] নির্বাচনের পর থেকেই বিএনপি নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড় শুরু করে দেয়। ওদিকে শেখ হাসিনা অবৈধ সে সরকারকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক দেশ ও দাতাগোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জানান।[৮৯] ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিবেদনে দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার শিরোনাম হল, বাংলাদেশীরা এই নির্বাচন থেকে দূরে ছিলেন। দ্য ডেইলী টেলিগ্রাফ বলা হয়, খুনোখুনি এবং ভোটদাতাদের সীমিত সংখ্যার ফলে খালেদা জিয়ার নির্বাচনী বিজয় ক্ষুণ্ন হয়েছে।[৯০]

আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলো ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। একদলীয় প্রহসনমূলক নির্বাচন বাতিল, বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং অবিলম্বে 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ (রব) ও জামায়াত ২৪ থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী এ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়।[৯১] ২৪শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তী কালে অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকে। এ আন্দোলনের চারদিনের মাথায় সারা দেশ অচল হয়ে পড়ে। ৫ই মার্চ ১৯৯৬ রাজধানীতে পালিত হয় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। শুরু হয় দেশব্যাপী পরিবহন ধর্মঘট। এ সব কর্মসূচীতে সরকার কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে ৯০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানায়। একই সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত সব ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বেগম জিয়া বলেন, 'ভবিষ্যতে বিরোধী দলের দাবী অনুযায়ী সব নির্বাচনের সময় নির্দলীয়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ যথাশীঘ্র সংবিধান সংশোধনের বিল পাস করে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। এরপর ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।'[৯২] বিরোধী দল বেগম জিয়ার এই প্রস্তাবকে প্রতারণমূলক, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনকে বৈধতাদানের অপকৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করে। বিরোধী দল অবিলম্বে ১৫ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিল, বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণার দাবী জানায়। এই লক্ষ্যে কেবল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকে বসতে বিরোধী দল সম্মত আছে বলে জানায়। বলা হয়, বেগম জিয়ার তখনকার সরকার অবৈধ। সে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।[৯৩]

আন্দোলনের এই পর্যায়ে ১০ই মার্চ ১৯৯৬ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ এবং মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বৈঠক করেন। কয়েকটি ক্ষুদ্র দলের নেতৃবৃন্দও পৃথকভাবে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন। প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলো ১৫ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিল, বেগম জিয়ার পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মে মাসের মধ্যে নতুন সংসদ নির্বাচনের দাবী জানায়। এদিকে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি নেতৃবৃন্দও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী মেনে নিয়ে বলা হয়, এ জন্য সংসদে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। তবে মধ্য ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিল এবং প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী সরকারী দল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। বিরোধী দলসমূহের আহ্বানে ৯ই মার্চ ১৯৯৬ থেকে ঢাকাসহ দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সরকারের পদত্যাগ, প্রহসনের নির্বাচন বাতিল এবং অবিলম্বে নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের দাবীতে এই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।[৯৪] রাষ্ট্রপতি বিগত পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিরোধী দলগুলোর কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা জানতে চেয়ে পত্র লেখেন। বিরোধী দল ১৩ই মার্চ তার জবাব দিলে রাষ্ট্রপতি ১৫ই মার্চ এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হলে সংবিধান সংশোধন ও দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। এই বিবৃতিতে তিনি অসহযোগ কর্মসূচী প্রত্যাহার করে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতির এই বিবৃতিকে বিরোধী দলগুলো বিএনপির দলীয় স্বার্থে জনমতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন হিসেবে অভিহিত করে। এই পটভূমিকায় বিরোধী দলের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৯৬-এর ১৯ই মার্চ, ১৫ই ফেব্রুয়ারির তথাকথিত নির্বাচনের সংসদের অধিবেশন বসে। একই দিনে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়।[৯৫] ক্ষমতাসীন সরকার বেসামরিক প্রশাসনকে চালাতে ব্যর্থ হয় ও জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে। ১৫ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন যেমন ছিল বিরোধী দল বিহীন, তেমনি এতই কম ভোট পেয়েছিল এবং সেই সঙ্গে এমন মাত্রায় জালিয়াতি হয়েছিল যে তার বৈধতা হয়ে পড়ে প্রশ্নের সম্মুখীন।[৯৬] বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলগুলোকে আবারও

আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই নির্দলীয় সরকারের বিল উত্থাপন করা হবে এবং তা পাস করা হবে। সাংবিধানিক প্রয়োজনে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং সবার সাথে আলোচনা করে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখও ঠিক করা হবে।[৯৭]

সচিবলায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আন্দোলন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংবিধান সংশোধন

সদ্য নিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ্ আমান সচিবালয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে এক ঝামেলা বাধালে সকল কর্মচারী তার বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে যায়। সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন তখনও অব্যাহত ছিল। বিরোধী দলসমূহের আহ্বানে ৯ই মার্চ ১৯৯৬ থেকে ঢাকাসহ দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।[৯৮] প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া ১৯শে মার্চ শপথ গ্রহণ করেন।[৯৯] এই আন্দোলনের ত্রয়োদশ দিনে ২১শে মার্চ সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল উত্থাপন করতে বিএনপি বাধ্য হয়। আমান ইস্যুকে কেন্দ্র করে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করতে থাকে। এ অবস্থায় ২২শে মার্চ সচিবালয়ে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেও সরকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। এ সময় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে 'জনতার মঞ্চ', জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটের সামনে 'গণতন্ত্র মঞ্চ' এবং জামায়াতের উদ্যোগে উত্তর গেটে 'কেয়ার টেকার মঞ্চ' গঠন করে অবিরাম বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলতে থাকে। আওয়ামী লীগের জনতার মঞ্চে এক পর্যায়ে সচিবালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের অনেকেই যোগদান করেন। সরকার এ মঞ্চ একবার পুলিশ দিয়ে বন্ধ করে দিলেও ২৪শে মার্চ তা পুনরুদ্ধার করা হয়। ঘোষণা করা হয়, খালেদা সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত এ মঞ্চের কার্যক্রম চলবে।[১০০] বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলগুলোকে আবারও আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই নির্দলীয় সরকারের বিল উত্থাপন করা হবে এবং তা পাস করা হবে। সাংবিধানিক প্রয়োজনে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং সবার সাথে আলোচনা করে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখও ঠিক করা হবে।[১০১] এদিকে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পতনোন্মুখ বিএনপি সরকার নিজ দলীয় কর্মীদের মনোবল ধরে রাখার লক্ষ্যে নয়া পল্টনস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে একটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে তারাও গান-বাজনার আসর জমায়।[১০২] জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল উত্থাপিত হয়। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে সংসদে বহুল প্রত্যাশিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস হয়।[১০৩] এভাবে শাসক দল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিনব সংসদীয় ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কায়েমের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ স্বল্পস্থায়ী এবং সংসদের প্রথম অধিবেশনই ক্ষমতাসীন দল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্বলিত সাংবিধানিক বিধি প্রণয়নে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল উত্থাপন করে। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের মাত্র চার দিন স্থায়ী কার্যদিবসে ২৬শে মার্চ ১৯৯৬ তারিখে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলটি ২৬৮-০ ভোটে নির্বিঘ্নে পাস হয়ে যায়। এ সংশোধনীর আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের মধ্য দিয়ে সংবিধানে ৫৮ (বি), (সি), (ডি), ও (ই) ধারা সংযোজিত হয় এবং ভবিষ্যতের সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু হয়।

বিএনপি সরকারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গ্রহণকে বিরোধী দল তাদের আন্দোলনের অর্জন হিসেবে অবিহিত করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা গভীরতর হয় এবং সার্বিক পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।[১০৪] সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনী পাস হওয়ার পরও পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত সব বিরোধী দল অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে। সরকার এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সমগ্র দেশে সরকারী কর্মচারীরা সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে এবং সরকারের ৩৫জন সচিব রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পরামর্শ দিয়ে ওই পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন।[১০৫] ক্রমবর্ধমান সঙ্কট এবং বিরোধী দলের ব্যাপকধর্মী আন্দোলন ও কঠোর চাপের প্রেক্ষাপটে শাসক দল ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং ৩০শে মার্চ ১৯৯৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়।[১০৬] ৩০শে মার্চ সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরামর্শে ১০ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। ফলে বিরোধী দল তাদের অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে এবং দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসতে থাকে।[১০৭]

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর মানুষ আশা করেছিল বহুদিন পর একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কের অবসান হবে। ১৯৯১-এর নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করলেও যেহেতু সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছিল রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষ তা মেনে নেয়। কিন্তু এই নির্বাচনে জয় লাভের পর বিএনপি রাজনীতিতে জিয়াকে অর্থাৎ পাকিস্তানী ধারা ব্যবহার করে এবং এ ছাড়া সব পক্ষই রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করে। ফলে ধর্মের ব্যবহার রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে শুরু হয়। লক্ষণীয় কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী আইন করা হবে না বলে– বিএনপি, আওয়ামী লীগ সব দলই এমন ওয়াদা করে। এইভাবে ধর্মের ব্যবহার তারা রাজনীতিতে নিয়ে আসে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ নির্বাচন কমিশনকে শক্ত করতে চেয়েছিল যাতে জনগণের আস্থা ফিরে আসে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি নির্বাচন কমিশনের উপর নির্বাচিত সরকার প্রভাব বিস্তার করে। তা শুধু নির্বাচনকেই নয়; নির্বাচন কমিশনকেও বিতর্কিত করে। খালেদা জিয়া সরকারের সময়ের উপ-নির্বাচনগুলো এরশাদের সময়কে মনে করিয়ে দেয়। সেই কারণে বিএনপি আমলের শেষের দিকে নির্বাচন নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয় এবং বিএনপি সরকারই তার সূচনা করে। যার কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিবর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়, যারা তিনমাসের জন্য সরকার পরিচালনা করবেন। কিন্তু এই প্রশ্ন কেউ করে নি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য যারা হবেন তারাও সবাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক, যার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয় রাজনীতিবিদগণ তাদের নিজেদের প্রতি আস্থা না রেখে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপর আস্থা রাখেন– যা গণতন্ত্রের বিপরীত। নির্বাচন নিয়ে এই বিতর্কের পরেও ঐ নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন সফলভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯১-এর বিএনপি সরকারের সময় সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যা ইতিবাচক দিক। সংসদ গণতন্ত্রের প্রাণ-কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে একটা সংসদ প্রতিষ্ঠা হয়, যার প্রধান হয় প্রধানমন্ত্রী যা সংসদীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করে এটা প্রমাণিত হয় পাকিস্তান আমলে গণতন্ত্রের যে অভিনব নমুনা সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে রাজনৈতিক নেতারা বেরিয়ে আসতে পারে নি। এই নির্বাচনে আর একটি বিষয় তুলে ধরে তা হল রাজনীতি কালোটাকার ব্যবহার এবং কালোটাকার অধিকারী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য। পাকিস্তান আমলে নির্বাচনে কালোটাকার ব্যবহার দেখা যায় নি। তবে রাজনীতিতে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রাধান্য ছিল। বাংলাদেশে জিয়ার সময় রাজনীতিতে কালোটাকার ব্যবহার ও ব্যবসায়ীদের অংশ গ্রহণ শুরু হয়, এরশাদের সময় তার চরম আকার ধারণ করে। আমরা দেখি **১৯৯১** সালের নির্বাচনে তা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পায়। এই নির্বাচনে বিজয়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ী ছিলেন ৩৮.৬৭%। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে কালোটাকার ব্যবহার রুদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। কেননা রাজনীতি তখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে ব্যবসায়ীদের। এটি গণতন্ত্রের জন্য নেতিবাচক দিক।

তথ্যপঞ্জি

[১] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৯, পৃ. ১০৩

[২] C. Baxter, Bangladesh: *A Parliamentary Democracy, If they can keep it,* Current History, March 1992, p. 133

[৩] তারিক হোসেন খান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৫৯

[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয় বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, [সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত] অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ৪৩

[৫] ecs.gov.bd/English/index.php

[৬] মো. কামাল উদ্দিন, *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, শৈলী প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১০, পৃ. ১৮০

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

[৮] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯ পৃ. ৮৭

[৯] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৩৬

[১০] আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার **১৯৯১**

[১১] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৩৬

[১২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯শে জানুয়ারি **১৯৯১**

[১৩] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৩৬-৩৭

[১৪] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৮৭

[১৫] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৩৭

[১৬]যেহেতু রংপুরের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত (বাংলাদেশেরও) সেহেতু এই 'কৃতী সন্তান'রা বোঝাতে পেরেছেন যে বাংলাদেশের কী হল কী না হল তাতে কিছু আসে-যায় না। রংপুরের কী হল তাতেই আসে যায়। এবং এরশাদ না থাকলে কে রংপুরে করবে চিড়িয়খানা? বা পাকা রাস্তা? আর একটি কারণও স্মর্তব্য। ওই বারের গণজাগরণ বড় শহর ছাড়িয়ে গ্রামে গঞ্জে বা মফস্বলে যায় নি। ফলে, গণজাগরণের উষ্ণতা ও আবেগ তাদের স্পর্শ করে নি। 'কৃতী' সন্তানের সহযোগী তাদের ও তাদের ওস্তাদের টাকা দু'হাতে ওড়াচ্ছেন এবং আঞ্চলিকতার ধুয়া তুলছেন। ভোলায় নাজিউর রহমানও এমনটি করেছেন।
বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮), পৃ. ৭৩

[১৭] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৭২-৭৩

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

[১৯] *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, পৃ. ৪১-৪৩

[২০] *সংবাদ*, ১০ই জানুয়ারি **১৯৯১**

[২১] *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, পৃ. ৪১-৪৩

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

[২৩] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৯০

[২৪] ভোট দেওয়া নিয়ে শঙ্কা ছিল। জনগণ, জনসভায় যায় বটে কিন্তু তখনো তারা দ্বিধান্বিত। সেনাসমর্থিত এরশাদ সরকার নির্বাচনী প্রক্রিয়া এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যে মানুষ তখনও ভীত। তবে সরকারের কিছু ব্যবস্থাবলী খানিকটা ভরসা এনে দেয়। গ্রামাঞ্চলে ভোটারা ভোট দিতে সবাই উৎসুক। প্রচুর সংখ্যায় ভোটারের উপস্থিতি মাস্তানী হ্রাসে সহায়তা করবে। কিন্তু মাস্তানী হয় অন্য রকমভাবে। ওই নির্বাচনে জাতীয়

পার্টির প্রার্থীরা প্রচুর টাকা ছড়ায়। ভোটাররা নির্দ্বিধায় টাকা গ্রহণও করে। কিন্তু ভোট কাকে দেবেন তা অবশ্য ভোটার নিজেই জানেন। তবে, জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের প্রকাশ্যে তেমন দেখা যায় নি। সংখ্যালঘু এলাকায় জাতীয় পার্টি এবং জামায়াত তাদের হুমকি প্রদান করে। নিবেদিত প্রাণ নেতার-কর্মীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় প্রতিটি প্রার্থীকেই প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয়। ফলে নির্বাচনের পুরো প্রেক্ষাপটই বদলে গেছে। অথচ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে তো আমরা এই প্রেক্ষাপটই বদলাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা যে পারিনি এর প্রমাণ প্রাক-নির্বাচনী অবস্থা এবং এর জন্য গত সরকারকে দায়ী করতে পারি বটে, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো যে দোষী নই তাও বা বলি কি করে?

বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮), পৃ. ৯০

[২৫] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৯০-৯১

[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

[২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

[২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯৩

[২৯] *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, পৃ. ৮২

[৩০] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৮৭

[৩১] *নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন*, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা

[৩২] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৯৪

[৩৩] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩৭

[৩৪] *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, পৃ. ৮৮

[৩৫] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৯৪

[৩৬] *সংবাদ*, ১লা মার্চ ১৯৯১

[৩৭] *প্রাগুক্ত*

[৩৮] *প্রাগুক্ত*

[৩৯] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩৭

[৪০] *সংবাদ*, ২রা মার্চ ১৯৯১

[৪১] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩৭-৩৮

[৪২] *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৬২

[৪৩] Moudud Ahmed, *Bangladesh A Study of the Democratic Regimes*, UPL, Dhaka, 2012, p. 33

[৪৪] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৯৪

[৪৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-৯৭

[৪৬] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৩৮

[৪৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

[৪৮] Abul Fazl Haq, The Ninth Parliament Election : A Socio-Political analysis, 2009

[৪৯] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ১১০-১১১

[৫০] ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্টের সচিবালয় থেকে তৎকালীন কেবিনেট সচিব মাহবুব জামান [সূত্র সিডি-১০/১/৮৫ রুলস/৩৬১] এই 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' জারী করেন যা এখনও বর্তমান। এটা স্পষ্ট যে, এই 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সামরিক কর্মকর্তারা। যদি

তাই না হতো তাহলে পার্লামেন্টের সদস্যদের স্থান হতো ৭ নম্বরে। ১৩ নম্বরে থাকত সচিব ও শাসনতান্ত্রিক প্রশাসনিকপদ।*১ কিন্তু 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স'-এর ১৩. ক্যাবিনেট সচিব, সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধান ও সরকারের মুখ্য সচিব এবং ১৪.পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত একজন সদস্যের স্থান হবে তিনজন সেনা কর্মকর্তা ও দুজন অসামরিক আমলার নিচে। *২

*১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

*২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[৫১] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, পৃ. ৩৫

[৫২] এমাজউদ্দিন আহমদ, *সমাজ ও রাজনীতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ১৯৯০ পৃ. ১৪

[৫৩] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, পৃ. ৩৮-৩৯

[৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪২

[৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

[৫৬] মোঃ এখলাছুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র : একটি বিশ্লেষণ*, (এম.ফিল অভিসন্দর্ভ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০

[৫৭] http:// data worldbank.org/indicator/NY.GDP.MK…

[৫৮] *প্রাগুক্ত*

[৫৯] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, পৃ. ৮৬

[৬০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩-৮৪

[৬১] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ১২৪-১২৫

[৬২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

[৬৩] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, পৃ. ৩৮

[৬৪] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রক্রিয়া ও ঐকমত্যের উপাদান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২১-২৩

[৬৫] *সংবাদ*, ২৫শে জানুয়ারি ১৯৯৩

[৬৬] *নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট*, বাংলাদেশ

[৬৭] *সংবাদ*, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

[৬৮] *প্রাগুক্ত*, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

[৬৯] *প্রাগুক্ত*, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

[৭০] মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিনকাল*, ঢাকা : হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ২০০১, পৃ. ২৮৬

[৭১] তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : সূচনা ও বিকাশ এবং* ভবিষ্যৎ, কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩-৪

[৭২] *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : সূচনা ও বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[৭৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

[৭৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

[৭৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

[৭৬] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৮৮-৮৯

[৭৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯-২৯০

[৭৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০

[৭৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০

Dhaka University Institutional Repository

[৮০] তালুকদার মনিরুজ্জামান, *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ*, শুভ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯
[৮১] *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ*, পৃ. ৯
[৮২] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ২৯০-২৯১
[৮৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯১-২৯২
[৮৪] *আজকের কাগজ*, ১লা জানুয়ারি ১৯৯৬
[৮৫] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ২৯২-২৯৫
[৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬
[৮৭] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, পৃ. ৪৩
[৮৮] *আজকের কাগজ*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
[৮৯] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ২৯৬
[৯০] *আজকের কাগজ*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
[৯১] *প্রাগুক্ত*
[৯২] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ২৯৬-২৯৭
[৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭
[৯৪] *দৈনিক ইনকিলাব*, ৯ই মার্চ ১৯৯৬
[৯৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭
[৯৬] *আজকের কাগজ*, ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
[৯৭] *দৈনিক ইনকিলাব*, ৭ই মার্চ ১৯৯৬
[৯৮] *দৈনিক ইনকিলাব*, ৯ই মার্চ ১৯৯৬
[৯৯] *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০শে মার্চ ১৯৯৬
[১০০] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ২৯৭-২৯৮
[১০১] *দৈনিক ইনকিলাব*, ৭ই মার্চ ১৯৯৬
[১০২] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ২৯৮
[১০৩] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ২৯৮
[১০৪] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, পৃ. ৪৩
[১০৫] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ২৯৮
[১০৬] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, পৃ. ৪৩
[১০৭] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ২৯৮

চতুর্থ অধ্যায়

১৯৯৬ সালের নির্বাচন এবং শেখ হাসিনার সময়কালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া

দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে খালেদা জিয়ার সরকার পদত্যাগ করলে জনগণ আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে, অনেকটা পাঁচ বছর আগে এরশাদ সরকারের পতনের পর যেমনটা হয়েছিল। প্রেসক্লাবের সামনে, বায়তুল মোকাররমের সামনে, বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত মঞ্চে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে বিজয় উৎসবের অনুষ্ঠান চলতে থাকে।[১] রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিএনপি সরকারের প্রস্থানের পর চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটে এবং নতুন সংশোধিত সংবিধান অনুসারে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশে দ্বিতীয়[২] তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়।[৩] সংবিধান সম্মত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুসহ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৪] সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৩০শে মার্চ ১৯৯৬ ক্ষমতা গ্রহণের পরদিন ৩১শে মার্চ প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দেন। তিনি সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জানান, সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে তিনি দৃঢ় থাকবেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি পিছপা হবেন না। তার ভাষণে জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরে আসে। ক্ষমতা গ্রহণের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ১লা এপ্রিল ১৯৯৬ থেকেই শুরু করেন সারা দেশে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান। রাজনৈতিক নেতা, দাগী সন্ত্রাসীদের হুমকি সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ কার্যক্রম পুরোপুরি সফল না হলেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হল দখল, বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা, অপহরণ অনেকটা কমে গিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই সব কার্যক্রমের ফলে জনগণের মনে আস্থা ফিরে আসে। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৃঢ়তার সাথে একটি সেনা অভ্যুত্থানও দমন করেছিলেন। তৎকালীন সেনা প্রধান জেনারেল নাসিম ব্যর্থ ক্যুর চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় সাহসীকতার সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান টেলিভিশন ভাষণে সেনা সদস্যদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও কিছু দায়িত্বশীল সেনা কর্মকর্তার কৃতিত্বে সেনাপ্রধানের সে অভ্যুত্থান দমন করা সম্ভব হয়েছিল। যা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সরকার সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন

১৯৯১ সাল থেকে প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারই নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এরশাদ সরকারের পতনের সময় তিনজোটের যৌথ ঘোষণানুযায়ী সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন এবং এর কার্যবলী পুনর্বিন্যাস করেন। একইভাবে **১৯৯৬** সালে বিএনপি সরকারের পতনের পর প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবী করে।[৫] **১৫ই** ফেব্রুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচন কমিশন ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বিতর্কিত হয়ে পড়েছিল। স্বাধীন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন সে সময় জনগণের আস্থা হারায়। অভিযোগ উঠেছিল প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ. কে. এম. সাদেকের নিরপেক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়েও। এ প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি চ্যালেঞ্জ ছিল নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন। কিন্তু তা সরকারের ইচ্ছাধীন বিষয় ছিল না। কেননা নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিছু অভ্যন্তরীণ ম্যাকানিজম ও জনমত দ্বারা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পান মোহাম্মদ আবু হেনা। এর ফলে জনমনে নির্বাচন কমিশন নিয়ে আস্থার সঙ্কট দূর হয়। বিচারপতি এ. কে. এম. সাদেককে ৬ই এপ্রিল **১৯৯৬**-এ তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আবিদুর রহমান এবং মোস্তাক আহমেদ চৌধুরীকে **১৬ই** এপ্রিল **১৯৯৬**-এ নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৬] নির্বাচন কমিশনার আবু হেনার পূর্ব পর্যন্ত, প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রায় ক্ষেত্রেই ছিলেন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতিগণ। মানুষের ধারণা ছিল, তাঁরা রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে, সুতরাং নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। সে ধারণা প্রায় ক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত হয়।[৭] নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করে **১২ই** জুন **১৯৯৬**-এ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়।[৮] বিরাজমান উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের বিকল্প ছিল না। **১৫ই** ফেব্রুয়ারির একদলীয় প্রহসনের নির্বাচনের কারণে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই **১২ই** জুনের সাধারণ নির্বাচন অবশ্যম্ভাবি হয়ে ওঠে। উপরন্তু গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ নির্বাচন। নির্বাচনের মাধ্যমে জনমতের প্রতিফলন হয়। জনগণের নির্বাচিত দল ক্ষমতারোহণ করে, এটা গণতান্ত্রিক রীতিসিদ্ধ। সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে, নির্বাচন ও গণতন্ত্র কারণ এবং ফল (Cause and effect) সম্পর্কের বৃত্তে আবদ্ধ এবং একই কারণে, সঙ্কটাপন্ন ও গণতন্ত্রের এই অনিশ্চিত সময়ে **১২ই** জুনের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ; যা দেশের ভিতর ও বাইরে স্বীকৃত হয়েছে।[৯] নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ঊর্ধ্বতন আমলাদের দায়িত্ব বণ্টন, বিভাগ, জেলা এবং উপজেলায় বদলিকরণ, ভোটার তালিকার হালনাগাদকরণ, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীতে পরিবর্তন সাধন এবং সর্বদল গ্রাহ্য আচরণবিধি প্রণয়ন করে। ফলে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন যথা সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।[১০]

নির্বাচনী প্রচারণা ও ইশতেহার

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ ২১ দফা সম্বলিত একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী ঘোষণা করে। এতে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ এবং সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সংক্ষেপে, জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার।[১১] ১৯৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দু'টি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। এক. সিভিল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃষ্টি ও ভিত্তি দৃঢ় করা, দুই. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। এ ধারণা আওয়ামী লীগ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সিভিল সমাজ দৃঢ়করণ পরস্পরের সম্পূরক।[১২] ইশতেহার পাঠের শুরুতেই দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন হতে বাংলার শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা বিমোচনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। বাংলা ও বাঙ্গালীর সকল সংগ্রামের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা। ১৯৪৮ ও ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর নির্বাচন, ১৯৫৮-এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-তে স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং সকল আন্দোলনের মিলন মোহনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পালন করেছে এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা।[১৩]

ইশতেহার পাঠের সময় তিনি বিএনপি সরকারের পাঁচ বছরের ব্যর্থতাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যে সরকার দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল জাতির দুর্ভাগ্য অচিরেই সেই সরকার এক স্বৈরাচারী সরকারে পরিণত হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে বিএনপি সরকার দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে সমগ্র দেশকে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দলীয়করণ, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানি ইত্যাদি অপকর্মে দেশ ছেয়ে যায়। ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিএনপি এক ভোটার বিহীন নির্বাচনের আয়োজন করে। এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় ১২৪জন নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। পাঁচ বছরে বিএনপি সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, দলীয়করণ, অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও দুঃশাসনের ফলে দেশের অর্থনীতি, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে পতিত হয়। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম্যে জনজীবন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে উঠে দুঃসহ ও বিপর্যস্ত। বিনিয়োগকারীরা নিরুদ্যম ও হতাশ হয়ে পড়ে। বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। সারের দাবীতে কৃষকরা আন্দোলন করলে বিএনপি সরকার ১৮জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করে।[14] শেখ হাসিনা আরও বলেন, বিএনপি আমলের দুঃশাসন থেকে দেশকে রক্ষা করে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের এই দলীয় ইশতেহার– আওয়ামী লীগ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার গঠন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন ও কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ওয়াদা করে।

শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রণোদনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সরকারী প্রচার মাধ্যম, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। শিক্ষা ও সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের করা এবং কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার ওয়াদা আওয়ামী লীগ তার ইশতেহারে প্রদান করে।[১৫]

অপরদিকে, বিএনপিও একটি নির্বাচনী কর্মসূচী ঘোষণা করে। তবে বিএনপি দেশের অর্থনীতি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর বিরোধী দলের দীর্ঘ আন্দোলনের বিরূপ প্রভাবের বিষয়টি তার নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে। অন্যদিকে, বিগত দিনের নিজ রাজনৈতিক অবস্থান ও ভূমিকাকে বিএনপি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার নামে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে সচেষ্ট হয়।[১৬] এ ছাড়া, বিএনপি আওয়ামী লীগকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে যে ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ পরিণত হবে 'সামন্ত রাজ্য' হিসেবে এবং ইসলাম ধর্ম হবে 'বিপন্ন'। ভারতে মৌলবাদের ক্ষণিক সাফল্য দেখে হয়ত বিএনপি এই কৌশল প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু এ কৌশল সফল হয় নি।[১৭] এ ছাড়া বিএনপি দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষিতে ভর্তুকী, কর্মসংস্থান, বেকার সমস্যার সমাধান, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ওয়াদা করে। বিএনপি বয়স্কদের জন্য প্রবীণ ভাতা প্রদানের ওয়াদা করে।

একমাত্র বামফ্রন্টই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে মেনিফেস্টো রচনা করে। বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে '৭২-এর সংবিধানের বর্তমান অগণতান্ত্রিক রূপ তারও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা বামফ্রন্ট বলে।

বড় দলগুলোর নির্বাচনী মেনিফেস্টো বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, অবাস্তবায়নযোগ্য অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন বিএনপির প্রতিশ্রুতি ছিল তারা নির্বাচিত হলে প্রবীণ ভাতা চালু করবে। প্রায় ৬০ লাখ স্বীকৃত প্রবীণের এ দেশে বছরে ভাতা দিতে প্রয়োজন অন্যূন ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। কিন্তু এই অর্থের যোগান কীভাবে হবে তা বলা হয় নি। দ্বিতীয়ত, একমাত্র বামফ্রন্ট ছাড়া আর কোনো দলই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে মেনিফেস্টো রচনা করে নি। এমনকি বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে '৭২-এর সংবিধানের বর্তমান অগণতান্ত্রিক রূপ তারও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা বামফ্রন্ট ছাড়া আর কেউ বলে নি। তৃতীয়ত, বড় দু'টো দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল কে কত বেশী ইসলাম পছন্দ করে আর কে কত বেশী ভারত বিদ্বেষী তা নিয়ে। চতুর্থত, ধর্মীয় আবেদনের ব্যাপক ব্যবহার। বিএনপি জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মীয় অনুভূতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দর্শন ও কৌশল নির্ধারণ করেছে। তবে ১২ই জুনের নির্বাচনের সময় দলটির ধর্মের ব্যবহার অতীতের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছিল। যেমন বিএনপির অলি আহমেদ মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চট্টগ্রামে এক জনসভায় বলেন, যারা বিএনপিকে সমর্থন করবে না তাদের 'ঈমান নষ্ট' হবে, 'আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী' থাকতে হবে। নির্বাচনের পর তাহলে বলা যায় যে, বাংলাদেশে 'নষ্ট ঈমানের'

মুসলমানের সংখ্যাই বেশী! কারণ অধিকাংশ মুসলমান অলি আহমেদের নসিহত উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার ধারক হিসেবে বিবেচিত আওয়ামী লীগের প্রচারণাতেও ধর্মের উপাদান ছিল। অবশ্য ১৯৯৬-এর নির্বাচনে দলটি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে নি বরং প্রচারপত্রের ওপর দৃশ্যমান ছিল 'আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান' কথাগুলো। তাদের স্লোগান ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ'। নির্বাচনের কিছু আগে হজ্বের ব্যাপারটি ঘটে যাওয়ায় শেখ হাসিনা হজ্বের পোশাকেই নির্বাচনী প্রচারণায় ছিলেন। মোনাজাতরত অবস্থায় হাসিনার ছবিসহ প্রচারপত্র সারা দেশে দৃশমান ছিল। উপরন্তু নির্বাচনী প্রচারের শুরুতে শেখ হাসিনা ও খালেদা পবিত্র পুরুষদের মাজার জিয়ারত করেন।[১৮]

নির্বাচনী আচরণবিধি ও নির্বাচন

নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের আলোচনা এবং তৎপূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় চূড়ান্ত আচরণবিধি ২৬শে এপ্রিল, ১৯৯৬-এ ঘোষণা করে।[১৯]

১. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাবে না অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না।

২. রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকবে। কোনো প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড করা বা তাতে বাধা প্রদান করা যাবে না।

৩. সরকারী ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সকল দল ও প্রার্থীকে সম-অধিকার প্রদান করতে হবে। তবে নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারী ডাক বাংলো, রেস্ট হাইস ও সার্কিট হাউস ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাবেন।

৪. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত জনসভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে সাধারণভাবে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৫. জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে কোনো সড়কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো জনসভা করা যাবে না।

৬. কোনো সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনোভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকদের অবশ্যই পুলিশের শরণাপন্ন হতে হবে। এ ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৭. নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল তাদের পক্ষে কেউ নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারী যানবহন ব্যবহার করতে পারবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার হতে বিরত থাকবেন।

৮. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাবে না।

৯. কোনো সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না। নির্বাচনী ক্যাম্প যথাসাধ্য অনাড়ম্বর হতে হবে। নির্বাচন ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনোরূপ খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাবে না।

১০. সরকারী ডাক বাংলা, রেস্ট হাউস ও কোনো সরকারী কার্যালয়কে কোনো দল বা প্রার্থীর প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

১১. নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত পোস্টার দেশী কাগজে সাদা-কালো রঙের হতে হবে এবং এর আয়তন কোনো অবস্থাতেই ২২"× ১৮"-এর অধিক বড় হতে পারবে না।

১২. কোনো নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী একই সাথে তিনটি মাইকের বেশী ব্যবহার করতে পারবেন না এবং উক্ত মাইকের ব্যবহার দুপুর ২টা হতে রাত ৮টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

১৩. নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা যাবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কারও শান্তি ভঙ্গ করা যাবে না।

১৪. নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে সকল প্রকার দেয়াল লিখন হতে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

১৫. নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন চালানো এবং আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা যাবে না। কোনো সরকারী কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি কোনো নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

১৬. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ট্রাক, বাস কিংবা অন্য কোনো যানবহন মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বের করতে পারবেন না।

১৭. শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ভোট গ্রহণ এবং কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়া স্বাধীনভাবে ভোটারদের ভোট প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা করতে হবে।

১৮. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোনো ধরনের তিক্ত, উস্কানীমূলক এবং ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী খরচের ব্যয়-সীমা কোনো অবস্থাতেই অতিক্রম করতে পারবেন না।
২০. অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাবে না।
২১. ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। কোনো রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করতে পারবেন না। কেবল পোলিং এজেন্টগণ তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থেকে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে যাবেন।
২২. এই বিধিমালার যে-কোনো বিধানের লঙ্ঘন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে এবং এইরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল প্রতিকার চেয়ে ইলেকটোরাল ইনক্যোয়ারি কমিটি বা নির্বাচন কমিশনের বরাবরে আর্জি জানাবে। কমিশনের বিবেচনায় অভিযোগ বস্তুনিষ্ঠ হলে কমিশন তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে-কোনো ইলেকটোরাল ইনক্যোয়ারি কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। উভয় ক্ষেত্রে ইলেকটোরাল ইনক্যোয়ারি কমিটি The Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972)-এর Article 91A-এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করে কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করবেন।[২০]

১২ই জুনের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ২৭ দফা আচরণবিধি ঘোষণা করে। আচরণবিধি লঙ্ঘনের তদন্ত করার জন্য গঠন করা হয়েছিল ইলেক্ট্রোরাল এনকোয়ারি কমিটি। নির্বাচন চলাকালে ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী অপরাধের বিচারের জন্য সাময়িক আদালতও গঠন করা হয়েছিল। ঋণখেলাপীকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।[২১]

অন্য একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ভোটদেরকে সচেতন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কিছু পদক্ষেপ। নির্বাচনী আচরণবিধি ৮ লাখ ৭৫ হাজার কপি সারা দেশে বিতরণ করা হয়। সমান সংখ্যক লিফলেটও বিতরণ করা হয়। উপরন্তু ভোটার সচেতনতার লক্ষ্যে তৈরী করা হয়েছিল ৮টি শর্টফিল্ম। তা ছাড়া একই উদ্দেশ্যে স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা) এবং এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি অব বাংলাদেশ (এডাব) বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে ভোটারদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক সচেতনতা যে কারণে প্রার্থীদের নির্বাচনী কৌশলে নতুনত্ব সৃষ্টি করতে হয়েছিল। প্রার্থীদের দেখা গেছে, ভোটাদাতার ঘরে গিয়ে ধরণা দিতে।[২২] নির্বাচনে ভোটাদাতার সংখ্যা ছিল ৫৬.৭ মিলিয়ন।[২৩]

১৯৯৬-এর জুন মাসের নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী সংসদের ৩০০টি আসনেই প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। জাতীয় পার্টি ২৯৩টি আসনে, ইসলামী ঐক্যজোট ১৬৫টি আসনে প্রার্থী দেয় এবং জাসদ (রব)সহ অন্যান্য দল ৯৩৫জন প্রার্থী দাঁড় করায়।[২৪] ২৮১জন স্বতন্ত্র মিলে ২৫৭৪জন প্রার্থী ওই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর

মধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৮। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী– এই চারটি দলই ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। দেশী-বিদেশী অনেক পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত থেকে এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন।[২৫] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ভোট উৎসব ও শঙ্কা

প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে আগ্রহী ভোটাদাতার প্রচুর সমাগম হয়েছিল। অনেকে রোদ-বৃষ্টির মধ্যে দু'ঘণ্টার ওপর লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও শান্ত ছিল এবং কোনো অভিযোগও জানা যায় নি। তবে শান্তভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষেত্রে মহিলার চেয়ে পুরুষ ভোটদাতা বেশী ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল। সবকিছু দেখে মনে হয় বিগত যে-কোনো নির্বাচনের চেয়ে ১৯৯৬-এর নির্বাচনে ভোটদাতার আগ্রহ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ছিল। ভোট দাতার আগ্রহ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কৃতিত্ব জনগণের। রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্বের চেয়ে জনগণই সেবার গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়। ভোট কারচুপি বা জালভোটের আশঙ্কা ছিল। বস্তিবাসী দরিদ্র মানুষের মধ্যে কিছু প্রার্থী টাকা বিতরণ করেছে এমন তথ্য সংবাদ মাধ্যমে এসেছিল। অবশ্য নির্বাচনের ফলাফলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে জনগণ বা ভোটারগণ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানান। মোহাম্মদপুরের একজন প্রার্থী অভিযোগ করেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী একটি দলের দাগী আসামী মাস্তান ভোটদাতাদেরকে প্রভাবিত করার জন্য হুমকি দিচ্ছে। অবশ্য উক্ত কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ও দলীয় নির্বাচনী প্রতিনিধিরা এমন অভিযোগ অস্বীকার করে। কিছু কিছু ভোটকেন্দ্রে দলীয় নির্বাচনী প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পারিক অভিযোগের সূত্রপাত হয় তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে।[২৬]

সারণি ১.১১ : সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[২৭]

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন	সংরক্ষিত আসন	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪৬	২৭	১৭৩
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১১৬	-	১১৬
জাতীয় পার্টি	৩২	৩	৩৫
জামায়াতে ইসলামী	৩	-	৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	১	-	১
ইসলামী ঐক্যজোট	১		১
স্বতন্ত্র	১	-	১
মোট	৩০০	৩০	৩৩০

নির্বাচনে শতকরা ৭৪.১৫ ভাগ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। বিএনপি ১১৬টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় এবং

জাতীয় পার্টির ৩২টি আসনে জয়ী হয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে। পঞ্চম সংসদের তুলনায় সপ্তম জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর আসনপ্রাপ্তি নিম্নগামী হয় এবং মাত্র ৩টি আসনপ্রাপ্তি ঘটে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি প্রদত্ত ভোটের যথাক্রমে ৩৭.৪৪ ভাগ, ৩৩.৬১ ভাগ ও ১৬.৪ ভাগ পায়। সংসদে ইসলামী ঐক্যজোট, জাসদ (রব) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ১টি করে আসন লাভ করে। শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া যথাক্রমে তিনটি এবং পাঁচটি নির্বাচনী এলাকা থেকে বিজয়ী হন। আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক এবং মোহাম্মদ নাসিম ও বিএনপির সাইফুর রহমান এবং কর্নেল (অব.) অলি আহমেদ প্রত্যেকে ২টি করে আসন লাভ করেন। জাতীয় পার্টির প্রধান জেনারেল এরশাদ উত্তরবঙ্গের ৫টি আসন পান। উক্ত তিন দলের যারা একের অধিক আসনে জয়লাভ করেন তাদেরকে একটি আসন রেখে বাকীগুলো ছেড়ে দিতে হয় এবং এভাবে সংসদের ১৬টি শূন্য আসনে ৫ই সেপ্টেম্বর উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[২৮]

৭ম সংসদীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদকে প্রার্থিতা অর্জনের জন্য দল বদল করতে দেখা যায়।[২৯] এদের সংখ্যা ৩৬। এ ৩৬ জন দলছুট রাজনীতিকের ২২জন বিএনপি থেকে, ৯জন আওয়ামী লীগ থেকে, ৪জন জাতীয় পার্টি থেকে, ১জন ইসলামী ঐক্যজোট ও ১জন স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নেন। এদের মধ্যে ১৫জন বিজয়ী হন। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের ব্যাপারে নির্বাচনী পূর্বাভাস অনেকাংশে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। অবশ্য অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপি নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করে এবং কারচুপির অভিযোগ এনে ১১১টি নির্বাচনী এলাকায় পুনরায় নির্বাচন দাবী করে। তবে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষক টিম যেমন– এনডিআই, সার্ক টিম, ইউরোপীয় ইউনিয়ন গ্রুপ, জাপানী ইলেকশন টিম, ফেমা ইত্যাদি এ নির্বাচনকে অল্প কিছু সমস্যা ছাড়া সুষ্ঠু ও অবাধ হিসেবে অভিহিত করে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও সরকার গঠনের জন্য সংসদে ১৫১টি আসন পায় নি।[৩০] বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য হল, সংখ্যালঘিষ্ঠ বা পরাজিতরা নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি এবং যার মাধ্যমে তাদের বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এমনি অভিযোগ তোলে। যেমন– ১৯৯১ সালে নির্বাচনের পরও আওয়ামী লীগ সূক্ষ্ম করাচুপির অভিযোগ তুলেছিল।[৩১] আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছাকাছি হলেও মন্ত্রিসভা গঠনে বিএনপিদলীয় রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস তাদের ডাকবেন কি না, এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। ইতোমধ্যে জেনারেল নাসিমকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান এবং জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করাসহ ঘটনার পরম্পরায় আরও কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাকে অবসর প্রদান করা নিয়ে নতুন জটিলতার সূচনা হয়। ১৩ই জুন বঙ্গভবনে নির্বাচনোত্তর সরকার গঠনের ব্যাপারে রুদ্ধদ্বার শলাপরামর্শ শুরু হয়। রুদ্ধদ্বার শলাপরামর্শে জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আওয়ামী লীগ পায় নি, বিএনপিরও নেই– এ অবস্থায় নির্বাচন বাতিল করে দিয়ে কোনো জরুরী অবস্থা জারী হতে যাচ্ছে কি না এ নিয়ে সারা দেশে গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি মধ্যে শঙ্কা ছিল, ছলে-বলে-কৌশলে

বিএনপি না আবার ক্ষমতায় বসে যায়। এ পরিপক্ষিতে ১৪ই জুন ধানমণ্ডির একটি বাসায় আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে নিয়ে মিজানুর রহমান চৌধুরী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়। সেখানে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, কোনো অবস্থাতেই নির্বাচনের ফলাফলকে নস্যাৎ হতে দেওয়া যাবে না। নির্বাচন বাতিল বা বিএনপির পুনরাবির্ভাব অথবা অন্য কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হবে না।[৩২] এ শূন্যতাপূরণে সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম দল এরশাদের জাতীয় পার্টির সাথে বোঝাপড়া হয় এবং জাসদ (রব)-এর আ. স. ম. আব্দুর রবকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংসদের ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৩টি জাতীয় পার্টিকে দিয়ে বাকী ২৭টি আসন আওয়ামী লীগের জন্য বরাদ্দ করা হয়।[৩৩] উল্লেখ্য এ দু'টি দলই ছিল চরম আওয়ামী লীগ বিরোধী। আওয়ামী লীগের এ পদক্ষেপ অবশ্য সিভিল সমাজ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত কারকদের পছন্দ হয় নি। কারণ এ দু'টি দলের পূর্ববর্তী কার্যক্রম সিভিল সমাজের পক্ষে ছিল না। কিন্তু সংসদীয় রাজনীতি এবং সংসদ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এটি মেনে নিতে হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এর বিকল্পও তেমন ছিল না।[৩৪] অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২৩শে জুন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ঐ দিনই ২০ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার সদস্যরাও শপথ গ্রহণ করেন। শেখ হাসিনা জাতীয় পার্টি মহাসচিব আনোয়র হোসেন মঞ্জুকে মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত করেন।[৩৫]

এই নির্বাচনী ফলের দু'টো লক্ষণীয় দিক আছে– এক. জামায়াতের ভরাডুবি। কিন্তু সুধাংশু শেখর হালদারের মতো ঝানু রাজনীতিবিদকে হারিয়ে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মতো বিতর্কিত ব্যক্তির বিজয়– প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। অবশ্য এর জন্য আওয়ামী লীগের স্থানীয় রাজনৈতিক অভ্যন্তরীণ কোন্দল দায়ী ছিল, যা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি নেতিবাচক সূচক হিসেবে আখ্যায়িত হতে বাধ্য। দুই. নারী ভোটদাতার ব্যাপক হারে ভোটদান। ভোটদাতার প্রায় ৪০ ভাগই ছিল নারী। চূড়ান্ত বিচারে ১২ই জুনের নির্বাচন ধর্মের রাজনীতিতে ধস আর রাজনৈতিক সচেতনার ক্ষেত্রে নারীর অগ্রযাত্রার সূচক হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য।[৩৬] বিএনপি ১১৬টি আসন নিয়ে সংসদে দ্বিতীয় স্থান লাভ করায় এ দলকে সরকারীভাবে সংসদীয় বিরোধী দল হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। দেশের সংসদীয় ইতিহাসে এই প্রথম এত বেশী সংখ্যক বিরোধী সদস্য সংসদে দৃশ্যমান হয়। এ সময় বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া শেখ হাসিনার ঐকমত্যের সরকারে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ ধরনের সরকার বাংলাদেশের সংবিধান ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেন। তিনি এ সরকারকে কোয়ালিশন সরকার হিসেবে অভিহিত করে জাতীয় সংসদে তাঁর দলের দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের ঘোষণা দেন।[৩৭] রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে প্রার্থী করা হয়। ইতোমধ্যে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেয়। ২৩শে জুলাই ১৯৯৬ সংসদ সদস্যদের ভোটে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।[৩৮]

সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের পেশার বিবরণ

দলীয় মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের মনোনয়ন দেওয়ার প্রবণতার কারণে অনেক নিবেদিতপ্রাণ দলীয় কর্মী মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হন– যা সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নির্দেশ করে না। এ সময় প্রধান দলগুলো থেকে বেশ কিছু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার মনোনয়ন লাভ করেন। এভাবে মোট ৪৬জন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ৬টি রাজনৈতিক দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১২জন বিজয়ী হন যার মধ্যে ৭জন আওয়ামী লীগের ৪জন বিএনপির এবং বাকী ১জন জাতীয় পার্টির ছিলেন। এ সময়ের রাজনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল দেশের অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতির প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ।[৩৯] ৭ম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ১৫২জন ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত, ৪৭জন আইনজীবী, ২২জন কৃষিবিদ, ১২জন শিক্ষক, ১৫জন চিকিৎসক, ১০জনের পেশা রাজনীতি এবং বাকী ৬০জন সমাজকর্মী ছিলেন। এ সংসদে ব্যবসায়ী শ্রেণীই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ গোষ্ঠীভুক্ত সংসদ সদস্য সদস্যগণের শতকরা ৪৩ ভাগ, ৫৫ ভাগ এবং ৫০ ভাগ যথাক্রমে আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির টিকিটে বিজয়ী হন। সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সমরূপ অর্থাৎ তাঁদের অধিকাংশই নব্য ধনিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।[৪০] তাদের মধ্যে সামরিক আমলা ৫.৩৩%, বেসামরিক আমলা ১.৩৩%, ব্যবসায়ী ৪৩.৬৭%, আইনজীবী ১৬.৬৭%, রাজনীতিবিদ ৮.৬৬% এ ছাড়া বাদ-বাকীরা অন্যান্য পেশার ছিল।[৪১]

সংসদীয় কার্যক্রম

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে জুলাই ১৯৯৬ এবং যথারীতি জুলাই ২০০১ সালে এ সংসদ পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্তি করে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রথমবারের মতো কোনো সংসদ তার মেয়াদ পূর্ণ করতে সক্ষম হয়।[৪২] দীর্ঘ একুশ বছর পর ক্ষমতায় ফিরে এসে আওয়ামী লীগ একে একে তাদের দলীয় কর্মসূচী অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে।[৪৩] আওয়ামী লীগ দু'ধরনের কিন্তু পরিপূরক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ঐকমত্য যেখানে আছে আওয়ামী লীগের পক্ষের, এমন কি বিরোধী, বামপন্থী, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনসমূহ। এদের কেউ কেউ আওয়ামী লীগ বিরোধী হলেও বিএনপির পক্ষে সোচ্চার নয়। দ্বিতীয়, প্রতিষ্ঠানসমূহ দৃঢ়করণ।[৪৪] সর্বাগ্রে তারা উদ্যোগ নেয় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের। এ কাজে প্রধান বাধা হিসেবে দেখা দেয় মোশতাক আহমেদের জারী করা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ যাকে জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনী বলে 'জায়েজ' করে গিয়েছিলেন। একুশ বছর কোনো ক্ষমতাসীনই যেমন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ব্যাপারে উৎসাহী বা আগ্রহী ছিলেন না, তেমনি এই অধ্যাদেশের বৈধতা নিয়েও কেউ প্রশ্ন তোলে নি। ১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের বেসরকারী বিল উত্থাপন করে। তৎকালীন স্পীকার এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই আর কোনো অগ্রগতি হয় নি। ১৯৯৬-এর ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে নিজেরা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের উদ্যোগ নেয়। এ

ব্যাপারে আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায়, পঞ্চম সংশোধনীর বলে ‘জায়েজ’ করা হলেও তা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটেই বাতিল সম্ভব। সে অনুযায়ী সংসদে এই অধ্যাদেশ বাতিলের জন্য একটি বিল উত্থাপিন করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ই নভেম্বর তা পাস হয়। অধ্যাদেশটি সংবিধানের অংশ, কাজেই তা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট ছাড়া বাতিলযোগ্য নয়– এটা দাবী করে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। কিন্তু ২৮শে জানুয়ারি হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিল যথার্থ বলে রায় দেয়।[৪৫] সরকার জেল হত্যাসহ বিভিন্ন ধরনের হত্যার বিচার শুরু করে। এমকি চট্টগ্রামে নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালিয়ে ২২জনকে হত্যায় দায়ে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রকিবুল হুদার বিচার শুরু হয়। এভাবে রাজনৈতিক হত্যার সাংবিধানিক অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিচার প্রথম শুরু হয় এবং তা সিভিল সমাজের সর্বস্তরের সমর্থন লাভ করে। সন্ত্রাস দমনে কর্মসূচী গৃহীত হয়। সন্ত্রাস দমনে তেমন সফল না হলেও সরকার যে এতে আন্তরিক তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।[৪৬] সপ্তম জাতীয় সংসদে সর্বমোট ২৩টি অধিবেশন হয় এবং এর ৩৮২টি কার্যদিবসে ১৮৯টি বিল পাস করে। সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংবিধানের ৭৪(১) বিধি অনুসারে স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এভাবে সিলেট-১ এবং কিশোরগঞ্জ-৫ আসন থেকে নির্বাচিত যথাক্রমে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ও এম. এ. হামিদ স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। তবে প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রমের শুরু থেকেই ট্রেজারি বেঞ্চ এবং প্রধান বিরোধী দলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন লক্ষণীয় হয় নি। সংসদের ফ্লোরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ও বিরোধী দলের ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে স্পীকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয়পক্ষের সংসদ সদস্যগণ সংসদীয় প্রথাভিত্তিক আচরণ করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেন।[৪৭] এভাবে প্রথমেই অহেতুক রাজনৈতিক বিতর্ক ও অনির্ধারিত বক্তব্যে সংসদের মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়। তবে প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রম যথারীতি এগিয়ে চলে। সংসদ সদস্যগণ দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা, জনগুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা, অর্ধঘণ্টা আলোচনা এবং মুলতুবী প্রস্তাবের ওপর অসংখ্য নোটিশ জমা দেন। লক্ষ্য করা যায় যে সপ্তম জাতীয় সংসদে ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়ে ২৯,৫৩৭টি জমাকৃত পার্লামেন্টারি প্রশ্নের ৩২.৮ ভাগের ওপর উত্তর প্রদান করা হয় এবং ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের ওপর পেশকৃত ১৫০০টি নোটিশের ১৩.৫ ভাগ আলোচিত হয়। উল্লেখ্য যে সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যক্রমকে অধিক গণতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে সে সময়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংসদীয় সংস্কার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে উত্থাপিত সকল বিলের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ, সংসদের তৃতীয় অধিবেশন থেকে ১৫ মিনিটের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু যা পরবর্তী কালে ৩০ মিনিট স্থায়ী করা হয় এবং কার্যপ্রণালী বিধির ওপর প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে মন্ত্রী নন এমন সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সংসদীয় কমিটির প্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ ধরনের সংস্কারের ফলে জাতীয় সংসদের কাঠামোতে গণতন্ত্রায়নের সূচনা হয়, তবে এর পরও সার্বিক সংসদীয় কার্যক্রমের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পুরোপুরিভাবে পড়ে নি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের সুযোগ সরাসরি বিরোধী দলীয় নেতা লাভ করেন। ফলে প্রধান নির্বাহীকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ

করে জবাবদিহিতা দাবী করেন এবং দায়িত্বশীল করতে প্রয়াস পান। বাংলাদেশের ৭ম জাতীয় সংসদে এ প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[৪৮] বাংলাদেশের সংসদে যে প্রশ্নের উত্তরগুলোতে সরকারের সাফল্য উঠে আসে সেগুলোরই শুধু উত্তর দেওয়া হয়।[৪৯] এ সংসদে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকারী দল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করলেও অর্ধঘণ্টা আলোচনা এবং মুলতুবী প্রস্তাবের ব্যাপারে অনমনীয় থাকে। ফলে এ সকল নোটিশ গ্রাহ্য করা হয় নি বা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সাধারণত ক্ষমতাসীন সরকারের প্রশাসনিক দায় বা ব্যর্থতার বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবী মুলতুবী প্রস্তাবগুলোতে প্রতিফলিত হওয়ায় ১৯৯১-পরবর্তী কোনো সরকারই নিজ দুর্বলতা বা ব্যর্থতা বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারে কোনো রকম আগ্রহ দেখায় নি। সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারের ওপর তদারকি বিষয়ে ২৭১টি নোটিশ পাওয়া যায়। সপ্তম জাতীয় সংসদে যথারীতি সরকারী বিলের প্রাধান্য থাকে এবং এ সকল বিলের মধ্যে দাপ্তরিক, প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থ-সংক্রান্ত, কৃষি, স্থানীয় সরকার, বিচারিক, রাষ্ট্রীয় সার্ভিস, আইনগত এবং অধ্যাদেশ অনুমোদন বিল উল্লেখযোগ্য। এ সকল সরকারী বিল সংসদে নির্বিঘ্নে পাস হয়ে যায়। বেসরকারী সদস্য বিলের ক্ষেত্রে অর্ধ শতাধিক নোটিশ জমা দেওয়া হলে অধিকাংশ সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়। তবে এর অনুমোদনের হার শূন্যের কোঠায় থেকে যায়। এ সংসদে অবশ্য অধ্যাদেশ অনুমোদনের হার তুলনামূলকভাবে কম পরিলক্ষিত হয়। সংসদের চার বছরে সতেরটি অধ্যাদেশ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছিল। জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিলের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ করা হয় নি এবং সে সাথে বিস্তারিত বিতর্ক এবং বিশেষত বিরোধী দলের ইতিবাচক ইনপুট প্রদান বা কার্যকরী অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় নি। গুরুত্বপূর্ণ বিলসমূহ যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিলের ওপর যথাযথ বিতর্ক হতে পারে নি। ট্রেজারি বেঞ্চ উক্ত বিলসমূহ পাসে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিতর্কিত পাবলিক সেফটি বিলটিতে আপত্তির বিষয় থাকলেও পূর্ণগতিতে এবং সহজেই তা অনুমোদিত হয়ে যায়। এভাবে অতীতের সংসদগুলোর ন্যায় বিল প্রক্রিয়ায় সংসদীয় সমঝোতা বরাবরই অনুপস্থিত ছিল। সরকারী এবং বিরোধী দলের অব্যাহত সাংঘর্ষিক সম্পর্ক এতে নেতিবাচকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিল যেমন ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স (রিপিল) বিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চারটি বিল, স্থানীয় সরকার বিল, কমিটি ব্যবস্থা বিল, পাবলিক সেফটি বিল ইত্যাদি বিলে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সীমিত বা শূন্য ছিল। জাতীয় সংসদের বাইরে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সংসদ ফ্লোরেও দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্লেনারি এবং কমিটি অধিবেশন উভয় ক্ষেত্রেই এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মতপার্থক্য থাকায় কমিটি গঠন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। তবে প্লেনারি সেশনে বিরোধীদের ঘন ঘন ওয়াকআউট বা বয়কটের প্রবণতা থাকলেও কমিটি ব্যবস্থায় বিরোধী দলের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। এ সংসদের কমিটি ব্যবস্থায় গণতন্ত্রায়ন ঘটলেও আইন প্রণয়নে বা সংসদীয় তদারকিতে সংসদীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয় নি।[৫০] এ সময় সংসদে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বিভিন্ন ব্যাপারে খুব অল্পতেই অধৈর্য হয়ে উঠে। নতুন সংসদের অধিবেশনের প্রথম দিনেই তারা ওয়াকআউট করে। এরপর থেকেই এই ওয়াকআউট পর্ব

একটি রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হয়। বিভিন্ন ইস্যুতে তারা মিটিং-মিছিল এমনকি ভাঙচুরেও লিপ্ত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ১৪ই জানুয়ারি স্পীকারের মধ্যস্থতায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একটা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে অনুযায়ী প্রধান বিরোধী দল আবার অধিবেশনে যোগদান করে।[৫১] তবে অনেক দিক দিয়েই সপ্তম সংসদের ইতিবাচক সূচনা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল ক্ষমতায় আসে। বৃহত্তম বিরোধী দল এবং সরকার পরিচালনায় যারা দু'বার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অধিবেশনপূর্ব বিরোধী দলের অঙ্গীকার ছিল ইতিবাচক ও গঠনমূলকভাবে ভূমিকা পালন করবে। স্পীকার/ডেপুটি স্পীকারের পদে নির্বাচিত হলেন দু'জন বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। সংসদীয় রীতি অনুসারে সংসদীয় কমিটিগুলোর সভাপতি মন্ত্রী হল না। উপরন্তু সংসদকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করার জন্য সংসদের কার্যবিবরণীর অংশবিশেষ টেলিভিশন ক্যামেরায় চোখ দিয়ে জনগণের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থাও হল। মোটের ওপর বেশ কিছু ইতিবাচক অর্জনসহ সপ্তম সংসদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণ থেকেই সংসদ হোঁচট খেতে শুরু করে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক বলতে রাজী হন নি এবং খুব সম্ভবত তিনি তা করেছিলেন দলীয় নির্দেশেই। রাষ্ট্রপতির এহেন ভাষণের ফল হল এর ওপর সংসদে কোনো আলোচনা হল না। অথচ আলোচনা ছিল রীতিসিদ্ধ। সুতরাং একটি অবাঞ্ছিত দৃষ্টান্ত তৈরী হয়ে থাকল।[৫২] সবচেয়ে দৃষ্টিকটু হচ্ছে সংসদ সদস্যদের সার্বিক অঙ্গভঙ্গি এবং শ্রুতিকটু বাচনভঙ্গি ও ভাষা। উপরন্তু বক্তব্যের বিষয়বস্তু প্রায়শঃ অসংসদীয়। এমনকি কথার ধরনের মধ্যে দিয়েও আপত্তিকর বৈশিষ্ট্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কোনো একটি বিশেষ সময়ে বা সময়ে-সময়ে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বা দলীয় সংসদ সদস্যকে ফ্লোর দেওয়ার দাবী জানানোর জন্য সংসদ সদস্যবৃন্দের হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়ান, ফাইল চাপড়ানো বা ফাইল ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি সবই সংসদীয় রীতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত। সরকারী ও বিরোধী উভয় পক্ষের সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে মাঝে মধ্যে অনাবশ্যক ব্যক্তিগত বা দলীয় বিষয় যত প্রাধান্য পেয়েছে, জাতীয় স্বার্থ ও জনগুরুত্বপূর্ণ কিছু ততটা প্রাধান্য পায় নি। তবে, ১৯৯৭ সালের ৬ই আগস্টের অধিবেশনে সংসদের ভাবমূর্তির চূড়ান্ত অবনতি ঘটল বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্যে 'বেয়াদব' শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার কারণে।[৫৩]

দেশের পূর্ববর্তী সংসদগুলোর মতো সপ্তম জাতীয় সংসদও নিজেকে নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করতে পুরোপুরিভাবে সক্ষম না হওয়ায় সরকারী ও বিরোধী দলসমূহ রীতিসিদ্ধ সংসদীয় রাজনীতি চর্চা করতে পারে নি। সরকারী দলের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা এবং সেই সাথে বিরোধী দলের শুধু বিরোধিতা খাতিরে বিরোধী ভূমিকা পালন তাই সংসদ গঠনমূলক হতে পারে নি। বিরোধী দলের সংসদের বাইরে এবং ভেতরে সরকারবিরোধী আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।[৫৪] সপ্তম সংসদে ১৪ই জুলাই ১৯৯৬ থেকে ১৩ই জুলাই ২০০১ সাল পর্যন্ত মোট ৩৮২ কর্মদিবসের মধ্যে বিরোধী দল ৬২ বার ওয়াকআউট করে।[৫৫]

শেখ হাসিনা সরকারের অর্থনৈতিক সাফল্য

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পরে অর্থনীতিতে একটা স্থিতিশীলতা আসে এবং একই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বৃদ্ধি পায়। তা পরবর্তী সরকার ধরে রাখে এবং একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করায়। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জিডিপির একটা চিত্র হল : ১৯৯৭ সালে ৫.৪% ১৯৯৮ সালে ৫.২%, ১৯৯৯ সালে ৪.৯%, ২০০০ সালে ৫.৯%, ২০০১ সালে ৫.৩% হারে প্রবৃদ্ধি হয়।[৫৬] ১৯৯৭-২০০১ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল স্থিতিশীল এবং এই সময় বেশীর ভাগ সময় প্রবৃদ্ধি ছিল ৫-এর উপর। যদিও রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল না। এই সময়ে বিএনপি মোট ৬১টি জাতীয় পর্যায়ে হরতাল আহ্বান ও পালন করে। লাগাতার হরতাল কর্মসূচী অর্থনীতির প্রভূত ক্ষতির কারণ হয় এবং শিক্ষা, পরিবহন, কর্মসংস্থান, পোশাকশিল্প, সঞ্চয়, বিনিয়োগসহ নাগরিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও জনমনস্তত্ত্বে সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।[৫৭] শেখ হাসিনার পাঁচ বছর বাম্পার খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং পরপর পাঁচ বছর শতকরা পাঁচ ভাগের ঊর্ধ্বে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচনে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার সাফল্যের পরিচয় দেয়। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন খাতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ সরকার তাদের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে যেখানে ৪৭ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করত সেই হার ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ৪৪ শতাংশে কমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ২৮০ মার্কিন ডলার থেকে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ৩৮৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।[৫৮] আওয়ামী লীগ সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। সীমিত সম্পদের মধ্যেও সরকার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব প্রদান করে। বয়স্ক ভাতা, গৃহায়ণ, আশ্রয়ণ, ঘরে ফেরা, আদর্শ গ্রাম প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, দুস্থ ও বিধবা ভাতা এবং কর্মসংস্থানে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ দান কর্মসূচীসহ সরকার ব্যাপক সুসমন্বিত কর্মসূচী বাস্তবায় করে।[৫৯]

ইশতেহারের বাস্তবায়নে সাফল্য

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর একটি বিষয় ছিল, সংসদীয় কমিটিসমূহ করার জন্য কমিটির সভাপতির পদে মন্ত্রীর বদলে সাধারণ সদস্যকে নির্বাচন। এটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। কারণ, মন্ত্রীও পদমর্যাদা ভুলে সাধারণ সদস্য হিসেবে কমিটিতে থাকেন এবং সদস্যদের প্রশ্নের জবাব দেন। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে কমিটিগুলো কাজ করছে। সরকারী নীতিনির্ধারক এবং বিরোধী দল যখন বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রকে তোয়াজে তোয়াজে অস্থির করে তুলেছিল তখনই আবার দেখা যায় সংসদীয় কমিটিগুলো তাদের কাজের হিসাব নিচ্ছে এবং প্রয়োজনে ভর্ৎসনা করছে।[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

এ রকম একটি উদাহরণের সৃষ্টি হয়েছে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৯। 'ভোরের কাগজ'-এর প্রথম পাতায় বিস্তারিতভাবে তা ছাপা হয়েছিল। সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্যও।

নৌবাহিনী একটি ফ্রিগেট কিনেছে দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ু কোম্পানি থেকে। এটি কেনার জন্য ২৫টি দরপত্র জমা পড়ে। সর্বনিম্ন তিনটি দরপত্র ছিল চীনের-৬৮, ৭২ ও ৮৩ মিলিয়ন ডলারের। কিন্তু তারপরও প্রায় ৯৪ মিলিয়ন ডলারে দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ু কোম্পানিকে ফ্রিগেট সরবরাহের কার্যপত্র দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত এর মূল্য দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার। এ ধরনের ঘটনা যে এই প্রথম তা নয়। এরশাদ আমলে তো যথেষ্ট হতো। কিন্তু কখনই কেউ তা চ্যালেঞ্জ করে নি। এবার প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটি ফ্রিগেট কেনাকে চ্যালেঞ্জ করে। উল্লেখ্য, এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে আছেন দু'জন প্রাক্তন লে. জেনারেল সফিউল্লাহ ও নূরুদ্দিন খান এবং মেজর আখতারুজ্জামান। তারা অভিনন্দনযোগ্য এ কারণে যে, পুরোনো সম্পর্ক ভুলে তারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাদের কাজ করেছেন।[৬১] পাকিস্তানে সেনাবাহিনী ক্ষমতার অংশে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদের ছাড়া সবাইকে চোরবাটপাড় বলে কয়েকদিন পরপর ক্ষমতা দখল করত। কেউ এ সব নিয়ে প্রশ্ন তোলে নি। বাংলাদেশে জেনারেল জিয়া ও এরশাদ আমলে সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার করে তোলার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু গণ-আন্দোলনের কারণে তা নস্যাৎ হয়ে গেছে।[৬২] এখনো তাদের অনেকেই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। যে কারণে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গেলে তাদের মন রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু, যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল তাদের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তাদের প্রশ্নের উত্তরও দিতে হচ্ছে। জবাবদিহিতা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। সংসদের এক অংশ তা মানছে, অন্য অংশ তা মানছে না। এটিই হল ট্র্যাজেডি। সে জন্য বলা হয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব. আংশিক কমিটমেন্টে নয় পুরো কমিটমেন্ট থাকলে। [৬৩]

১৯৯৬-এর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচনসহ সকল পর্যায়ে জনগণ নির্ভয়ে ও অবাধে তাদের পছন্দমতো প্রার্থীর পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। এ ছাড়াও কূটনৈতিক খাতে বেশ সাফল্য অর্জন করে, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি, বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সফলতার মধ্যে রয়েছে–

১. শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই দেশ সর্বপ্রথম খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করে।

২. আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনামলে গড়ে সর্বোচ্চ প্রায় ৬ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৩. মাথাপিছু আয় ২৮০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৩৮৬ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়।

৪. দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার কমেছে। ৪৭.২ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৪ শতাংশ। গড় আয়ু ৫৮.৭ থেকে ৬১.৮ বছরে উন্নীত হয়।

শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে অর্জিত হয়েছে সাফল্য। বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে দ্বিগুণের বেশী অর্থাৎ ৩৮০৩ মেগাওয়াট হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হয়।[৬৪] আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় এবং বিচারের রায়ও ঘোষিত হয়। পরবর্তীকালে এ রায় আংশিকভাবে কার্যকর হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইশতেহার বাস্তবায়নে শেখ হাসিনার সরকারের ব্যর্থতা

আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, দেশ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন, শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের উন্নয়ন, গণমাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রমিকদের দাবী পূরণ, পাটের দাম মনপ্রতি ৫০০ টাকা করা ইত্যাদি অঙ্গীকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পুরোপুরি বাস্তবায়ন আওয়ামী লীগ সরকার করতে নি।[৬৫] দলটি তাদের নির্বাচনী ইতশেহারে টেলিভিশন ও রেডিওর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এ জন্য তারা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাধীন টেলিভিশন বিবিসি কীভাবে চলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একটি প্রতিনিধি দলও পাঠায়। এই প্রতিনিধি দল ফিরে এসে রেডিও, টিভির স্বায়ত্তশাসনের জন্য কতগুলো সুপারিশ সরকারের কাছে উপস্থাপন করে। সেই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকার কোনো পদক্ষেপই নেয় নি। বরং পূর্বের মতোই রেডিও, টেলিভিশনকে সরকারীভাবে কঠোর নিয়ন্ত্রণ করা হয়।[৬৬] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠন করার পর থেকে একটি কথা বারবার বলেছেন, তা হল– সন্ত্রাসীদের কোনো ক্ষমা নেই। সন্ত্রাসী সে যে দলেরই হোক না কেন, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকার সময়ও ঘরোয়া বৈঠক, কর্মীসভা জনসভা– সবখানেই তিনি একই কথা বলেছেন। স্বাভাবিকভাবে মনে হয়েছিল এটি দলীয় এবং সরকারী নীতি। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসী গ্রেফতার শুরু করেন। বলা বাহুল্য, সরকার এবং বিরোধী দলের অনেকেই তাতে খুশি হয় নি। তবে সরকারকে এ বিষয়ে আন্তরিক মনে হয়েছিল। এটাও ঠিক সরকার এক্ষেত্রে খুব বেশী সাফল্য পায় নি। ২১ বছর ধরে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের দলীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসা হয়েছে যা ৫ বছরে নির্মূল করা সম্ভব হয় নি।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ব্যর্থতা

১৯৯০-এর আন্দোলনের পর আশা করা হয়েছিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পূর্ববর্তী ধারা থেকে আলাদা হবে। দেখা গেল তা পূর্ববর্তী প্যাটার্ন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এ প্যাটার্নের খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। তবে, একটি পরিবর্তন লক্ষণীয় এবং তা হচ্ছে সেনা সদস্যরা আরও সহিষ্ণু হয়েছিল। মনে হয়েছিল, তারা সিভিল কর্তৃত্ব মেনে নিতে অভ্যস্ত হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, তাদের সুযোগ-সুবিধা মেনে নিলে তারা এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকবেন। যে কারণে, আওয়ামী লীগ সরকারের বাজেটে সামরিক বাহিনীর ব্যয় বেড়েছিল, ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্স বা পিএসএফ-এর ধারা বদল হয় নি। ১৯৯৬-এর নির্বাচনেও অবসরপ্রাপ্ত বেশ ক'জন সেনা অফিসারকে (যারা রাজনীতির সঙ্গে ছিলেন না) মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং জে. নূরুদ্দীনকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় দেওয়া হয়। ঢাকা শহরের মূল্যবান জায়গায় সামরিক জাদুঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল অথচ দেশে তখনও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। সামরিক বাহিনীকে খুশি রাখার জন্য যদি এত করা হয় তাহলে বর্তমানে বিএনপি বা আওয়ামী লীগের মধ্যে এ ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য তেমন থাকে না।[৬৭] এই সরকারের আমলেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হয়েছিল। সে সময় সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়েছেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাজী আরেফ, সাংবাদিক আরএম সাইফুল আলম মুকুল ও শামছুর রহমান কেবল, আইনজীবী হাবিবুর রহমান মণ্ডল, আইনজীবী কালিদাস বড়াল, এডভোকেট নূরুল ইসলাম, ব্যবসায়ী শিপু, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রুবেল, কলেজ ছাত্রী বুশরা, ছাত্রদল কর্মী সজল, ব্যবসায়ী তারাজউদ্দিন, আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেন, যুগ্মসচিব নিকুঞ্জ বিহারীসহ সারা দেশের অনেক মানুষ।[৬৮]

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১৯৯৭

আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে ১৯৯৭ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ৩১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হেনা তাঁর নির্বাচন পূর্ববতী ভাষণে বলেন, 'নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও পক্ষপাতহীনভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'[৬৯] নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নের নির্বাচনের দিন সংশ্লিষ্ট থানায় স্কুটার, যান্ত্রিক নৌযান, জিপ প্রভৃতি যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ১৫টি বেসরকারী সংগঠন ৩৩,৮৫৩জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে। ইউনিয়ন পরিষদের মাসব্যাপী নির্বাচনে এতটাই স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দ ও উৎসাহ ছিল যা পূর্বে কখন দেখা যায় নি।[৭০] এই নির্বাচনে সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে কঠোর হাতে দমন করায় তেমন কোনো নির্বাচনী সন্ত্রাস সংঘটিত হয় নি। নির্বাচিত সরকারের অধীনে এটিই ছিল এ যাবত কালের সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানি রূপ দেওয়ার চেষ্টা

জনগণের অর্জিত ভোটের অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তথা গণতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে আওয়ামী লীগ সরকার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করেছে। এ উদ্দেশ্যে তারা বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে যাতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায়–

ক. সরকার পরিচালনার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিটিভি-র মুখোমুখি অনুষ্ঠানে সরাসরি জনগণের প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

খ. জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ৩০ মিনিট প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু করা হয়।

গ. মন্ত্রীদের পরিবর্তে সংসদ সদস্যগণকে মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়।

ঘ. জাতীয় সংসদকে সরকার পরিচালনার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করা হয়।

ঙ. সংসদ পরিচালনায় সংসদ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এই সব উদ্যোগ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম– যা আওয়ামী লীগের কৃতিত্ব। এটা গণতন্ত্রের প্রতি আওয়ামী লীগের যে অঙ্গীকার তারই প্রতিফলন। আওয়ামী লীগ পাকিস্তান আমলেও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে, বাংলাদেশে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেছে। শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর গণতন্ত্রের জন্য এই সব যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে– যা গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ।

বিরোধী দলের সরকারের বিরোধিতা

বাংলাদেশে বিরোধী দলের অর্থ সব কিছুর বিশেষ করে সরকারী সব কার্যক্রমের বিরোধিতা করা। যে কার্যক্রমের বিরোধিতা করা হয় তা ভালো, কি খারাপ– সেটি বিচার্য নয়। সে দিক থেকে বিচার করলে বিএনপি আমলে অধিকাংশ কার্যক্রম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। আবার শেখ হাসিনা সরকারের অধিকাংশ বিরোধী দলের সমর্থন পায় নি। এমনকি পাঁচ বছর একটানা কৃষিতে বাম্পার ফলনের পরেও।[৭১] বিরোধী দলের এই অকারণ বিরোধিতা দেশের উন্নয়নকে স্থবির করে দেয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহকে গণতন্ত্রের স্বার্থে এই রীতি থেকে বের হতে হবে।

ধর্মীয় জঙ্গীবাদ হুমকি

আওয়ামী লীগ সরকারকে ১৯৯৯ সাল থেকে মোকাবেলা করতে হয় এক নতুন সমস্যা সেটা হল ধর্মীয় জঙ্গীবাদের হুমকি। ধর্মীয় জঙ্গীবাদ দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলে। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং দেশকে বিশৃংখল পরিস্থিতিতে ফেলাই এর উদ্দেশ্য। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানোই এই সব আক্রমণের লক্ষ্য। ১৯৯৯-২০০৫ সময়কালে বাংলাদেশে ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীল এক চিত্র। যার সাথে যুক্ত হয়েছে 'লুক্কায়িত থেকে প্রকাশ্য' পদ্ধতি, একমুখী হাতিয়ারের পরিবর্তে বিধ্বংসী বোমা ব্যবহার'। এ সবের বিশ্লেষণে ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সুদূরপ্রসারী কিছু উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখলের লক্ষ্যে সংস্কৃতি ধারায় পরিবর্তন আনা যা তাদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু :

ক. সরকারী প্রশাসন যন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (যেমন : জেলা প্রশাসক);

খ. ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন থিয়েটার, প্রেক্ষাগৃহ, জনসমাবেশ, কমিউনিটি সেন্টার, লাইব্রেরীসহ বিচার বিভাগ (আদালত);

গ. ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু জামায়াতের রাজনীতি বিরোধী যেমন সুফি-সমাধিস্থাল মাজারকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান।

যেটা বিরোধী মতকে সহ্য না করার একটা চরম দৃষ্টান্ত। তাদের উদ্দেশ্য হল আফগানিস্তানের তালেবান মডেলের সরকার গঠন করা– যা অবশ্যই গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ। এই আক্রমণগুলোর সাথে জামায়াত ও তাদের পৃষ্ঠোপোষক রাজনৈতিক দলসমূহের হাত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

সারণি ১.১২ : বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ধর্মীয় উগ্রবাদীদের বড় ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড : ১৯৯৯ থেকে [৭২]

ঘটনার তারিখ	**লক্ষ্যবস্তু মাত্রা/প্রকৃতি এবং স্থান**	**প্রত্যক্ষ ক্ষতি**
৬ই মার্চ ১৯৯৯	উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, যশোর	নিহত ১০, আহত ১০৫
৮ই অক্টোবর ১৯৯৯	আহমেদিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ	নিহত ৮, আহত ৩২
২০শে জানুয়ারি ২০০১	সিপিবি'র সভায় টাইম বোমা বিস্ফোরণ, ঢাকা	নিহত ৭, আহত ৫২
১৪ই এপ্রিল ২০০১	পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, ঢাকা	নিহত ১১, আহত ১২০
৩রা জুন ২০০১	গীর্জায় টাইম বোমা বিস্ফোরণ, গোপালগঞ্জ	নিহত ১০, আহত ২৫
১৬ই জুন ২০০১	আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণ, নারায়নগঞ্জ	নিহত ২২, আহত ৫০

বিরোধী দলসমূহের মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবী

বিরোধী দলসমূহ মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবীতে জুলাই ১৯৯৭ থেকে রাজপথে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করে।[৭৩] কেন বা কী কারণে তারা সরকারের পতন ঘটাতে চান তা স্পস্ট নয়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দল থাকবে– এটাই স্বাভাবিক। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সরকারের যেমন একটি ভূমিকা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিরোধী দলেরও। সরকারের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে বিরোধী দল সরকার গঠন করে– এটাই গণতন্ত্রের কথা। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপারটি যেন কিছুটা ভিন্ন। এখানে সরকার ও বিরোধী দল আছে বটে, কিন্তু এদের মাঝে কোনো সহাবস্থান হচ্ছে না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর দু'বছরের মাথায় সেই সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয় বিরোধী দলসমূহের পক্ষ থেকে। সরকার ভুল করতেই পারে– আওয়ামী লীগ সরকারও ভুল করেছে। তাদের নীতি সব সময় সঠিক ছিল– এ কথা বোধহয় আওয়ামী লীগের সমর্থকরাও বলবেন না। এক্ষেত্রে জনগণকেই সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল আওয়ামী লীগকে পরিত্যাগ করার। আর সেই সুযোগটি হচ্ছে সাধারণ নির্বাচন। কিন্তু সেটি হয় নি। নির্বাচিত সরকারকে পাঁচ বছর সুযোগ দেওয়ার আগেই পদত্যাগের দাবী জানান হয়। একটি নির্বাচিত সরকারকে পাঁচ বছর সময় দিতে হবে। এই সময়সীমায় সরকারের ভুল-ত্রুটিগুলো উল্লেখ করে বিরোধী দলকে বিকল্প নীতি উপস্থাপন করতে হবে। গণতন্ত্রে এটাই নিয়ম, গণতন্ত্রে এ কথাটাই শেখায়। কিন্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বলে ভিন্ন কথা। নির্বাচিত সরকারকে এখানে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় অগণতান্ত্রিক উপায়ে। নির্বাচিত সরকারকে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাতের প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।[৭৪] প্রধান বিরোধী দল বিএনপি সংসদকেন্দ্রিক আন্দোলন আগে থেকেই করতে ছিল। ১৫ই জুলাই ১৯৯৭ সালে জামায়াতের সঙ্গে মিলে তারা সারা দেশে আধাবেলা হরতাল ডাকে। ১৯শে জুলাই পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকার গঠিত কমিশনের বৈঠক হয়। ২৪শে আগস্ট বিএনপি সারা দেশে আবার হরতাল ডাকে। সে দিন বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে সাংবাদিকসহ শতাধিক আহত হয়। গ্রেফতার হয় অনেকে। সে সময় সংসদ অধিবেশন চলছিল। বিএনপি এতে যোগদান করে। তবে অধিবেশনের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত। প্রায়ই বিএনপি অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করে। সে সময় অধিবেশনে কোনো কোনো সদস্যের বক্তৃতা-বিবৃতি অনেক ক্ষেত্রে শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য জনসংহতি সমিতির মধ্যে আবার বৈঠক শুরু হলে শান্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর সরকারের পক্ষ থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। ৩রা অক্টোবর বিএনপি দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের ক্রমাগত বৈঠকে এ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা চূড়ান্ত হতে চলছে এটা বুঝতে পেরে বিএনপি-জামায়াত এবং জাফর-মোয়াজ্জেমের জাতীয় পার্টি তা বানচালের জন্য একজোট হয়ে যায়। এরা পার্বত্য এলাকায় একটি সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ গঠন করে আন্দোলন করতে থাকে। ২৯শে অক্টোবর ১৯৯৭ তারা তিনটি পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে। ১৯৯৭ সালে নভেম্বরের

দুই তারিখে সংসদের সপ্তম অধিবেশন শুরু হলে বিএনপি এতে যোগদানে বিরত থাকে। বিএনপি সংসদ ছেড়ে রাস্তায় আন্দোলন গড়ে তোলে। ৪ঠা নভেম্বর কয়েকটি দল মিলে রাজধানীতে আধাবেলা হরতাল ডাকে।[৭৫] এর মধ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের সন্তোষজনক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ এক ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিএনপিসহ অন্যান্য দল সংবিধান পরিপন্থী বলে দাবী করে এই চুক্তির বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে বিএনপি ডাকে ৭ই ডিসেম্বর এবং ১০ই ডিসেম্বর বিএনপি, জামায়াতসহ সাত দলের আহ্বানে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার হরতাল পালিত হয়। ২১শে ডিসেম্বর জামায়াত-বিএনপি এ প্রশ্নে যৌথ কালো পতাকা মিছিল করে। বেগম জিয়া ঘোষণা করেন, অবিলম্বে শান্তি চুক্তি বাতিল করা না হলে তিনি সরকার পতনের একদফা আন্দোলন শুরু করবেন। জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলকে সংসদে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সেখানেই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, সে সময় বিরোধী দল অধিবেশন বর্জন করে আসছিল। সরকারের তাদেরকে অধিবেশনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালায়। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা উদ্যোগ খানিকটা ফলপ্রসূ হয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ স্পীকারের কক্ষে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতারা চার ঘণ্টা স্থায়ী এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক পরবর্তী তিন দিনও চলে। ২রা মার্চ দীর্ঘ আলোচনা শেষে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতারা চার দফা সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি মোতাবেক বিএনপি ৮ই মার্চের মধ্যে সংসদ অধিবেশনে যোগদান করতে রাজী হয়। ১২ই এপ্রিল ১৯৯৮ শান্তিচুক্তিকে আইনগত বৈধতা দেওয়ার জন্য সংসদে বিল উত্থাপিত হলে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের এমপিরা তার প্রতিবাদ করেন। বিএনপি এক পর্যায়ে সংসদ হতে ওয়াকআউটও করে। পরদিন এ সংক্রান্ত চারটি বিল বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বিএনপি সদস্যরা হৈ চৈ ও শ্লোগান দিতে দিতে ওয়াকআউট করেন। বিএনপিসহ চার দল এর প্রতিবাদে ১৫ই এপ্রিল সারা দেশে আধাবেলা হরতাল ডাকে। হরতালের দিন সংসদের বিকালের অধিবেশনে বিরোধী দলকে ফ্লোর প্রদানের দাবীকে কেন্দ্র করে বিএনপির সদস্যরা এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সে সময় ১৫ মিনিটের এক বিশৃংখল পরিস্থিতিতে বিরোধীদলের উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে উত্তেজিত বিএনপি সদস্যরা স্পীকারের আসনের দিকে মারমুখী ভঙ্গিতে ছুটে যায়। তার দিকে কাগজ ও ফাইল ছুঁড়ে মারেন এবং স্পীকারকে গালিগালাজ করেন। এরা টেলিভিশন ক্যামেরা ভাংচুর করে এবং সংসদ কর্মকর্তাদের টেবিল থেকে বইপত্র নিয়ে যত্রতত্র নিক্ষেপ করে। অবশ্য বেগম জিয়া এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দাবী করেন, স্পীকারের ভূমিকার কারণেই এমনটি ঘটেছে। তিনি নিরপেক্ষ নন এবং দলীয় সভাপতির ন্যায় আচরণ করেন।[৭৬] অবশ্য রেডিও টিভির মাধ্যমে এই ঘটনার সংবাদ চিত্র এবং বর্ণনা প্রত্যক্ষ করে দেশবাসী হতবাক হয়ে যায়। সংসদ সদস্যদের ভাবমূর্তিও সার্বিকভাবে এই ঘটনায় ক্ষুণ্ন হয়। এদিকে ১৬ই এপ্রিল ১৯৯৮ সংসদীয় দলের সভায় বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া বলেন, "আওয়ামী লীগ চাইছে বিএনপি যাতে সংসদ ত্যাগ করে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সংসদ ছেড়ে যাব না। দেশ ও জাতির সমস্যা নিয়ে সংসদের ভেতরে ও বাইরে কথা বলতে হবে।"[৭৭] এর

Dhaka University Institutional Repository

তিন দিন পরেই সরকার ও বিরোধী পক্ষের সমঝোতা চুক্তি ভঙ্গের জন্য এরা একে অপরকে দায়ী করে। ১৯৯৮ সালের ২০শে এপ্রিল সংসদে ১৫ই এপ্রিলের ঘটনা নিয়ে বিতণ্ডাকালে বিএনপি ফের ওয়াকআউট করে। ২১শে এপ্রিল স্পীকার এক রুলিংয়ে বলেন, মন্ত্রী হওয়ার পরও বিএনপির এমপি ডা. আলাউদ্দিন ও হাসিবুর রহমান স্বপনের সংসদ সদস্যপদ শূন্য হয় নি।[৭৮] এই রুলিং বিএনপির হাতে একটি অস্ত্র তুলে দেয় আন্দোলনের জন্য। এদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত নেয়, দলীয় সংসদ সদস্যরা নিজেদের পদত্যাগপত্র চেয়ারপার্সনের কাছে জমা দেবে। সে সময় দেশে বন্যা পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। মানুষের দুর্ভোগ চরমে। এমনি পরিস্থিতিতেও বিরোধী দল সরকারবিরোধী আন্দোলনে ছাড় দিতে রাজী ছিল না। আন্দোলনের কৌশল হিসেবেই তারা সংসদ সদস্যদের পদত্যাগপত্র সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮ই আগস্ট ১৯৯৮ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন, 'বিএনপির এমপিরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে শূন্য আসনগুলো সঙ্গে সঙ্গে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ২০শে আগস্ট বেগম খালেদা জিয়া মন্তব্য করেন, 'বিএনপি সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে দেশে আর কোনো নির্বাচন হবে না।'[৭৯] অবশ্য এ সময় বিএনপি'র এমপিদের পদত্যাগপত্র জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ক্ষমতাসীন দল সিদ্ধান্ত নেয় বিরোধীরা যতই দাবী করুক, মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরেই দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তারা যাবে না।[৮০] বিএনপি ৭ই নভেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করে। কিন্তু সভা স্থলে বোমা বিস্ফোরণের কারণে তা পণ্ড হয়ে গেলে সারা শহর জুড়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ব্যাপক ভাংচুরে লিপ্ত হয়। 'পল্টনের জনসভায় বেগম জিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে' এই অভিযোগ এনে বিএনপি ৯ ও ১০ই নভেম্বর ১৯৯৮-এ সারা দেশে ৪৮ ঘণ্টার লাগাতার হরতাল কর্মসূচী ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, ৭ই নভেম্বর রাজধানীর কমপক্ষে ৫০টি স্থানে বিএনপির ক্যাডাররা একই সময়ে কমান্ড স্টাইলে যানবাহন ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগে লিপ্ত হয়। ওই দিন রাতে গণভবনে আওয়ামী লীগ নীতি নির্ধারকদের বৈঠক বলা হয়, নতুন করে হরতাল ডাকার জন্য বিএনপি নিজেরাই সন্ত্রাস করেছে। হরতালের প্রথম দিনে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে রাজধানীতে ২জন নিহত হয়। বেগম জিয়ার প্রতি প্রধানমন্ত্রী খুনিদের রক্ষার জন্য হরতাল না দেওয়ার আহ্বান জানান। ১০ই নভেম্বর হরতালের দ্বিতীয় দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজি ও সংঘর্ষে দুই শতাধিক আহত হয়। অর্থমন্ত্রী এএমএস কিবরিয়া জানান, হরতালে জাতীয় অর্থনীতিতে দৈনিক ৩৮৬ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে।[৮১] ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ১১ই নভেম্বর ভোরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পরবর্তীকালে তা বাড়িয়ে ৬০ ঘণ্টা করা হলে হরতাল শেষ হয় ১১ই নভেম্বর সন্ধ্যায়। ৬০ ঘণ্টার এ হরতালে নিহত হয় ৬জন, আহত হয় ৩৫০জন, গ্রেফতার হয় ৭ শ' জন। ১৬ই নভেম্বর বিএনপিসহ সাতদল সংসদ অভিমুখে এক মিছিল বের করে। মিছিলপূর্ব সমাবেশে বেগম জিয়া বলেন, 'প্রয়োজনে লাগাতার হরতাল দিয়ে সরকারের পতন ঘটানো হবে।' পাবনার একটি শূন্য আসনে ১০ই ডিসেম্বর ১৯৯৮ অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনের সরকার দলীয় প্রার্থী জয়লাভ করায় বিএনপি এর প্রতিবাদে ১৩ই ডিসেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে।[৮২]

বিরোধী রাজনৈতিক জোট গঠন ও সরকার পতনের আন্দোলন

বিএনপি আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধে এবং একই সাথে সরকার পতনে আন্দোলন করে। ১৯৯৯ সাল ছিল রাজনৈতিক সংঘাত ও রাজনীতির মেরুকরণের বছর। বিরোধীরা চেয়েছিল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। সারাটা বছর তারা নানা ইস্যু তৈরী করে, লাগাতার হরতাল করে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সন্ত্রাসও বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য দল যেমন জাতীয় পার্টি বা জামায়াতও বিএনপির সঙ্গে জোট বাধে। এর মধ্যে চমক তেমন ছিল না। রাজনৈতিক কারণে জনজীবন, অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উপ-নির্বাচনগুলোতে বিরোধী দলসমূহ যোগ দেয় নি। সরকারের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ তুলে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার। বিরোধী দলসমূহ পার্লামেন্টের অধিবেশনসমূহও বর্জন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, রাজনীতি সম্পর্কে অনেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন যা একটি দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়। সে সময় অনেকে বলেছেন খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা যতদিন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকবেন ততদিন বাংলাদেশে রাজনীতি সুস্থির হবে না। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে, রাজনীতির মেরুকরণ সম্পন্ন হয় বছরের শেষে। বিষয়টি অপ্রত্যাশিত ছিল না কিন্তু নতুন চার দলীয় জোট যেমনভাবে একাত্মতা প্রকাশ করেছে এর আগে তেমনভাবে তারা তা করে নি। এর ফলে, স্বাধীনতার পক্ষের এবং বিপক্ষের শক্তি চিহ্নিত করার মধ্যে আর অস্পষ্টতা রইল না। এটি ইতিবাচক দিক। কারণ, এর আগে বিএনপি বা জাতীয় পার্টি নিজেদেরও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে দাবী করত। এরপর থেকে তো তারা আর সে দাবী করতে পারে না। ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সমর্থক বললে তাকে ধরে নেওয়া হয় আওয়ামী লীগের সমর্থক, সমর্থক না হলে বিরোধী।[৮৩] ৬ই জানুয়ারি ১৯৯৯ বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামের উদ্যোগে আন্দোলনের একটা অভিন্ন ও যৌথ ঘোষণা প্রদান করা হয়। আকস্মিকভাবে বেগম জিয়ার ভাষায়– 'পতিত স্বৈরাচার এরশাদ' এবং এরশাদের ভাষায়– 'স্বৈরিণী' খালেদা জিয়ার সাথে 'রাজাকার গোলাম আযম'-এর এই ঐক্যে রাজনৈতিক মহলে চমক সৃষ্টি করে। ২৩, ২৪ ও ২৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ পৌরসভা নির্বাচনের তারিখ দিয়ে নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত তফসিল ঘোষণা করে। বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচন বয়কট এবং প্রতিরোধের সংকল্প ব্যক্ত করে। ইতোমধ্যে বিরোধী তিন দলের জোটে ইসলামী ঐক্যজোট শামিল হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি চারটি দল ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশ করে ৯ ও ১০ই ফেব্রুয়ারি সারা দেশে ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। উপর্যুপরি এ সব হরতালে দেশের সাধারণ জনগণ বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এভাবে ঘন ঘন হরতাল দেওয়া বিরোধী দলীয় আন্দোলনে একটা রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হলে সচেতন মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এ সময় রাজনৈতিক সংকট নিরসনে দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা একটা উদ্যোগ নেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ বেগম জিয়া ব্যবসায়ীদের আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করেন।[৮৪] হরতালের পাশাপাশি চার বিরোধী দল আন্দোলনের এক নতুন কৌশল হিসেবে 'রোড মার্চ' নাম দিয়ে এক আন্তঃজেলা গাড়ী মিছিলের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৬ই মে

১৯৯৯-থেকে এই দলগুলো তাদের রোড মার্চ শুরু করে।[৮৫] ইতোমধ্যে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের জন্য বাংলাদেশের সড়ক করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া সম্পর্কিত এক সরকারী সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বিরোধী দলগুলো সরকারের এ সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে। বিরোধী দল ২রা আগস্ট ১৯৯৯ সকাল ৬টা থেকে পরদিন বেলা ১২টা পর্যন্ত একটানা ৩০ ঘণ্টা হরতাল ডাকে। ১২ই সেপ্টেম্বর বিরোধী দলগুলো সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করে। এতে ব্যাপক বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, কাঁদুনে গ্যাস, গুলিবর্ষণের ঘটনায় দেড় শতাধিক আহত হয়। এর প্রতিবাদে তারা ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে তিন দিনের হরতাল ডাকে। সন্ত্রাস সহিংসতার মধ্য দিয়ে এই হরতাল পালিত হয়। এ সময় দুই এমপি ডা. আলাউদ্দিন ও স্বপন মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায় নির্বাচন কমিশন তাদের সংসদ সদস্যপদ শূন্য ঘোষণা করে।[৮৬] যদিও পূর্বে স্পীকার রুলিং দিয়েছিল যে তাদের সংসদ সদস্য পদ শূন্য হয় নি। ২২শে জানুয়ারি ২০০০ ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, একদফাসহ সকল দাবী নিয়ে বিরোধী নেত্রীর সাথে তিনি আলোচনায় রাজী। পরদিন বিরোধী নেত্রী জবাবে বলেন, আওয়ামী লীগের সাথে আর আলোচনার সুযোগ নেই। অনতিবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে সরে যেতে হবে। ২৪শে জানুয়ারি ব্যবসায়ী সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'হরতাল বন্ধ হবে না। প্রয়োজনে দিনের পর দিন হরতাল ডাকা হবে। ব্যবসা নয়– আগে দেশ রক্ষা করতে হবে।' বেগম জিয়ার এ বক্তব্যে ব্যবসায়ীমহল হতাশ হন। ৩০শে জানুয়ারি সংসদে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) বিল পাস হয়। বিএনপি জাতীয় পার্টিসহ অন্যগুলো এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তাদের অভিযোগ বিরোধী দলকে নির্যাতন করার জন্যই এ আইন।[৮৭] এদিকে এ আইন বাতিলের দাবীতে বিএনপি ও তার সহযোগিরা ২রা এবং ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে ৩৬ ঘণ্টা লাগাতার হরতালের কর্মসূচী পালন করে।[৮৮] সরকারের পদত্যাগ এবং জননিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবীতে বিএনপিসহ সহযোগী দলগুলোর সংসদ সদস্যরা ৮ই ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে অনশন কর্মসূচী পালন করেন। এখানে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'জননিরাপত্তা আইন বাতিল না করা হলে হরতাল অবরোধের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হবে।' ১৩ই ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে চারদলের এক যৌথ সমাবেশে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানানো হয়।[৮৯] ৪ঠা জুন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। বিএনপিসহ তার সহযোগীরা উদ্বোধনী বৈঠক বর্জন করে। তারা অভিযোগ করে, অধিবেশনে তাদেরকে কথা বলতে দেওয়া হয় না। স্পীকার অধিবেশনে তার স্বাগত বক্তব্যে জানান, বিগত ২৮৭টি কর্মদিবসের মধ্যে বিরোধী দলীয় নেত্রী মাত্র ২৭ দিন সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলতে না দেওয়ার অপপ্রচার সঠিক নয়। সে সময় বিরোধী সংসদ সদস্যগণ সংসদ অধিবেশনে যোগদানে অবিরাম বিরত থাকার কারণে কারো করো সদস্যপদ বাতিল হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। নিজেদের মধ্যে বিস্তর আলাপ-আলোচনা শেষে চারদলের সংসদ সদস্যরা সংসদ সদস্যপদ ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। সে মতে, ১৯শে জুন

২০০০ খ্রিষ্টাব্দে তারা সংসদ অধিবেশনে প্রতীক অংশগ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এদিন তারা দল বেঁধে সংসদ ভবনে যান। কিন্তু গিয়ে দেখেন তার আগেই অধিবেশন মুলতুবী হয়ে গেছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিএনপির অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী অভিযোগ করেন, 'তাড়াহুড়া করে সংসদ অধিবেশন শেষ করা হয়েছে। যাতে তারা অধিবেশনে যোগ দিতে না পারে। পরদিন ২০শে জুন তারা ঠিক সময় মতো সংসদ ভবনে উপস্থিত হন। এর মধ্য দিয়ে ওই সব সদস্যের সংসদ সদস্যপদ বাতিলের ঝুঁকি দূর হয়। বিরোধীদলীয় নেত্রী পাঁচ মিনিটের এক বক্তব্যে বলেন, তাদের অনুপস্থিতিতে সংবিধান পরিবর্তনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা ঠেকানোর জন্যই তারা অধিবেশনে এসেছেন। এ সময় থেকে বিরোধী দলগুলো সরকার বিরোধী আন্দোলনে মারমুখো নীতি পরিহার করে খানিকটা নির্বাচনমুখী তৎপরতায় নিয়োজিত হয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নেমে যায় এবং বনানীতে একটি নির্বাচনী অফিসও খোলে। রাজপথের আন্দোলন কমিয়ে দিয়ে নির্বাচন নিয়ে কথা-বার্তা শুরু হলে চার দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি প্রশ্নে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এ সময় পারস্পারিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহ জোটের ঐক্যের গোড়া ধরেই নাড়া দেয়। অবশ্য বেগম জিয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঐক্য টিকে থাকে। তবে জোটবদ্ধ নির্বাচনে কে কত আসন পাবে বেগম জিয়া সুকৌশলে সে বিষয়টি উহ্য রাখতে সক্ষম হন।[৯০] তবে এরূপ পরিস্থিতিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম যথারীতি চলে এবং যথাসময়ে পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্তি হয়।

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং আইডি কার্ডের দাবীতে বিএনপির নেতৃত্বাধীন দলসমূহ ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। ৩রা অক্টোবর তারা আবার হরতাল ডাকে।[৯১] ৮ই মে ২০০০ আকস্মিকভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনা পদত্যাগ করেন। যদিও আগের বছরের মাঝামাঝি থেকে বিএনপিসহ চার দল প্রধান নির্বাচন কমিশারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে তার অধীনে আর কোনো নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নেয়। চার দল তার পদত্যাগের দাবীতে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও, হরতাল, বিক্ষোভসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে চিকিৎসার জন্য আবু হেনা বিদেশে যান। চিকিৎসা শেষে দেশে আসার পর হঠাৎ করে তিনি পদত্যাগ করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনার পদত্যাগ নতুন সংকটের সৃষ্টি করে। কারণ বিএনপিসহ চারদলের পক্ষ থেকে বলা হয়, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করতে হবে। এ অবস্থায় প্রাধানমন্ত্রী নতুন সিইসি নিয়োগ বিষয়ে আলোচনার জন্য বেগম জিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি দেন। চার দল প্রধানমন্ত্রীর ওই আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এ অবস্থার মধ্যে ২২শে মে সাবেক সচিব এম এ সাইদকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। চার দল এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং তারা নিয়োগ মানতে অস্বীকৃতি জানায়। ২৩শে মে নতুন সিইসি শপথ গ্রহণ করেন। [৯২]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা বিতর্ক

আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ১৫ই জুলাই ২০০১ যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছিল তার নিরপেক্ষতা নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছিল। এই তর্ক যুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দু'দলই শরীক হলেও এর প্রধান পক্ষ হল আওয়ামী লীগ। ১৫ই জুলাই দুপুর সাড়ে বারোটায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ ও শপথ অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারিত হলেও সেই নির্ধারিত সময় প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ হঠাৎ করে পিছিয়ে সন্ধ্যেবেলায় নিয়ে যায়।[৯৩] এভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শপথ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হওয়ার পর আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করেছিলেন, তাদের সরকার ক্ষমতায় কালে প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেভাবে ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা রদবদল করবে না ফলে নির্বাচনে তারা প্রশাসনের অনুকূল্য পাবে।[৯৪] কিন্তু নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পর ১৫ই জুলাই রাতেই প্রশাসন নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর জন্য ১৩জন সেক্রেটারীকে বদলী করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে আওয়ামী লীগ শিবিরে এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সেক্রেটারীদের বদলি করার মধ্য দিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা নতুন করে সাজানোর যে নীতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘোষণা করেছিল সেটার প্রবল বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ। এই বদলীর ব্যবস্থা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে না করে দুই এক দিন পর করলেও খুব বেশী অসুবিধা হতো না। কিন্তু তবু এই তাড়াহুড়া তাঁরা করেছেন তাঁদের নিজস্ব বিবেচনা প্রসূত কোনো কারণে। নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্যেই তাঁরা এই তাড়াহুড়ো করেছিলেন। বিরোধী দলের অভিযোগ, আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এমনভাবে প্রত্যেকটি এলাকায় হিসাব করে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার ও বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারীদের এবং সেই সঙ্গে সর্বস্তরের পুলিশ কর্মকর্তাদের সুবিধা মতো জায়গায় বদলী করে প্রশাসন ও পুলিশ ব্যবস্থার ওপর নিজেদের দলীয় নিয়ন্ত্রণ রাখার আয়োজন করেছিল যাতে নির্বাচনের সময় অন্য যে-কোনো দলের থেকে তাদের অবস্থান অনেক বেশী সুবিধাজনক থাকে।[৯৫]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের নিরপেক্ষতার প্রমাণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বদরুদ্দীন উমর এ সম্পর্কে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতার অর্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ দল বা দলীয় জোট এর জন্যে কোনো বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা না রাখা। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি এবং অন্যান্য দলের কোনোটিকেই প্রশাসনিকসহ অন্য কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা দান না করা। কাজেই ক্ষমতা গ্রহণের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রথম থেকেই যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজনে প্রশাসনিক রদবদলের কাজে হাত দিতে হবে এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।[৯৬]

এ সরকারের কাজই হল নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই সরকার সাধারণ প্রশাসন

থেকে নিয়ে সব রকম সরকারী প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্রকে কীভাবে ও কতখানি নিরপেক্ষভাবে ব্যবহারের উপযোগী করতে চেষ্টা করছে এবং সে ক্ষেত্রে কতখানি সক্ষম হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে তার সফলতা। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে জন্য যা প্রয়োজন সে অধিকার এই সরকারকে দেওয়া হয়েছে। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে সে সময় কথা বলেছিল। কিন্তু এই সমালোচনার ক্ষেত্রে বিএনপির বক্তব্য বিশেষ বোধগম্য নয়। তবে হয়ত তারা আওয়ামী লীগের সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দু'কথা বলেছিল কারণ অন্যথায় এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মনে হতে পারে তাদের প্রতি সহনুভূতিশীল। অথবা এ কাজ তারা করেছিল শুধু আওয়ামী লীগের সমালোচনার মুখে পড়ে যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে না নেয় সে জন্যে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।[৯৭]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পরেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দৃঢ়তার কারণে তা সম্ভব হয় নি। ক্রমেই সে সময়ে ধর্মের ব্যবহার রাজনীতিতে বাড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মের প্রতি দুর্বলতার কারণে জঙ্গীবাদের উত্থান হয়। নির্বাচনী আচরণবিধি ৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধণ করে তৈরী করা হয়। তাই পূর্বের আচরণবিধির সাথে খুব বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। নির্বাচন কমিশন কঠোরভাবে নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ করতে পারলে যে-কোনো সময় সুষ্ঠু নির্বাচন এই বিধির অধীনে অনুষ্ঠান করা সম্ভব। এবার নির্বাচন কমিশন নতুন পদক্ষেপ নেয় ভোটাদের সচেতন করার। আচরণবিধি প্রায় ৯ লাখ কপি সারা দেশে বিতরণ করেন। এই নির্বাচনেও কারচুপির অভিযোগ ওঠে।

এক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ব্যবসায়ী ৩৮.৬৭% নির্বাচিত হয় এবং ১৯৯৬ সালে ব্যবসায়ী ৪৩.৬৭% যা ১৯৯১ তুলনায় ৫% বেশী। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্বাচনে শঙ্কা না থাকায় নারী ভোটাগণ বেশী পরিমাণ ভোট প্রয়োগ করে।

গণতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠার পর আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে বিরোধী দলসমূহের সংসদ বর্জন করা একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বিএনপি সরকারের সময় আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করে। এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিএনপি সংসদ বর্জন করে। ফলে সংসদ থাকছে কিন্তু ক্রমেই তা সরকার দলীয় সংসদে পরিণত হচ্ছে। তবে শেখ হাসিনার সময় তুলনামূলকভাবে রাজনীতি স্থিতিশীল থাকায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লীগ চেষ্টা করেছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কিন্তু বিরোধী দলের অসহযোগিতার কারণে তারা পুরোপুরি সফল হতে পারে নি। ওই সময়ে জঙ্গীবাদের উত্থান হয় এবং এর সাথে বিএনপি ও জামায়াতের সংশ্লিষ্টতা আছে বলে সন্দেহ করা হয়। নির্বাচন নিয়ে সংসদে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সাথে সাথে তা বিতর্কের সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে নির্বাচিত সরকার হিসেবে এই সরকারেই সর্বপ্রথম পাঁচ বছরের পূরণ করে। আবার মেয়াদ শেষে কোনো রূপ সংঘাত ছাড়াই সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর করে । যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

[১] মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিনকাল*, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩০০

[২] এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিকভাবে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অর্থাৎ সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্তর্ভুক্তি হবার পর এটাই প্রথম সরকার।

[৩] *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩১শে মার্চ ১৯৯৬

[৪] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৪

[৫] সৈয়দ আতিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম ১৯৯৬ এবং ২০০১ : একটি বিশ্লেষণ*, (পি. এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ২৩০-২৩১

[৬] ecs.gov.bd/English/index.php

[৭] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৪৬

[৮] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৪৪

[৯] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশ ১৯৯৬ : রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৫

[১০] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৪৪

[১১] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৭৩

[১২] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৬৯৫

[১৩] *আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৯৬*

[১৪] *প্রাগুক্ত*

[১৫] *প্রাগুক্ত*

[১৬] *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪

[১৭] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৬৯৫

[১৮] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬৩

[১৯] এ এস এম সামছুল আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১*, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যাণ্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৭৭৩

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭৩-৭৭৪

[২১] *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৬২

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

[২৪] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৪৪

[২৫] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৩০১

[২৬] *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৪৯-৫০

[২৭] তারিক হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৮১

[২৮] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৪৪

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪
[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫
[৩১] *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৬৪
[৩২] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৩০২-৩০৩
[৩৩] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৪৫
[৩৪] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৬৯৫
[৩৫] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৩০৩
[৩৬] *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৬৪
[৩৭] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৪৫
[৩৮] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৩০৫
[৩৯] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৪৪
[৪০] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৪৫
[৪১] Abul Fazl Haq, *The Ninth Parliament Election:A Socio-Political Analysis*, 2009
[৪২] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৪৬
[৪৩] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৩০৭
[৪৪] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৬৯৫
[৪৫] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৩০৭
[৪৬] *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, পৃ. ৬৯৫
[৪৭] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৪৬
[৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
[৪৯]`No pressing issue of national importance was reflected from such endeavours as treasury bench member through their passive queries, only highlighted success stories of the ruling party. Prime Minister's reply to the questions of the opposition MPs,as such, did not prove the transparency of the government's crucial policies in any way.'
Al Masud Hasanuzzaman, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, UPL, Dhaka, 1998, PP. 119-120
[৫০]*বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৪৭-৪৮
[৫১] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৩০৮
[৫২] *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৫৬
[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[৫৪] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৪৮
[৫৫] মোঃ এখলাছুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র : একটি বিশ্লেষণ*, (এম.ফিল অভিসন্দর্ভ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০
[৫৬] http:// data worldbank.org/indicator/NY.GDP.MK…
[৫৭] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স* **১৯৯১-২০০৭**, পৃ. ৮৬

[৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪
[৫৯] *প্রাগুক্ত*
[৬০] মুনতাসীর মামুন, *নতুন শতকের রাজনীতি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১২৫-১২৬
[৬১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬
[৬২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬
[৬৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭
[৬৪] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০১
[৬৫] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৮ই সেপ্টেম্বন ২০০১
[৬৬] তালুকদার মনিরুজ্জামান, *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ*, শুভ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩,পৃ. ৮৪
[৬৭] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রক্রিয়া ও ঐকমত্যের উপাদান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৩
[৬৮] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০১
[৬৯] মো. কামাল উদ্দিন, *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, শৈলী প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১০, পৃ. ১৮৩
[৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪
[৭১] *নতুন শতকের রাজনীতি*, পৃ. ৩০০
[৭২] আবুল বারাকাত, *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত "ধর্ম ও রাজনীতি : দক্ষিণ এশিয়া" শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে রচিত, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৯-২০
[৭৩] *রাজনীতির তিনকাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩
[৭৪] তারেক শামসুর রেহমান, *গণতন্ত্রের সংকট প্রসঙ্গে*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১২৩-১২৪
[৭৫] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৩১৩-৩১৪
[৭৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৪-৩১৮
[৭৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮-৩১৯
[৭৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯
[৭৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৩
[৮০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৩
[৮১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪-৩২৫
[৮২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৫
[৮৩] *নতুন শতকের রাজনীতি*, পৃ. ১৩৮
[৮৪] *রাজনীতির তিনকাল*, পৃ. ৩২৬-৩২৭
[৮৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯
[৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০-৩৩১

[৮৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫
[৮৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪
[৮৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫
[৯০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯
[৯১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩১
[৯২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৭
[৯৩] বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণ*তন্ত্র, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১১৭
[৯৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[৯৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮
[৯৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮-১১৯
[৯৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

২০০১ এর নির্বাচন ও খালেদা জিয়া সরকার

২০০১ সালের ১৫ই জুলাই আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সংবিধানের বিধান অনুসারে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। দেশের তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিচারপতি লতিফুর রহমান এবং তাঁর নেতৃত্বে ১০জন উপদেষ্টা পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সক্রিয় হন। এভাবে অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।[১] এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ইতিহাসে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। বিচারপতি লতিফুর রহমানের সরকার বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিভিন্ন কারণে বিচারপতি লতিফুর রহমানের স্বল্প শাসনকাল বাংলাদেশে আলোচিত-সমালোচিত। সরকার গঠিত হওয়ার আগেই, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দশজন সদস্যকে নিয়োগ না দিয়েই তিনি ১৩জন সচিবকে বদলী অথবা প্রত্যাহার করেন। এর ফলে একটি সুস্পষ্ট বার্তা দেশে ছড়িয়ে পড়ে যে 'লতিফুর রহমানের সরকার আওয়ামী লীগ বিরোধী'। শপথের মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যে তিনি এ কাজ করেন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে লতিফুর রহমানের মনোনয়ন থেকে শুরু করে তার নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণা বাংলাদেশে আদৌ কার্যকর কিনা তা নিয়ে ২০০১ সালে প্রশ্ন উঠেছিল। কেননা একটি বিশেষ দল বা জোটকে সাহায্য করার অভিযোগ ওঠে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে। আবার প্রধান বিচারপতি হিসেবে লতিফুর রহমানের শপথ গ্রহণ তৎকালীন বিরোধী দল বিএনপি এই বলে প্রত্যাখান করে যে, ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে নির্বাচন প্রভাবিত করার লক্ষ্যে লতিফুর রহমানকে প্রধান বিচারপতি করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই দায়িত্বের বাইরে নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রেও অনেক হস্তক্ষেপ করে। তিনি নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজান, জেলা-উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন আমলাদের গণহারে বদলী করেন। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের উদ্দেশ্যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তার সময় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। নির্বাচনের পূর্বে দেশব্যাপী সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

নির্বাচনী প্রচারণা ও ইশতেহার

বিএনপি অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৭ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে ইশতেহার ঘোষণা করে। ইশতেহারে বলা হয়, বিএনপি সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনের শাসন এবং জনগণের ইচ্ছার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। বিএনপি মনে করে যে, বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্ব কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গতানুগতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদের সদ্ ব্যবহার, সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা এবং

জনগণের সামগ্রিক ও স্থায়ী কল্যাণসাধণও এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সরকার গঠনে সক্ষম হলে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের প্রথম কাজ হবে দলমত নির্বিশেষে সকলের সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে জনগণের জান-মাল ও সম্ভ্রম রক্ষা করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে যথার্থই প্রশিক্ষিত, দক্ষ, শক্তিশালী ও কার্যকর করা হবে। বিএনপি দুর্নীতির মুলোৎপাটনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে। এ লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে। দুর্নীতি দমন বিভাগকে পুনর্গঠন করে দুর্নীতি দমন কমিশন করে একটি সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। সকলের জন্য বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও উন্নয়নসাধন করা হবে। এ লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং আহত, অসহায় ও দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য ও আর্থিক দৈন্য নিরসনে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও দুর্যোগ মোকাবেলার মতো জাতীয় তৎপতায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পৃথক মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। বিশেষ করে রেলপথ, সড়ক, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ তথ্যপ্রযুক্তি, আভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল ও বন্দর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রাধান্য পাবে।[২]

অপর দিকে ৯ই সেপ্টেম্বর ২০০১-এ আওয়ামী লীগ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় ইশতেহার ঘোষণার শুরুতেই বলেন, ক্ষমতায় ৫ বছর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ না পেয়েও ১৯৯৬ সালের দেওয়া নির্বাচনী ইশতেহারের বেশীর ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী যা ওয়াদা করে তা রক্ষা করে। জনগণের চাহিদা ও সংবিধানকে সামনে রেখে তৈরী করা এই ইশতেহারেরও পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে। ২০০১-এর নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর ওপর বেশী জোর দেয়। এ ছাড়া বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, ঘরে ফেরা কর্মসূচী, একটি বাড়ি একটি খামার, ভিজিএফ কার্ড, আশ্রয়ণ, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করে। ইশতেহারে নতুন যেসব অঙ্গীকার করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– সরকারী চাকরির বয়সসীমা ৬০ বছর, মেয়েদের ডিগ্রি পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, ২০০৩ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া, বেসরকারী শিক্ষকদের ১০০ ভাগ বেতন-ভাতা প্রদান ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তন। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কাউন্সিল গঠন, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০টি থেকে ৬০টি করা এবং সরাসরি নির্বাচনে ব্যবস্থা, দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যেক থানায় কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং কুরআন ও সুন্নাহ্ পরিপন্থী কোনো আইন না করা অঙ্গীকার করে। এ ছাড়াও শেখ হাসিনা ইশতেহার পাঠ করার সময় বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ৫জন মহিলা টেকনোক্রেট মন্ত্রী নেবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাস বন্ধ করা হবে। এ ছাড়াও 'ন্যায়পাল' প্রতিষ্ঠা ও বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা দেওয়ার ওয়াদা

করে।[৩] আওয়ামী লীগ তার ইশতেহারে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, কার্যকর জাতীয় সংসদ এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতা মূলক সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়। একটি আধুনিক, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত এবং দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করার প্রতিশ্রুতি দেয়।[৪]

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জোটবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করে এবং জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) এবং ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে নির্বাচনী আঁতাতসহ চারদলীয় জোট গঠন করে। জোটের শরিকগণ প্রার্থিতার ক্ষেত্রে সমঝোতা করে নিজস্ব ইশতেহার প্রকাশ করে। নির্বাচনী ইশতেহারে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এভাবে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র বিনির্মাণ, দুর্নীতি হ্রাস, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, সরকারের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন, পল্লী উন্নয়ন, নারী অধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনী অঙ্গীকার করে।[৫]

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন ও নির্বাচন

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন সূচিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের স্বতঃপ্রবৃত্ত নিবন্ধিকরণ; নির্বাচন দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠন; নির্বাচনী ব্যয় পাঁচ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ; নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রমাণিত অপরাধীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের জন্য অযোগ্য ঘোষণা; নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়নে ক্ষমতা প্রদান; ব্যাংকের ঋণখেলাপীদের প্রার্থিতা বাতিলকরণ; নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত অভিযুক্ত কর্মকর্তাগণের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গাফিলতিকরণের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রত্যাহারকরণ; নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহের ব্যাংক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ; পোলিং এজেন্ট ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বতঃপ্রবৃত্ত আইডি কার্ড প্রণয়ন; নির্বাচনী অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান ইত্যাদি।[৬] নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানসহ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু রাখতে দেশের সর্বত্র নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনিক পরিমণ্ডলেও ব্যাপকভিত্তিক রদবদল করা হয়। ১৩জন সচিবকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলীসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের পদ পরিবর্তন করা হয়।[৭] একটি কমিটি গঠন করে বাংলাদেশ সচিবালয়ের সচিব থেকে শুরু করে সহকারী সচিব, বিভাগীয় কমিশনার থেকে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ে ইউএনও ও অন্যান্য কর্মকর্তা পর্যায়ে ব্যাপক রদবদল ও পরিবর্তনসাধন করা হয়।[৮]

১লা অক্টোবর ২০০১ অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৯] সংসদের তিন শ' আসনের জন্য এ নির্বাচনের ৫৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। প্রার্থী এবং ভোটারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯৩৯ এবং ৭ কোটি ৫২ লক্ষেরও অধিক। [১০]

সারণি ১.১৩ : অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[১১]

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৯৩
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬২
জামায়াতে ইসলামী	১৭
জাতীয় পার্টি (নাজিউর)	৪
ইসলামী ঐক্যজোট	২
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	১৪
জাতীয় পার্টি (মুঞ্জু)	১
কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগ	১
স্বতন্ত্র	৬
মোট	৩০০

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক অসংখ্য নির্বাচন পর্যবেক্ষক ওই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে বিএনপি ২৫২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৯৩ আসনে বিজয়ী হয় এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪০.৮৬ ভাগ লাভ করে। আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং ৪০.২১ শতাংশ ভোটসহ ৬২টি আসন পায়। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ছিল ৩১ জন এবং এ দল ৪.২৯ শতাংশ ভোট ও ১৭টি আসন লাভ করে। জাতীয় পার্টির ২৮১ জন প্রার্থীর ১৪ জন বিজয়ী হয় এবং এ দলটি ৭.২৬ শতাংশ ভোট পায়। ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৭ এবং এ দল ২টি আসন ও ০.৮৬ শতাংশ ভোট লাভ করে। জাতীয় পার্টি (নাজিউর), জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ও কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রার্থী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১, ১৪০, ৩৯। এ তিনটি দল যথাক্রমে ৪টি, ১টি ও ১টি আসনে বিজয়ী হয় এবং ১.১২, ০.৪৪ এবং ০.৪৭ শতাংশ ভোট লাভ করে। এ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ৪৮৬জন এবং এর মধ্যে ৬জন জয় লাভে সক্ষম হন এবং ৪.০৬ শতাংশ ভোট পান। নির্বাচনে বিএনপি এবং চারদলীয় জোট ২২০টি আসনে বিজয়ী হয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে দ্বিতীয় বৃহত্তম সংসদীয় দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে 'স্থূল কারচুপি'র অভিযোগ এনে ফলাফল গ্রহণে অস্বীকার করে। আওয়ামী লীগ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এ জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে অভিযুক্ত করেন। তবে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পর্যবেক্ষক ফলাফলের ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য প্রকাশ করেন। জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় চারদলীয় জোটকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাদের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে অষ্টম জাতীয় সংসদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।[১২]

অষ্টম জাতীয় সংসদে সংসদ সংসদদের পেশার বিবরণ

বিভিন্ন পেশার লোকজন ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয় লাভ করতে সক্ষম হয় তাদের মধ্যে রয়েছে; সামরিক আমলা ৫%, বেসামরিক আমলা ৩%, ব্যবসায়ী ৫৬.৬৭%, আইনজীবী ১১%, রাজনীতিবিদ ৮.৬৬% , অন্যান্য ৫%।[১৩] লক্ষণীয় যে, গণতান্ত্রিক যুগের সূচনার পর থেকে সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হিসেবে রাজনীতিবিদদের হার অন্যান্য পেশার তুলনায় কম। কারণ নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার সময় ব্যবসায়ী, আইনজীবী, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়।

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা

২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিপূর্ণভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেও নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় কয়েক শ' মানুষ নিহত হয়, যারা মূলত সংখ্যালঘু কিংবা আওয়ামী ঘরানার নেতা-কর্মী। এই নির্বাচনের পর দেশ এক বিভৎস সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে। যা কেবল হত্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সংখ্যালঘু পরিবারে ধর্ষণ পর্যন্ত করা হয়েছিল। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার গঠন করে। সরকার গঠন করে বিএনপি সহিংসতা বন্ধের উদ্যোগ নেয়। বিএনপি নির্বাচনী সংঘাতের দায় দেয় লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর।

সংসদীয় কার্যক্রম

অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয় ২০০১ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে। উদ্বোধনী দিনে সংসদের স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার স্পীকার পদে এবং আখতার হামিদ সিদ্দিকী ডেপুটি স্পীকার পদে আসীন হন। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের প্রধান শেখ হাসিনা সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা এবং একই দলের মোঃ আব্দুল হামিদ বিরোধীদলীয় উপনেতা হন। জাতীয় সংসদ একজন চিপ হুইপ ও ছয়জন হুইপ নির্বাচন করে। ট্রেজারি বেঞ্চের উপনেতা হিসেবে প্রফেসর এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তবে তাঁকেই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দিলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উক্ত পদে নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ ৮ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বর্জন করলেও দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেয়। তবে স্পীকারের পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদ করে অধিবেশন বয়কট করে। অষ্টম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ যা পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করতে সক্ষম হয় এবং ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এ সংসদ সর্বমোট ২৩টি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং ৩৭৩ কার্যদিবসে ১৮৫টি আইন পাস করে। জাতীয় সংসদের ১১তম অধিবেশনে সর্বোচ্চ ২১টি বিল অনুমোদন করা হয়। পঞ্চম এবং সপ্তম সংসদের তুলনায় এ সংসদে অধ্যাদেশ অনুমোদনের হার অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম ছিল। তবে সরকারী বিল এবং অধ্যাদেশ অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় ব্যাপক বিতর্ক এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির পরীক্ষণ ও

সংশোধনী প্রদান লক্ষণীয় ছিল না। সংসদীয় কমিটি গঠনের পর সংশ্লিষ্ট বিলসমূহ যথাযথভাবে কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং পাসকৃত উল্লেখযোগ্য আইনগুলোর মধ্যে ছিল স্পিডি ট্রায়াল অ্যাক্ট, কর ন্যায়পাল নিয়োগ, অর্থঋণ কোর্ট অ্যাক্ট, অ্যান্টি করাপশন অ্যাক্ট, মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, এসিড কন্ট্রোল অ্যাক্ট ইত্যাদি। অষ্টম জাতীয় সংসদে সংবিধানের চৌদ্দতম সংশোধনী পাস করে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা হয়।[১৪] সংসদীয় তদারকির ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যবর্গ বিভিন্ন সংসদীয় মেকানিজম বা অস্ত্র ব্যবহার করেন। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি মোতাবেক ৭১ বিধি অনুযায়ী ৮৫২১টি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ প্রদান করা হয় যার মধ্যে ৫১৬টি পেশ করা হলেও ৩৫০টির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ৬৮ বিধি বলে ২১৫টি জনগুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে স্বল্প সময়ের আলোচনার নোটিশের পাঁচটি গৃহীত হয়। কার্যপ্রণালী বিধির ৬০ বিধিতে ৮টি অর্ধঘণ্টা আলোচনার নোটিশের ২টি বিবেচিত হয়। সংসদের ফ্লোরে মুলতুবী প্রস্তাবের (বিধি ৬১) ওপর ১৭৬৫টি নোটিশ প্রদান করা হলেও এর কোনোটিই আলোচনার জন্য গৃহীত হয় নি। প্রশ্নোত্তর পর্বে ট্রেজারি বেঞ্চের সংসদ সদস্যগণ প্রাধান্য বিস্তার অব্যাহত রাখে। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর ১১২টি প্রশ্নের নব্বই ভাগেরও বেশী সরকারী দল থেকে উত্থাপন করা হয়। সরকারী এবং বিরোধী দলের চলমান বৈরী সম্পর্কের প্রকাশ সংসদীয় কাঠামোতেও লক্ষণীয় হয় এবং বরাবরের মতো বিরোধী দলের অসহযোগিতা, সরকারী দলের অসহিষ্ণুতা ও বিরোধী সংসদ সদস্যগণকে সংসদে কথা না বলতে দেওয়ার পারস্পরিক অভিযোগ আনা হয়। এভাবে বিরোধী দলের দেশের বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলার ঘটনাসহ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মুলতুবী প্রস্তাবের কোনোটিই গ্রাহ্য করা হয় নি। বিরোধী দলও প্রায়শ সংসদের ফ্লোর থেকে ওয়াকআউট করে এবং উভয় পক্ষ অনেক ক্ষেত্রে অনির্ধারিত রাজনৈতিক বিতর্ক ও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। বিরোধী দল লাগাতারভাবে সংসদের অধিবেশন বয়কট করে এবং ২৩টি অধিবেশনের মধ্যে মাত্র ৯টিতে অংশ নেয়। অষ্টম জাতীয় সংসদের মূল্যবান সংসদীয় ঘণ্টার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় নি বা অপব্যবহার হয়েছে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ৩৭৩ কার্যদিবসের ১৭৮টিতে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং অনুপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে বিরোধী দলের নেত্রী ৩২৮ কার্যদিবস জাতীয় সংসদে যোগ দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। এ সংসদে কোরাম সঙ্কট ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং কোরাম সঙ্কট ২২৭ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয় যা মোট ২৩টি সংসদীয় অধিবেশনের এক-পঞ্চমাংশ ছিল।[১৫] ২৮শে অক্টোবর ২০০১ থেকে ২৭শে অক্টোবর ২০০৬ সাল পর্যন্ত অষ্টম জাতীয় সংসদের মোট ৩৭৩ কর্মদিবসের মধ্যে বিরোধী দল ৯৫ বার ওয়াকআউট করে।[১৬]

খালেদা জিয়া সরকারের অর্থনৈতিক সাফল্য

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পরে অর্থনীতিতে একটা স্থিতিশীলতা আসে এবং একই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বৃদ্ধি পায়। তার ধারাবাহিকতা পরবর্তী সরকারগুলো ধরে রাখে এবং অর্থনীতিকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দ্বার করায়। ২০০২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জিডিপির একটা চিত্র তুলে ধরা হল : ২০০২ সালে ৪.৪%, ২০০৩ সালে ৫.৩%, ২০০৪ সালে ৬.৩%, ২০০৫

সালে ৬.৩%, ২০০৬ সালে ৬.৬% হারে প্রবৃদ্ধি হয়।[১৭] ২০০১ সালের পর ২০০২ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হঠাৎ করে ৫ এর নিচে নেমে গেলেও পরবর্তীকালে সরকার তা ৬ এর উপর তুলে আনতে সক্ষম হয়। সুতরাং ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রবৃদ্ধির চিত্র ঊর্ধ্বমুখী। ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উচ্চতর প্রবৃদ্ধির কারণে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৩ শতাংশে উন্নীত হয়– যা তখন পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রের যে নতুন সূচনা হয়েছিল। তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি লক্ষ্য করি। এ ছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচী এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়।[১৮] এগুলো সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক।

অর্থনীতিতে বিএনপি সরকার আরও যে সাফল্যগুলো লাভ করে তা হল–

১. দারিদ্র্যের হার ৪৯% থেকে পাঁচ বছরে ৪০ এ নামিয়ে আনে। অর্থাৎ ৯% দারিদ্র্য হ্রাস করতে সক্ষম হয়।
২. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ওঠে ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। যা ওই সময় পর্যন্ত একটি নতুন রেকর্ড।
৩. বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ অনেক কমিয়ে আনা হয়।
৪. শিল্প ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ১০%-এর বেশী হয়েছিল, যা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ এবং কৃষি ক্ষেত্রে ৪.৩৮% প্রবৃদ্ধি হয়েছিল।
৫. রফতানির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ছিল ২২% এবং তার হার ছিল ক্রমবর্ধমান।

এই সব উন্নয়ন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে সম্ভব হয়েছিল।

খালেদা জিয়া সরকারের ব্যর্থতা

সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব দেশ পরিচালনা করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। যে-কোনো সঙ্কট তৈরী হলে জোট সরকার তার দোষ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে 'বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র' বলে। কিন্তু বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র উন্মোচন করতে সরকার ব্যর্থ হয়। বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত, অসহায় এবং ক্ষুব্ধ দেশবাসী। বিদ্যুতের দাবীতে অতীতে জনরোষ এতটা উচ্চকিত হয় নি। বিদ্যুৎ প্রত্যাশী মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে সরকার চালিয়েছে দমন-পীড়ন নীতি।[১৯] ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কানসাটে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং মিটার ভাড়া কমানোর দাবিতে আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশ গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে দু'জনের মৃত্যু হয় এবং আহত হয় প্রায় ১৫জন। এপ্রিলে একই স্থানে আন্দোলনে নিহত হয় ৮জন এবং আহত হয় ৫০জন।[২০] অথচ বিদ্যুৎ-পানি সঙ্কট সুরাহা করা জোট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। সরকার

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি করে, সার সঙ্কট, নিয়ন্ত্রণহীণ বাজার, মুদ্রা বাজারে অস্থিতিশীলতা, মুখ থুবড়ে পড়ে রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা, প্রশাসনে দলীয়করণ নেতিবাচক সংকট সৃষ্টি হয়েছে চারদিকে। আর দুর্নীতি চলছিল লাগামহীনভাবে। নানা চাপের মুখে 'দুর্নীতি কমিশন'কে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দিয়ে জরাগ্রস্ত করে।[২১] ২০০৮ সালের ইশতেহারে বিএনপি বলেছেন, সমাজের সর্বস্তরে এবং সব শ্রেণীর মধ্যে দুর্নীতি প্রসার ঘটেছে। বিএনপি নির্বাচিত হলে দুর্নীতি দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[২২] অথচ পূর্ববতী সরকার তাদেরই ছিল। ওই সরকারের সময় বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বিএনপি জামায়াত জোটের শাসন আমলে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার উপর ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নারীনেত্রী আইভি রহমানসহ ১৪জন নেতা-কর্মী নিহত হয়। সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য এএমএস কিবরিয়া, আহসানউল্লাহ মাস্টার, অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমামসহ অসংখ্য রাজনৈতিক ও নিরীহ মানুষ সে সময়ে নিহত হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ লাখ লাখ লীগ সমর্থক রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের পাঁচ বছরে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। বিএনপি জামায়াত জোট দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা করে ক্ষমতায় এলেও তাদের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, নেতা-কর্মী এবং দলীয় প্রশাসনের অকল্পনীয় দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, লুটপাট, চাঁদাবাজি প্রভৃতির ফলে টিআইবি পরপর পাঁচবার বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে। যা কিনা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি নেগেটিভ রেকর্ড। সরকারের দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার ফলে উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকট হয়ে ওঠে অসহনীয়। পাঁচ বছরে জোট সরকার কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে নি। একমাত্র বিদ্যুৎ খাতেই ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাট ও অপব্যয় হয়েছে।[২৩] বাট্রান্ড রাসেল তাঁর বিখ্যাত 'Political Ideals' গ্রন্থে রাজনীতিকে দু'টি ধারায় ভাগ করেছেন। একটি সৃজনশীল আবেগের ধারা (creative inpulses), অপরটি লুটেরার আবেগের ধারা। আমাদের দেশের রাজনীতিকে বার্ট্রান্ড রাসেলের এ রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে বিচার করা যেতে পারে। তার এ রাজনৈতিক দর্শন সব দেশে সব সময়ের জন্যই প্রযোজ্য, তবে স্থান ও কালভেদে কখনও কোথাও তা কম-বেশী অনুভূত হয়। আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছি আমাদের রাজনীতি কোনো ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে– সৃজনশীল আবেগের ধারায়, না লুটেরার আবেগের ধারায়?

ধর্মীয় জঙ্গীবাদের উত্থান

চারদলীয় জোট সরকারের সময় জঙ্গীবাদের ব্যাপক উত্থান হয়। ২০০১-২০০৫ সময়কালে বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীল এক চিত্র এবং বিশ্লেষণে তাদের ধর্মীয় উগ্রবাদীদের কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার আসীন থাকলে এ ধরনের সন্ত্রাসী প্রবণতা হ্রাস পায়।

২. ডানপন্থী বা ধর্মনির্ভর দলের সরকার ক্ষমতাসীন হলে বিস্তার ঘটে এদের সন্ত্রাসী তৎপরতা।
৩. তাদের এ অপতৎপরতা বাধাগ্রস্ত না হলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ক্ষমতার ভাগাভাগিতে তাদের ভূমিকা না থাকলেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কোনো সরকার যদি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়, উগ্রবাদীরা তখন তাদের 'শক্তি সামর্থকে শাণিত করে'।

ডানপন্থীরা ক্ষমতার অংশীদার হয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দেশকে ধর্মীয় উন্মাদনার দিকে ধাবিত করে। যা দেশকে করে অস্থিতিশীল এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আঘাত হানে।

সারণি ১.১৪ : বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ধর্মীয় উগ্রবাদীদের বড় ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড : ২০০১ থেকে[২৪]

ঘটনার তারিখ	**লক্ষ্যবস্তু মাত্রা/প্রকৃতি এবং স্থান**	**প্রত্যক্ষ ক্ষতি**
১৬শে নভেম্বর ২০০১	হিন্দু শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে হত্যা	নিহত
২১শে এপ্রিল ২০০২	বৌদ্ধ ভিক্ষু মাহাথেরো হত্যা	নিহত
৭ই ডিসেম্বর ২০০২	৪টি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ, ময়মনসিংহ	নিহত ২৭, আহত ২৯৮
১৭ই জানুয়ারি ২০০৩	সুফী সমাধিতে বোমা বিস্ফোরণ, শখিপুর, টাঙ্গাইল	নিহত ৭, আহত ২৬
১২ই জানুয়ারি ২০০৪	হযরত শাহজালাল মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, সিলেট	নিহত ৫, আহত ৫২
২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০০৪	অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	গুরুতর আহত এবং পরবর্তীকালে মৃত্যু
২রা এপ্রিল ২০০৪	১০ ট্রাক অস্ত্রবাহী জাহাজ, চট্টগ্রাম বন্দর ২০০০ অটোমেটিক/ সেমি অটোমেটিক রাইফেল, ৪০টি রকেট চালিত গ্রেনেড, ২৫,০০০ হ্যান্ড গ্রেনেড, ১.৮ মিলিয়ন রাউন্ড ছোট বড় গুলি ও বারুদ।	
২১শে মে ২০০৪	হযরত শাহজালালের মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, সিলেট	নিহত ৩, ব্রিটিশ হাই কমিশনারসহ আহত ৬৫
২১শে আগস্ট ২০০৪	আওয়ামী লীগের (শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে) জনসভায় গ্রেনেড হামলা	নিহত ২৪, আহত ৫০৩
২৭শে জানুয়ারি২০০৫	বিরোধী দলের (আওয়ামী লীগ) জনসভায় গ্রেনেড হামলা	সাবেক অর্থমন্ত্রী এসএএমএস কিবরিয়াসহ নিহত ৫

১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০০৫	এনজিও (ব্র্যাক) অফিসে বোমা হামলা, রামপুর, নওগাঁ	-
২০০৩-২০০৫	বাংলা ভাই কর্তৃক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত (জেএমপি), উত্তর বাংলা	নিহত ৩৫, আহত ১২৩
১৭ই আগস্ট ২০০৫	৬৩ জেলায় একই সাথে বোমা হামলা	নিহত ২, আহত কমপক্ষে ১০০
৩রা অক্টোবর ২০০৫	৩ টা আদালত ভবনে বোমা হামলা (চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম)	নিহত ২, আহত ৩৯
১৪ই নভেম্বর ২০০৫	সরকারী আবাসিক এলাকায় বোমা হামলা, ঝালকাঠি	নিহত ২, আহত ৪
২৯শে ডিসেম্বর ২০০৫	আইনজীবী ভবনে বোমা হামলা, গাজীপুর	নিহত ১০, আহত ২২০
২৯শে ডিসেম্বর ২০০৫	পুলিশবক্সে বোমা হামলা, চট্টগ্রাম	নিহত ৩, আহত ২৫
১লা ডিসেম্বর ২০০৫	জেলা প্রশাসক অফিসে বোমা হামলা, গাজীপুর	নিহত ১, আহত ৫০
৮ই ডিসেম্বর ২০০৫	উদীচী অফিসে বোমা বিস্ফোরণ, নেত্রকোণা	নিহত ৮, আহত ১০০

বেগম খালেদা জিয়ার ৫ বছরের শাসনামলে দেশে জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটে। এ সময়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের মধ্যে ঝালকাঠিতে দুই বিচারক হত্যা মামলায় জেএমবির আধ্যাত্মিক নেতা শায়ক আব্দুর রহমান ও অপারেশন কমান্ডার সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাইসহ ৭ জঙ্গীর মৃত্যুদণ্ডের রায় ঝালকাঠির অতিরিক্ত দায়রা জজ রেজা তারিক আহমদ কর্তৃক ২৯শে মে, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষণা অন্যতম। ৩১শে অক্টোবর, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে ঐ রায় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বহাল রাখা হয়। পরবর্তীকালে শায়খ আব্দুর রহমান, সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাই, সামরিক কমান্ডার মোঃ আতাউর রহমান ওরফে তারিক সানি ইবনে আব্দুল্লাহ, মজলিশে শূরা সদস্য আবদুল আউয়াল ওরফে আরাফাত ওরফে সামাদ ওরফে আসিক, মোঃ ফারুক হোসেন খান ওরফে ফারুক খালেদ সাইফুল্লাহ ওরফে আমজাদ এবং নিহত দুই বিচারকের ওপর বোমা হামলাকারী মোঃ ইফতেখার হাসান ওরফে আরিফদের মৃত্যুদণ্ড বিভিন্ন জেলখানায় ফাঁসির মাধ্যমে কার্যকর করা হয়।

সরকার পতনের আন্দোলন ঘোষণা

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "গণ-অভ্যুত্থান ছাড়া এ ব্যর্থ সরকারকে হটানো যাবে না।"[২৫] এর পেছনে বিরোধী দল নেত্রী শেখ হাসিনার যুক্তি হচ্ছে, ওই সরকারের আমলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, সরকার

আদমজী শ্রমিকদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে মিল বন্ধ করে হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসিয়েছে। তাঁর মতে, স্কুটার শ্রমিকদেরও পথে বসায় ওই সরকার। সুতরাং সরকারকে উৎখাত করতে গণ-অভ্যুত্থান ছাড়া কোনো বিকল্প পথ ছিল না। দেশের বিরোধীদলীয় নেত্রী, যিনি একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীও বটে, তিনি যখন এ ধরনের বক্তব্য দেন, তখন বিষয়টিকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।[২৬] ২০০১ থেকে ২০০৬ মেয়াদের প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ চারদলীয় জোট সরকারকে আলটিমেটাম দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘোষণা দেয়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ৩০ই এপ্রিল ২০০৩-এর মধ্যে চারদলীয় জোট সরকারের পতনের আলটিমেটাম ঘোষণা করেন।[২৭] বিরোধী দলের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে একটা প্রশ্ন সবার মনে জাগে সরকার পরিবর্তনের মাপ কাঠি কি আন্দোলন? একটি সরকার ব্যর্থ হতেই পারে। সরকার পরিচালনায় সেই সরকার অদক্ষ হতে পারে। তাদের প্রণীত অর্থনৈতিক নীতি ব্যর্থতায় পরিণত হতে পারে। এটা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। কেননা সরকারের ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করেই সরকারের পরিবর্তন ঘটে। কোনো সরকার যদি ভালো কাজ করে থাকে, তাহলে সেই সরকারের প্রতি জনসমর্থন থাকবেই। আর জনসমর্থন থাকার অর্থ হচ্ছে, পুনরায় তাদেরকে সরকার চালানো সুযোগ দেওয়া। গণতন্ত্রের এটাই কথা। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক সমাজে এভাবেই সরকার পরিবর্তন হয়। সেখানে বছরের পর বছর ধরে একই দল বা জোট ক্ষমতায় থেকেছে জনসমর্থন নিয়ে। সেই সরকারকে উৎখাতের জন্য গণ-অভ্যুত্থানের ডাক দেওয়া হয় না। যেমন বলা যেতে পারে জার্মানীর সাবেক চ্যান্সেলর হেলমুট কোলের কথা। কোল ক্ষমতায় ছিলেন ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর। এই ১৬ বছর তার নেতৃত্বে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন ৫টি সংসদ নির্বাচনে (১৯৮৩, ১৯৮৭, ১৯৯০, ১৯৯৪ ও ১৯৯৮) অংশ নেয়। এর মাঝে ৪টিতে বিজয়ী হয়ে তার নেতৃত্বে একটি দক্ষিণপন্থী জোট ক্ষমতায় থেকে যায়। শুধুমাত্র ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে তার দল হেরে গেলে তিনি ক্ষমতা হারান। গণতন্ত্রের এটাই নিয়ম।[২৮] নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের পরিবর্তন গণতন্ত্রের স্তম্ভ। একটা সরকারকে পাঁচ বছর সময় দিতে হবে। সরকার পরিবর্তন হবে নির্বাচনের মাধ্যমে, অসাংবিধানিক পন্থায় নয়। সরকারের ভুল-ত্রুটিগুলোকে পুঁজি করতে হবে পাঁচ বছরে। বিকল্প নীতি নিয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে। সংসদকে কার্যকর করতে হবে। সংসদ বয়কট নয় বরং সংসদে গিয়েই সরকারের সমালোচনা করতে হবে। আমাদের দেশে সংসদ বয়কট একটি কালচারে পরিণত হয়েছে। অতীতে সংসদ বয়কট হয়েছে। সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘটনাও ঘটেছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সংসদ বয়কটের সংস্কৃতি আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় একটি স্থায়ী ভিত্তি পেতে যাচ্ছে। সংসদ হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আর সেই অঙ্গ যদি কার্যকর না থাকে, তাহলে গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না।[২৯] কিন্তু যেখানে ভোট কারচুপি, প্রভাব সৃষ্টি করে ভোট নেওয়া ও বিরোধী দল বিহীন ভোট হয় বা সরকার ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার সব পন্থা অবলম্বন করে– সেখানে কি আন্দোলন ছাড়া উপায় আছে?

বিরোধী জোটের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কার দাবী উত্থাপন

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে চারদলীয় জোট অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ২০০১ সালে সরকার গঠন করে। এক পর্যায়ে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের দাবী তোলে। এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন জোট সরকারের বিরোধিতার মধ্য দিয়েই মেয়াদের অবশিষ্ট বছরগুলো পার হয়।[৩০] আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির সংস্কার দাবী করে চললেও ২০০৫ সালের ১৩ই মার্চ প্রথম বারের মতো আংশিক সংস্কার প্রস্তাব আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। ১৫ই জুলাই ২০০৬-এ ১৪ দলের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে জাতীয় প্রেসক্লাবে ৩১ দফার সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেখ হাসিনা।[৩১] তাদের প্রধান দাবী ছিল 'রাষ্ট্রপতি সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের নিয়োগদান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালীন প্রতিরক্ষা বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যস্তকরণ, নির্বাচন কমিশন সংস্কার, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ও গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন।'[৩২] এই সব দাবী বাস্তবায়নের জন্যে পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট আন্দোলন চালিয়ে যায়।

বিতর্কিত নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন তার বিতর্কিত কার্যকলাপের জন্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায়। এ অবস্থায় ভাবা হয়েছিল নতুন নির্বাচন কমিশনার এলে হয়তো এর ইমেজ কিছুটা উদ্ধার হতে পারে। কিন্তু বিরোধী দলগুলোর দাবী উপেক্ষা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেওয়ায় বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং যাকে নিয়োগ দেওয়া হয় তিনি থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচনই হুমকির মুখে পড়বে বলে বিরোধী দলগুলো আশংকা প্রকাশ করে।[৩৩] এমএ আজিজ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হয়ে প্রথমেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করলেন এবং জানা গেল, 'কমিশন ১৪৪টি রাজনৈতিক দল খুঁজে পেয়েছে' 'অখ্যাত, নামসর্বস্ব ও ভূঁইফোঁড়সহ আমন্ত্রিত ১১৭টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মোট ৫৪টি দল টানা ৩ দিনের সেই সংলাপে অংশ নেয়'।[৩৪] নামসর্বস্ব দলগুলোকে সংলাপে ডাকা প্রসঙ্গে সিইসি বলেন, 'কোনটি নামসর্বস্ব দল তা জানার বিষয় নয়। কমিশনে তাদের নামের তালিকা দেখেই সংলাপে ডাকা হয়েছে।' আওয়ামী লীগের সংলাপ বর্জন সম্পর্কে তিনি সে সময় বলেন– 'কোনো বিশেষ দলের জন্য জাতি অপেক্ষা করতে পারে না' শুধু তাই নয়, 'এ ধরনের আয়োজন করতে পেরে আমি খুশি। বৈঠকটিকে গুরুত্বহীন বলা যাবে না।' প্রধান নির্বাচন কমিশনার কোনো বৈঠক (কমিশনারদের সাথে) ছাড়াই একক সিদ্ধান্তে নতুন ভোটার তালিকা তৈরীর কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। একজন কমিশনার এতে লিখিত আপত্তি জানান যে, তিনি কারও সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেন নি।[৩৫] বিরোধী দলগুলো নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কারের দাবি উত্থাপন করে। নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের অনেক কিছু হয়ত মানা হয়ে থাকবে, কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে এমএ আজিজ ও তাদের নিয়োগকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসাররা নির্বাচনের ফলাফল

নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। জোটের সেবারের জন্য জয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ তারা যে কাঠামো তৈরী করেছিল, তা হলে ভবিষ্যতে তা অটুট থাকবে এবং উল্লিখিত নির্বাচন কমিশনে যারা ছিলেন তারা সে কাঠামোরই সৃষ্টি ছিল।[৩৬] বাংলাদেশে গত চার দশকে যত আন্দোলন হয়েছে, তার মূলে ছিল ইচ্ছামতো ভোট দিতে পারার দাবী বা নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারা এবং জবাবদিহিমূলক সরকার সৃষ্টি করা। অন্য কথায় সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়। এবং এ প্রশ্নে যত আন্দোলন হয়েছিল তা সফল হয়। প্রায় প্রতিটি সরকার নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে, বিশেষ করে ডানপন্থি সরকারসমূহ।[৩৭] জোট সরকার নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে একটি স্ট্রাটেজি গ্রহণ করেছিল যার দু'টি দিক আছে। এক নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ দলীয়করণ এবং এমন সব লোক সেখানে নিয়োগ করা হয় যারা জোটের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। এম এ আজিজ ২০০৬ সালে অবসর নেন যদিও তার চাকরির বয়স তখনও ছিল, জোটের পছন্দের ব্যক্তি হিসেবে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পান। কর্মকর্তা থেকে জাকারিয়া কমিশনার পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন সব সময় কমিশনে থেকে একটি দলের হয়ে কাজ করার জন্য। এরা আবার একই ধরনের কর্মচারী নিয়োগ করেছিল। উদ্দেশ্য একটাই, নির্বাচন হলে জোটকে জেতানো, না হলে দুই নম্বর কৌশল প্রয়োগ। দুই. স্ট্র্যাটেজির দ্বিতীয় দিক ছিল, আজিজকে দিয়ে বিভিন্ন রকম ইস্যু তৈরী, নতুন ভোটার তালিকা তৈরী প্রভৃতি কাজ করানো। তারা জানত, আদালতে কোনো কিছু একবার পৌঁছালে সহজে নিস্পত্তি হয় না। তাদের আন্দাজ ছিল, আদালতের রায় পাওয়ার পর আর সময় থাকবে না ভোটার তালিকা সংশোধনের, ফলে নির্বাচন আয়োজনে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে এবং বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় থাকবে।[৩৮]

ভোটার তালিকা বিতর্ক

ভোটার তালিকা তৈরীতে জোট সরকারের অসাধুতা ও অসম্পূর্ণতা জনগণের সামনে উঠে আসে। হাইকোর্টের নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে সরকার পরিকল্পিত উপায়ে যেদিন ভোটার তালিকা করার মহোৎসব শুরু করেছিল সেদিনই এর ভবিষ্যৎ কিছুটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। ভোটার তালিকায় নানা ধরনের ত্রুটি যখন প্রামাণ্যভাবে পত্রিকার পাতায় উঠে আসতে শুরু করেছিল, তখন একটা সৎ সরকার যন্ত্রের উচিত ছিল তা পুনর্মূল্যায়ন করা। তার বদলে যখন জানা যায় ভুয়া আর অসম্পূর্ণতায় ভরা ভোটার তালিকাই মুদ্রণ শুরু করে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন, তখন যে বাস্তবতা বেরিয়ে আসে তা হল যে-কোনো মূল্যে সরকারী দল ভোটে জয়লাভ করতে চায়। এ অবস্থায় উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নির্বাচন অনিশ্চয়তা মধ্যে পড়ে।[৩৯] ইলেক্টশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে সরকার নির্বাচন কমিশনকে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। সংবিধান ও সুপ্রীম কোর্টের রায় উপেক্ষা করে ১ কোটি ১৩ লাখ ভুয়া ভোটারসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে দলীয় ক্যাডারকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করে। জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও কারচুপিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যার ফলে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াই বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।[৪০]

বিচারপতি কে. এম. হাসান বিতর্ক

জোট সরকার দলীয় ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা ২ বছর বৃদ্ধি করে।[৪১] সরকার কেন বিচারপতি হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করতে বদ্ধপরিকর হলেন, সেটিই প্রশ্ন। বিচারপতিদের দুই বছর বয়স বাড়ালে বিচারপতি হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন এবং সে কারণে জুডিশিয়াল অ্যাক্ট বদল হল। একজনের জন্য এত বড় পরিবর্তনটাই সবার চোখে পড়ল। কারণ সরকারী চাকরিতে অবসরের বয়সসীমা সেই ৫৭-ই রইল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপির প্রতি আগ্রহ বিচারপতি হাসান কখনো চাপা রাখেন নি। তিনি আগ্রহের সঙ্গে তরুণ আইনজীবী হিসেবে দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাকে দলের একটি বিভাগের সম্পাদক করা হয়েছিল। বিচারালয়ে তার কক্ষ তখন নবীন কর্মীদের প্রায় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিচারপতি হাসান মুন্সীগঞ্জ থেকে জাতীয় সংসদে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর কারণে সেটি হতে পারে নি। পরে তাকে পুরস্কার হিসেবে রাষ্ট্রদূত ও বিচারক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৪২] উল্লেখ্য বিচারপতি হাসান বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় তিনি থাকবেন না, তিনি 'এমব্যারাসড' বা লজ্জা বা অস্বস্তি বোধ করছেন। 'লজ্জিত' হয়ে বিএনপির নীতি নির্ধারকদের পরীক্ষায় টিকে গিয়েছিলেন। তারা তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান পদের জন্য মনোনীত করে বিচারকদের বয়সসীমা বাড়িয়ে দিলেন। এতে সামগ্রিকভাবে সব বিচারকরা খুশি হয়েছিলেন।[৪৩] বিরোধী দলগুলো বিচারপতি হাসানের অবসর নেওয়ার পর সঙ্গত বিভিন্ন কারণে তার বিরোধিতা করতে লাগল। বিচারপতি হাসান কিন্তু কখনো কিছু বলেন নি। জাতীয়ভাবে তাকে যেভাবে হেনস্থা করা হয় তাতে অন্য কেউ হলে লজ্জিত বোধ করত।[৪৪]

২০০৪ সালের ১৫ই মে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর সূত্র ধরে ১৪ দলীয় জোট পরবর্তী প্রধান উপদেষ্টার বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে আপত্তি উত্থাপন করে এবং সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করা হয় এবং কয়েকটি সাংবিধানিক পদে অবসরগ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরগ্রহণের বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ বৎসর করা হয়। এ সুযোগ সুপ্রীম কোর্টের সব বিচারপতি পেলেও এর একটি প্রয়োগগত বিশিষ্টতাকে বিরোধী দলসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়। অবসরের এ বয়সসীমা বৃদ্ধির ফলে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মুদাস্সিরের অবসরগ্রহণের সময়টি পিছিয়ে যায় এবং এর ফলে ২০০৬ সালের অক্টোবরে, যখন চারদলীয় জোট সরকারের ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হবে, 'সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতির' অবস্থানে থাকার কথা বিচারপতি কে এম হাসানের। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি বিএনপি দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তাই তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হলে নির্বাচনে বিএনপিকে অন্যায্য-অবৈধ সুবিধা দেবেন বা দলটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন– এ বিবেচনা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ১৪ দলীয় জোট

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মানতে অস্বীকার করে এবং সরকারের কাছে বিদ্যমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কার দাবী করে। ২০০৫ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে ঢাকায় আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পুনরায় নির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার সংস্কার দাবী করা হয়। দলীয়ভাবে আয়োজিত সে গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর শামসুল হুদা হারুন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধে দাবী করা হয় :

ক. বিচারপতি কে এম হাসানের বদলে অন্য কাউকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে, খ. সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ১০জন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে, গ. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্তৃত্বও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ন্যস্ত করতে হবে এবং ঘ. নির্বাচন কমিশনকে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনগত স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।[৪৫] ১৫ই মার্চ ২০০৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় সংস্কার দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।[৪৬]

সে সময় কে এম হাসান চলে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হতো, তা নয়। বিএনপি তার অনুকূলে প্রশাসন ব্যবস্থাসহ সবকিছু সাজিয়েছে রেখেছিল। সেই সাজানো ব্যবস্থাগুলো ভেঙ্গে দিতে না পারলে বিএনপি তা বিরোধীদের নস্যাৎ করার কাজে ব্যবহার করতে পারত। সুতরাং হাসান না থাকলেও কিছু যায় আসত না। এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক–

১. যে সব ডিসি-এসপি ২০০১ সালের নির্বাচনে জালিয়াতি করেছিল এবং তার পুরস্কার হিসেবে ২ বছরের মধ্যে সচিব হয়েছিল, তারা সচিব থাকলে বা পুলিশের স্ট্যাটেজিক পদে থাকলে নির্বাচনে ১৪ দল পরাজিত হবে।
২. আজিজ এন্ড গং ও সে সময় তাদের নিযুক্ত নির্বাচনী অফিসাররা থাকলে বিরোধী দল নির্বাচনে পরাজিত হবে।
৩. তারেক জিয়ার বদৌলতে চ্যানেলগুলো কঠোরভাবে মনিটর না করলে, তারা বিভ্রান্তিকর প্রচার শুরু করবে।

জোট সরকার জানে, এখানকার মানুষ দু'এক মাসের মধ্যে সব ভুলে যায়। সে কারণে, তারা প্রথম তিন বছর চরম অত্যাচার চালায় যাতে পরের দুই বছরে মানুষ তা ভুলে যায়। সংলাপ তারা চালিয়েছিল এ কারণে যাতে রোজার সময় জনরোষের শিকার না হয়।"[৪৭]

সংলাপ অনুষ্ঠান

বিরোধী দলের উত্থাপিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায় দু'মাস চিঠি চালাচালি করে উভয়পক্ষ আলোচনায় কারা-কারা অংশ নেবে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি। ১৪ দল তাদের ৫জন প্রতিনিধির নাম সরকারের প্রধান দল বিএনপির মহাসচিবের কাছে হস্তান্তর করলেও বিএনপির ৫জন আলোচক কি তাদের দলের

হবেন নাকি জামায়াতেরসহ হবে– এটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং একটা অনিশ্চিত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।[৪৮] সংলাপে অংশ নেওয়ার জন্য ১৪ দল ৫জনের যে তালিকা প্রেরণ করেছে তার সঙ্গে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ১৪ দল আশা করছে যে সরকারী দল শুধু মাত্র বিএনপি'র ৫জন প্রতিনিধির নাম দেবে, ১৪ দল আওয়ামী লীগকে শুধুমাত্র বিএনপি'র সদস্যদের সঙ্গেই আলোচনায় বসার অনুমতি দিয়েছে। ১৪ দল জামায়াতকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী এবং দেশে বিরাজমান জঙ্গীবাদের পৃষ্ঠপোষক বলে অভিহিত করে তাদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে না বসার কথা জানিয়ে দেয়।[৪৯] ২৮শে এপ্রিল ২০০৬ বিকালবেলা মিন্টু রোড থেকে যে চিঠিটি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের গুলশানস্থ বাসভবনে পত্রবাহক বয়ে নিয়ে যায় তাতে বিএনপির ২জনসহ ৪ দলীয় জোটের ৫জন সদস্যের তালিকা প্রেরণ করা হয়, তাতে মানুষ স্পষ্ট বুঝতে পারে, দুই মাস ধরে দেশে সংস্কার ও সংলাপ নিয়ে এত কথা, এত লেখালেখি, এত আশাবাদ যা শুনছিল, বিএনপি বা জোটের দিক থেকে তা ছিল আসলেই লোক দেখানো মাত্র।[৫০] এদিকে সরকারের সময় দ্রুত ফুড়িয়ে আসছিল এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষণও এগিয়ে আসছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন নিয়ে শুধু প্রধান বিরোধী দলের একাই নয়; বিভিন্ন দল, মত, নাগরিক সমাজ, সচেতন মহল, গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষেরও মনে নানা প্রশ্ন, অভিযোগ সংশয় এবং আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু, এ সবের কোনো কূলকিনারা হচ্ছিল না, বরং নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্রেক হচ্ছিল, যা কোনোভাবেই নিরসন হচ্ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, সচেতন মহল, নাগরিক সমাজসহ সকল মহল উক্ত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে একটি ভয়াভহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করছিল। যা কিনা কেবল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্যই শুধু নয়, জনজীবনেও বিপর্যয় ডেকে আনবে। বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব ও এলজিআরডি মন্ত্রী মান্নান ভূঁইয়া সে সময় বলেছিলেন, 'সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, বিরোধী দলের সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে যা কিছু করতে হবে এখনই করতে হবে– তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পর সংস্কার নিয়ে তাদের কিছুই করার থাকবে না নির্বাচন করা ছাড়া।[৫১] ২০০৬-এর অক্টোবর মাসের শুরুতেই সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিএনপি মহাসচিব এবং আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাঠামোটিই এমন যে, দুই প্রধান রাজনৈতিক দল কখনও এক সুরে কথা বলে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষদাগারেই অভ্যস্ত তারা। এর ব্যতিক্রম ঘটে সেই বহু প্রতীক্ষিত সংলাপ-উত্তর ব্রিফিংএ। দুই দলের নেতা অভিন্ন সুরে কথা বলেন। উন্মুখ দেশবাসীর সামনে প্রতি সংলাপ শেষে 'মহাসচিব' ও 'সাধারণ সম্পাদক' উভয়েই স্বস্তিমাখা চেহারায় আবির্ভূত হতে থাকেন।[৫২]

অভিন্ন সুরে বলেন তাঁরা উভয়েই আন্তরিক, অনেক বিষয়েই খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন। যার যার দলের সঙ্গে আলাপ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাবেন। শেষ সংলাপেও একই কথা শুধু দুই নেত্রী দেশের বাইরে বলেই যেন সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেল না। তাঁরা দেশে ফেরার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে। ৫টি সংলাপ হয়ে যাওয়ার পরও 'আত্মতুষ্ট' দুই নেতা একই কথা বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এর কোনো শরীরী রূপ দেশবাসী দেখতে পায় নি। শেষ সংলাপের আগে নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূস

'এক বৈঠকে সংলাপের ইতি টেনে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান।'[৫৩] কিন্তু সে আহ্বানকে সম্মান জানাতে পারেন নি দুই নেতা। সংলাপ ক্রমে যেন সঙ-লাপে পরিণত হয়। এ দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় সংলাপ সফল হওয়া খুব সহজ নয়। এ প্রসঙ্গে একে এম শাহনাওয়াজ তাঁর *সমাজ ও রাজনীতির একদশক (২০০০-২০০৯)* গ্রন্থে এ ধারার সন্দেহের পেছনে কতগুলো যুক্তি তুলে ধরেন– "ক. দুই দল যদি সংলাপের মধ্যদিয়ে সমাধানে পৌঁছতে চাইত তবে অনেক আগেই সংলাপের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হতে পারত। নির্বাচনের পথ মসৃণ করার, রাজনৈতিক স্থবিরতার জট খোলার দায় এবং দায়িত্ব যেখানে সরকারের সেখানে বিরোধী দলের শর্ত মেনে সংলাপের পথ নিস্কণ্টক করলে জোট সরকারের কৃতিত্ব হিসেবেই বিবেচিত হতো।

খ. যখন সরকারী দল সংলাপের ব্যাপারে তাদের আন্তরিক আগ্রহের কথা বলছে, তখন জনসভার বক্তৃতায় অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করছেন প্রধানমন্ত্রী। সাংবাদিকরা এর ব্যাখ্যা চাইলে মহাসচিব ওসব 'মেঠো বক্তৃতা' বলে উড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ যেন প্রধানমন্ত্রী মাঠে ময়দানে যা বলেন তা সত্য নয়। এ সব আচরণ দেখে মনে হয়েছে তৎকালীন সরকারী দল প্রথম থেকে নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারে আগ্রহী নয়। এ ধরনের মনোভাব ধারণ করলে সংলাপে সাফল্য আশা করা যায় না।

গ. জোট সরকারের তো জানা ছিল কবে তাদের ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হবে। তাই সংলাপের সম্ভাবনার মূলা ঝুলিয়ে এক সময় যেন হিসাব কষেই সিদ্ধান্ত দিল। সংলাপের পথ ধরে মাঝপথে সরকারের মেয়াদ যেন শেষ হয়ে যায়। এভাবেই যেন ঝুলে যায় গোটা ইস্যু।

ঘ. ফয়সালা হল দুই জোটের পক্ষ থেকে বিএনপি মহাসচিব এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সংলাপে বসবেন। তার অর্থ হচ্ছে দুই জোট যার যার মনোনীত প্রতিনিধির উপর সিদ্ধান্তে পৌঁছার নির্বাহী দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। সংলাপের মূল ইস্যুগুলো সকলের জানা। সে বিচারে দলীয় সিদ্ধান্ত ও সকল প্রস্তুতি নিয়ে মহাসচিব ও সাধারণ সম্পাদকদ্বয় সংলাপে বসেছেন। যদি তাই হয় তবে কেন প্রতি সংলাপ শেষে সিদ্ধান্তের জন্য দুই নেতাকে যার যার দল জোটে ছুটতে হচ্ছে?

১৬ই অক্টোবর ২০০৬-এর সংলাপ থেকে যখন দেশের সর্বস্তরের মানুষ একটি ফয়সালা আশা করছিল তখনই সবাইকে অবাক করে দিয়ে সংলাপ শেষে দুই নেতা জানিয়ে দিলেন যার যার নেত্রী বিদেশ থেকে ফিরলে আলোচনার পর আবার ২৩ই অক্টোবর সংলাপ হবে।"[৫৪]

এ সব অহেতুক নাটকীয়তা সংলাপ সঙ-লাপে রূপান্তরিত হয়। আর তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় দুই বড় দলের শ্রেণী চরিত্র। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কি দাবী করতে পারবে তাদের দলগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চা রয়েছে? দু'টোই আজ দলীয় সভাপতি অর্থাৎ নেত্রীনির্ভর দল। দুই নেত্রীর অঙ্গুলী হেলন ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নয়। যদি তাই হয় তবে মহাসচিব পর্যায়ের সংলাপের মানে কী? শুরু থেকেই আলোচনার শর্ত পরিষ্কার থাকার পরও ঘণ্টাখানিক কথা বলে নেতারা কেন ছুটেছেন যার যার

দলে পরামর্শ করতে? পরিশেষে আসল সত্যটি প্রকাশ পেল, দুই নেত্রী দেশে না ফিরলে কোনো সমাধান নয়। জাতির এই ক্রান্তিকালে যখন দুই নেত্রীর সিদ্ধান্ত ছাড়া কিছু হবে না তবে কেন প্রায় একই সময়ে একজনের অতিজরুরী যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা ও অন্যজনের পরিবার পরিজন নিয়ে ওমরাহ্ পালনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন পড়ল? আর যদি এ যাত্রা অনিবার্যই হয়ে থাকে তবে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে রায় দিয়ে গেলেন না কেন?[৫৫]

দুই দল ও জোটের নেতাদের মধ্যে আলোচনাকালে দুই নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার বিদেশযাত্রা এবং বেশ কয়েক দিনের অবস্থান থেকে এটা পরিষ্কার যে, তারা কোনোরকম সমঝোতার ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন না। সরকারের মধ্যে বড় অংশের এবং প্রধানমন্ত্রীর নিজের মনোভাব এ ব্যাপারে বরাবরই কঠোর, ১৯৯৬ সালের মতো তারা এবার আর বিরোধী দলের দাবী মানবেন না। যে পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক, তারা আর নমনীয় হবেন না। আর তেমন কোনো পরিস্থিতি উদ্ভব হলে তা শক্ত হাতে দমন করবেন।[৫৬]

বিচারপতি হাসানের প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অপারগতা এবং ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের উপদেষ্টার পদ গ্রহণ

১৪ দলীয় জোট, জাতীয় পার্টি, এলডিপি, জাকের পার্টি, তরিকত ফেডারেশনসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবীতে রাজপথে আন্দোলনে নামে। অপরপক্ষে ৪ দলীয় জোটেও বিচারপতি আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন কমিশন বহাল রাখার দাবীতে রাজপথে পাল্টা আন্দোলনে নামে। শুরু হয় রাজনৈতিক সংঘাত। ক্রমান্বয়ে আন্দোলন রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। এমন অবস্থায় রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ২৮ই অক্টোবর রাজপথে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে ৪ দলীয় জোটের জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে ১৪ দল সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঢাকাসহ সারা দেশে প্রায় ৭০জন নিহত হয়। বিরোধী দলের লাগাতার অবরোধ ও প্রতিরোধের সংকল্পে সারা দেশ গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবার মধ্যে অশেষ দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। এর আগে ২০০১ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এ রকম সংকটের সৃষ্টি হয় নি।[৫৭] ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চৌদ্দদল নিজেদের অবস্থানে অনমনীয় থাকে এবং বিচারপতি হাসান ইস্যুটি কার্যত বাংলাদেশকে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখি করে দেয়। চার দলীয় জোটে ক্ষমতা লিপ্সার কারণে সংস্কারে অনীহা প্রদর্শন করে। ফলে দেশ পতিত হয় এক দুর্যোগের মধ্যে। এ সময় চার দলীয়জোট ও ১৪ দলীয় জোট মুখোমুখী অবস্থান নেয়। চার দলীয়জোট সঙ্গী জামায়াতের পক্ষ থেকে আধুনিক অস্ত্রের ভয়ঙ্কর প্রদর্শনী ও ব্যবহারের ফলে ১৪ দলীয় জোটের সাথে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ– আন্দোলনের মুখে শেষ মুহূর্তে বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। বিচারপতি হাসানের অপারগতা প্রকাশ ঘোষণার পর পরবর্তী সাংবিধানিক বিকল্পগুলো বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রাজনীতির প্রধান দু'পক্ষের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে ৬ নম্বর

Dhaka University Institutional Repository

বিকল্পটি গ্রহণের ঘোষণা দেন, যেখানে প্রেসিডেন্টের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে।[৫৮] ২৯শে অক্টোবর ২০০৬ রাষ্ট্রপতি নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বটি গ্রহণ করেন।[৫৯] বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে চারদল উপস্থিত থাকলেও, আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন না। অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণকে 'সাংবিধানিক ক্যু' হিসেবে আখ্যায়িত করেন ওয়ার্কাস পার্টির প্রধান রাশেদ খান মেনন। এমনকি রাষ্ট্রপতির এই দায়িত্বকে চ্যালেঞ্জ করে, হাইকোর্টে তিনটি রিট আবেদন করা হয়।[৬০] প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করে ড. ইয়াজউদ্দিন রাজনীতির দু'পক্ষের নিকট থেকে সংগৃহিত তালিকার আলোকে ১০জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।[৬১] এ উপদেষ্টাদের মধ্য থেকে এক পর্যায়ে ৪জন পদত্যাগ[৬২] করলে প্রেসিডেন্ট নতুন ৪জন উপদেষ্টা নিয়োগ[৬৩] দেন। নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া এগিয়ে চলার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট বিচারপতি এম এ আজিজের নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবীতে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে।

১৪ দলীয় জোট ইসি, ভোটার তালিকা এবং অন্য কিছু বিষয়ে দর কষাকষি শেষে ২০০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে 'উৎসবের আমেজে' 'মহাজোটের ব্যানারে' পরবর্তী ২২শে জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে মনোনয়নপত্র জমা দেয় এবং এ সময়ের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক (৪১৪৬টি) মনোনয়নপত্র জমা হয়। মহা ঐক্যজোটের অংশীদার হয় আওয়ামী লীগ, ১১ দল, জাসদ-ইনু, ওয়ার্কাস পার্টি, এলডিপি, খেলাফত মজলিস-শায়খুল হাদিসসহ আরও কয়েকটি দল।[৬৪] এ মহা ঐক্যজোটভুক্ত সব প্রার্থীই আবার ৩রা জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে তাদের সমুদয় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন।[৬৫]

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান উপদেষ্টা ও প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিনের বিরুদ্ধে 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর বেশ কিছু অভিযোগ আনেন এবং কিছু সংস্কারের দাবী করেন। যেমন :

ক. সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশ,

খ. প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ড. ইয়াজউদ্দিনের পদত্যাগ,

গ. প্রশাসনকে দলীয়মুক্তকরণ,

ঘ. জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদসহ মনোনয়ন বাতিলকৃত সব প্রার্থীকে নির্বাচনে অংশগহণের সুযোগ প্রদান ও

ঙ. নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল বাতিল করে নতুন তফসিল ঘোষণা ।[৬৬]

আসনওয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ছাড়াই ব্যালট পেপার ছাপার কাজ ৫ই জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন। তবে এত কম সময়ে সাড়ে ৯ কোটি ব্যালট পেপার ছেপে সারা দেশে পৌঁছানো সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। ২২শে জানুয়ারির নির্বাচনের জন্য ১৯শে জানুয়ারি থেকে সারা দেশে ব্যালট পৌঁছানোর পরিকল্পনা নেয় নির্বাচন কমিশন। এদিকে নির্বাচনের ১৭ দিন আগেও নির্বাচন কমিশন জানত না, দেশে ভোটার সংখ্যা কত কিংবা কোনো আসনে কত ভোট। আর ভোটার সংখ্যা না জানতে পারায় কোনো আসনে কত ব্যালট পেপার ছাপা হবে তা স্পষ্ট নয়। তবে, শেষ মুহূর্তে হালনাগাদ করা বিতর্কিত ভোটার তালিকাকে সম্বল করেই ব্যালট পেপার মুদ্রণ সংখ্যা ঠিক করা হয়। ১৪ দলের নেতৃত্বাধীন মহাজোট নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেও এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কোনো উদ্বেগ দেখা যায় নি। এ পরিস্থিতি নিয়ে কমিশন কোনো সভাও করে নি। বরং মহাজোট নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় তাঁরা কিছুটা স্বস্তিবোধ করছিল। কারণ ভোটার তালিকাসহ নির্বাচন প্রস্তুতির দুর্বল দিকগুলো নিয়ে তাঁদের আর বিতর্কের মধ্যে পড়তে হবে না।[৬৭] সংবিধানের ১২১ ও ১২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনের আগে একটি শুদ্ধ ভোটার তালিকার কথা উল্লেখ আছে।[৬৮]

১/১১ এবং ফকরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এক সময় একটি গ্রহণযোগ্যতা পেলেও তা পরবর্তীকালে রাজনীতিতে বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ কর্তৃক তার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ বাংলাদেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে, যা কিনা শেষ পর্যন্ত 'ওয়ান ইলেভেন'-এর মতো পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল।[৬৯] এ অবস্থায় ১১ই জানুয়ারি ২০০৭-এ বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়, যাকে আন্তর্জাতিক মিডিয়া 'সামরিক শাসনের বাংলাদেশী সংস্করণ' হিসেবে চিহ্নিত করে। ১২ই জানুয়ারি তারিখে ড. ফখরুদ্দীন আহমদ নতুন প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং কয়েক দফায় ১০জন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।[৭০] এক পর্যায়ে কয়েকজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে সমসংখ্যাক নতুন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।[৭১] ২৩ মাসের দীর্ঘ 'তত্ত্বাবধায়ক শাসনামলে' নির্বাহী দায়িত্ব পালনে 'প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী' পদে কয়েকজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৭২] ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা পরিচালনা করে। এত দীর্ঘ সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতায় থাকার কথা নয়।[৭৩] রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজ দায়িত্বের অতিরিক্তি হিসেবে তিনি যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্বটি গ্রহণ করেন, এটি ছিল অসাংবিধানিক কারণ সংবিধানের অন্যান্য অপশনগুলোর প্রয়োগ না করে তিনি নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। যে কারণেই পুরো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাই এখন প্রশ্নের মুখে। সংবিধানের ৫৮(খ) (১) ধারায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে কথা বলা হয়েছে, তাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ কত দিনের সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো কথা বলা হয়

নি। এই ধারায় বলা হয়েছে, যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নূতন প্রধানমন্ত্রী তাহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।' আবার সংবিধানের ১২৩(৩)-এ বলা হয়েছে, 'মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।' এখানে সংবিধানের ৫৮(ঘ) ধারায় কিছুটা হলেও অস্পষ্টতা রয়েছে। নির্বাচন প্রশ্নে ৯০ দিনের কথা বলা হলেও, সুস্পষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৯০ দিনের অধিক থাকতে পারবে না, এ কথাটাও বলা হয় নি। এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতের মতামত কখনো পাওয়া যায় নি। আবার ৫৮(গ) ধারার ১ থেকে ৬ অনুচ্ছেদে কে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন, সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে কতগুলো বিকল্প সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। যেমন ৫৮(গ)(৩)-এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। তিনি অপারগতা প্রকাশ করলে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসর গ্রহণকারী বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেবেন। এরা দু'জন রাজী না হলে (৪)-এ বলা হয়েছে আপীল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এই দায়িত্ব নেবেন অথবা তার আগে যিনি অবসরে গেছেন তিনি দায়িত্ব নেবেন। এ ক্ষেত্রেও যদি কাউকে পাওয়া না যায়, তাহলে (৫) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে একজনকে চূড়ান্ত করবেন। এবং সর্বশেষ সম্ভাবনা হচ্ছে (অনুচ্ছেদ-৬) রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেবেন যদি উপরে উল্লিখিত সম্ভাবনাগুলো কার্যকর করা না যায়।[৭৪] এখন সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ; ৫৮(গ) (৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু ৫৮(গ) (৫)-এ বর্ণিত 'প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা' পর্বটি তিনি সম্পন্ন করেন নি। এটি যদি তিনি করতেন, এবং তা যদি ব্যর্থ হত, তাহলে তার ৫৮(গ) (৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রধান উপদেষ্টার' পদ গ্রহণ কোনো প্রশ্নের জন্ম দিত না। এমনকি রাষ্ট্রপতি উচ্চ আদালতের একটি ব্যাখ্যাও চাইতে পারতেন।[৭৫] বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয় দলই ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমালোচনা করে। তবে ঐ সরকারের আমলে কিছু ভাল কাজও সম্পন্ন হয়েছে– এ কথাটাও স্বীকার করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই দেশে প্রথমবারের মতো ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরী হয়েছে এবং অনুষ্ঠিত হয়েছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। বন্ধ হয়েছে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশে চারটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন। ওই সরকারের আমলেই দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল, জেলায় জেলায় হয়েছিল র‍্যালি-সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানাদি। ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সফলতার একটি হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ। ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচার বিভাগ পৃথক করে। দেশের বিশিষ্টজনরা এটাকে সরকারের একটি সফল কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর

থেকে কোনো সরকারই নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করতে পারে নি।[৭৬] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (২০০৭) যেমন বেশ কিছু সফলতা ছিল তেমনি ছিল কিছু ব্যর্থতাও। দেশ চালাতে গিয়ে প্রায় দুই বছরে জারী হয়েছিল ১১২টি অধ্যাদেশ। ২০০৬ সালের ১১ই জানুয়ারি ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পরদিনই অর্থাৎ ১২ জানুয়ারি সরকার জারী করে জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা অধ্যাদেশ। সরকারের মেয়াদের শেষের দিকের হাতেগোনা কয়েকদিন বাদ দিয়ে পুরো সময়েই দেশে বলবৎ ছিল জরুরী অবস্থা। আর এ জরুরী অবস্থায় ব্যাহত হয়েছে মানুষের মৌলিক অধিকার। জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালে দেশে মিছিল-মিটিংসহ সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল প্রায় বন্ধ। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল সন্তোষজনক। সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে চাঁদা বা বখরা না দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পেরেছে। অফিস আদালতে নির্লজ্জ প্রকাশ্যে ঘুষ গ্রহণ দৃশ্যত ছিল না। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ভালো ছিল না দেশের শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাথাচাড়া দিয়েছে ছাত্র আন্দোলন। ফলে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। গ্রেফতার করা হয়েছিল ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েক শিক্ষক ও ছাত্রকে। পরে ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনের মুখে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।[৭৭]

ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চীপ ফখরুদ্দীন আহমদ এবং সেনাবাহিনীর চীফ মঈন উ. আহমেদ যৌথভাবে ইনফর্মাল সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। এই ব্যবস্থায় জাস্টিস ছিল না, ছিল নির্যাতন, সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ। নির্যাতনের বহুমাত্রিক ব্যবহার দেখে বাংলাদেশকে মনে হয়েছে কলোনিয়াল রাষ্ট্র।'[৭৮]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পুরো মেয়াদটা ছিল গ্রেফতার, উচ্চ আদালতের দেওয়া স্থগিতাদেশ, জামিন আর অধ্যাদেশ জারীর আইনি গ্যাঁড়াকলে পরিপূর্ণ। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাসহ প্রায় দুই শতাধিক রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাবেক আমলাসহ ভিআইপিদের একের পর এক গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের অনেককেই বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছিল। নিম্ন আদালতের দেওয়া এ সাজা একের পর এক স্থগিত ও জামিন দিতে থাকেন উচ্চ আদালত। ২০০৮ সালের প্রথম ভাগেই শুরু হয় আদালতের দীর্ঘমেয়াদী সাজা ও স্থগিতাদেশের বন্যা। আর বছরের শেষটা হয় জামিনের মধ্য দিয়ে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশ স্বাধীনের পর দুর্নীতির অপরাধে কোনো সরকারই রাজনীতিকদের বিচারে এ রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল হালিম *যায়যায়দিন*কে বলেন, বছরটাকে অধ্যাদেশের বছর বলা ভুল হবে না। বছরের শুরু থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার মোট ১২২টি অধ্যাদেশ জারী করে। যে অপরাধটির জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা জারীর আগে সম্পন্ন করা হয়েছে সেটাকে জরুরী ক্ষমতা বিধিমালার আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। আর এর ফলে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাসহ আরও অনেক রাজনীতিবিদ অনেক আগে যে অপরাধ করেছিলেন সেটাকে জরুরী ক্ষমতা বিধিমালার আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা প্রণয়নের সময় বিধান করা হয় যে, এই

আইনে কোনো আসামীর জামিন দেওয়া যাবে না। এ দু'টি কারণে হাইকোর্টের কাছে যখন কোনো মামলা আসে তখনই আদালতের কাছে দু'টি বিধান চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ আসে। আর এ দু'টি কারণে বছরজুড়ে উচ্চ আদালতে জামিন দেওয়া ও মামলা স্থগিতাদেশের বন্যা বয়ে যায়।[৭৯] তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারলেও, প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে দলগুলো সৎ থাকতে পারে নি। নবম জাতীয় সংসদেও নির্বাচিত ৩০০ জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে প্রায় দেড়শজনের গায়েই ফৌজদারী মামলার দাগ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীদের হলফনামা ও মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) জানিয়েছে, মহাজোটের ২৬২জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১১১জনের বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৭৪জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে। অপরদিকে চারদলীয় জোটের ৩২জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ২৩জনের বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৭জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা চলমান রয়েছে। হত্যা মামলা রয়েছে উভয় জোটের অন্তত ১৮জন সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে। নির্বাচন কমিশনের তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সামরিক আইনে সাজা হয়েছিল অনেকেরই। [৮০]

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন

১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দাবী পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করা হয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে সমস্যা হল সংবিবাধের ১১৮(৫) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে-কোনো আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে;
তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।'

'১১৮(৬) কোনো নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।'[৮১] ২০০৭ সালে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে নির্বাচন কমিশনার এমএ আজিজকে পদত্যাগের কথা বললে তিনি তা অস্বীকার করেন। পরে রাষ্ট্রপতি তাকে ছুটিতে পাঠান। কিন্তু আন্দোলনের এক পর্যায়ে ২১শে জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ বিকাল ৪টায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করেন[৮২] এবং তার স্থলে ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে ড. এটিএম শামছুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনা করা হয়। মোহাম্মদ ছহুল হোসেন ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭ এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাখওয়াত হোসেনকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৮৩]

নির্বাচনী জোটের রাজনীতি

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনী জোট ও আসন ভাগাভাগির জোর তৎপরতা শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। নির্বাচনে জয়লাভ ও ভবিষ্যতে সরকার গঠনের লক্ষ্য নিয়ে জোট গঠন বা এ নিয়ে দলগুলোর মধ্যে দর কষাকষি অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আদর্শ বা নীতি-নৈতিকতা বলে যে কিছু আছে, তা একেবারেই উপেক্ষিত থাকবে এটা কোনোভাবেই স্বাভাবিক হতে পারে না। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগ বা মহাজোটের ঐক্য ও আসন ভাগাভাগি নিয়ে অনেকেই নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। শুধু নির্বাচনে জেতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বৈরশাসনের জন্য নিন্দিত এরশাদের সঙ্গে জোট বাঁধার বিষয়টি নৈতিকতার বিবেচনায় মেনে নেওয়া কঠিন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি জোট বাঁধে এ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরোধিতাকারী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে। জোট থেকে এমন অনেককে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচনী জোট গঠনের ক্ষেত্রে দলগুলোর মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শগত ক্ষেত্রে ঐক্য বা অন্তত প্রতিশ্রুতি থাকা প্রয়োজন। দলগুলো কেন ও কীসের ভিত্তিতে জোট গঠন করেছে, তা জনগণ তথা ভোটারদের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল।[৮৪]

নির্বাচনী ইশতেহার

বিএনপি নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার সময় বলে, দেশের জনগণের সমর্থনে আসন্ন নির্বাচনে জয়ী হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দেশ ও জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'দেশ বাঁচাও-মানুষ বাঁচাও' এই স্লোগানকে ধারণ করে ইনশাল্লাহ নিরলসভাবে কাজ করবে। সাংবিধানিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনের শাসন এবং জনগণের ক্ষমতার সার্বভৌমত্বের বিশ্বাসী বিএনপির কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মাতৃভূমির স্বাধীনতা এক পবিত্র আমানত। রক্তার্জিত গণতন্ত্র সুরক্ষায় আপসহীন বিএনপি জনগণকে সাথে নিয়ে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে প্রতিজ্ঞ। এই লক্ষ্যে যে-কোনো মূল্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জনগণের জানমাল সুরক্ষা, দেশকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, দারিদ্র্য বিমোচন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, মানবসম্পদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, যোগাযোগ ও অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, সকল শ্রেণী, পেশা, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের মতো বিষয়গুলোকে বিএনপি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়।[৮৫] বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং তা দ্রুত কমিয়ে আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। তারা আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাস দমনের জন্য কার্যকর

ব্যবস্থা গ্রহণের ওয়াদা করে। বিএনপি তার ইশতেহারে আরও জানায়, নির্বাচিত হলে দুর্নীতি দমন এবং দুর্নীতির উৎসগুলো রুদ্ধ করা জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেবে। বিগত বিএনপি আমলে প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতি বিরুদ্ধে সচেতনা গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচারণা কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। নির্বাচিনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হবে। বিএনপি পুনঃনির্বাচিত হলে বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী শক্তির ঘাটতি মেটানোর জন্য বিএনপি প্রথম থেকেই তৎপর হবে এবং সেই লক্ষ্যে-একটি স্বচ্ছ ও কার্যকর নীতি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দেশের মজুদ গ্যাস ও কয়লা সম্পদ ভারসাম্যের ভিত্তিতে সতর্ক ব্যবহার করা হবে এবং নতুন মজুদের অনুসন্ধান ত্বরান্বিত করা হবে। কৃষি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি, শিক্ষাকে গণমুখী ও কর্মমুখী করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।[৮৬]

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা সময় প্রথমেই দলটির বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে যে সুমহান গৌরব আছে তা তুলে ধরে। ইশতেহার শুরুতেই বলা হয়, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের দুরূহ কর্তব্য সম্পাদ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সূচনা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ আবার সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারায় ফিরে যায়। একই খুনিরা ৩রা নভেম্বর জেলখানায় হত্যা করে জাতীয় চার নেতাকে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার অঙ্গীকার ও একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সুখী সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলার সব সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেয় সামরিক সরকার ও সামরিক ছাউনিতে তাদের সৃষ্ট দলগুলো সংবিধান কর্তন, স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী, জঙ্গীবাদের বিশ্বাসী জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পুনর্বাসিত করা, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, সন্ত্রাস, কালোটাকা ও পেশিশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি গড়ে তোলা হয় লুটপাটের অর্থনীতি।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের সামনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং সংকটজাল ছিন্ন করে উন্নয়নের গতিপথে দেশকে পুনর্স্থাপিত করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে ইশতেহার ঘোষণা করে। ইশতেহারে আরও বলা হয়, আমরা ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি যেখানে সম্ভাব্য উচ্চতম প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচিয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে। একটি প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে নিশ্চিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ। গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠবে এক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র। এই ভিশন বা রূপকল্পের আলোকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করবে উপযুক্ত কৌশল, যার মূলে থাকবে পরিবর্তন বা দিনবদলের অঙ্গীকার।

রূপকল্প বা ভিশন ২০২১ সামনে রেখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী অঙ্গীকার, কর্মসূচী ও ঘোষণা করে, ২০০৫ সালের ১৫ই জুলাই ঘোষিত ১৪ দলের ৩১ দফা সংস্কার কর্মসূচী এবং ২২শে নভেম্বর গৃহীত ২৩ দফা অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচীর আলোকে এবং বিগত ৭ বছরের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে আত্ম-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট বিবেচনায় পাঁচটি বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলো হল– দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিশ্বমন্দার হাত থেকে দেশকে বাঁচানো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে দ্রুত উন্নয়ন করা, দারিদ্র্য বিমোচন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।[৮৭]

এ ছাড়াও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহার যে সব অঙ্গীকার করে তা হল– ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালীকরণ, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ ও পানিসম্পদ রক্ষায় কার্যকর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা, শিল্প বাণিজ্য উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দেশকে শক্তিশালীকরণ, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ সৃষ্টি করা, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণের লক্ষ্যে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু, পুষ্টি, শিশু ও মাতৃমঙ্গল নিশ্চিত করা, বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের জন্য প্রত্যেক পরিবারের একজন কর্মক্ষম বেকার তরুণ/তরুণীকে কর্মসংস্থানের জন্য 'এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি' স্কিম পর্যায়ক্রমে কার্যকরী করা, পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন, দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতাবৃদ্ধি, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মোকাবেলায় দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স গঠন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা, প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা ইত্যাদি অঙ্গীকার করা হয়।[৮৮] আওয়ামী লীগ তার ইশতেহারে একটা পরিশিষ্ট যুক্ত করে, যেখানে কোন সময়ের মধ্যে কী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে তার স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে– যা বাংলাদেশে একটি নতুন ইতিবাচক ধারার সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮

১. কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি, প্রদান নিষিদ্ধ : কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ হতে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বা অন্যত্র অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবেন না।

২. সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ : কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা দলের মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি–

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবে তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা তাতে বাধা প্রদান করতে পারবে না;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করতে হবে।

(গ) সভা করতে চাইলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে, যাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

(ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করতে পারবে না এবং তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করতে পারবে না;

(ঙ) কোনো সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনোভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না।

৩. পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ : (১) কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থানে বা যানবহনে কোনো প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না। যথা :

(ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোনো দণ্ডায়মান বস্তুতে;

(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং

(গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার,লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোনো প্রকার যানবাহনে :

তবে শর্ত থাকে যে, দেশের যে-কোনো স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাতে বা টাঙ্গাতে পারবে।

(২) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাবে না এবং পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাবে না।

(৩) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের হতে হবে এবং পোস্টারের আয়তন ২৩"×১৮" এর অধিক হতে পারবে না এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পোস্টারে তার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাতে পারবে না।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হলে সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাতে পারবে।

৪. কোনো ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বের করতে পারবে না কিংবা কোনোরূপ শোডাউন করতে পারবে না।

৫. দেওয়াল লিখে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

৬. নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো গেইট বা তোরণ নির্মাণ করতে পারবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকরা সৃষ্টি করতে পারবেন না; নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান নিয়ে কোনো প্যান্ডেল তৈরী করতে পারবেন না; নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো প্রকার আলোকসজ্জা করতে পারবেন না।

৭. নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে বক্তব্য প্রদান বা কোনো ধরনের তিক্ত বা উস্কানীমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না; মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

৮. কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা দলের মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে পারবেন না।

৯. কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই)টা হতে রাত ৮ (আট)টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন।

১০. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোনো অবস্থাতেই অতিক্রম করতে পারবেন না।

১১. ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃত অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে।

কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[৮৯]

নির্বাচন কমিশনের তফসিল ঘোষণা

নির্বাচন কমিশন ২রা নভেম্বর ২০০৮-এ নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। তফসিল অনুযায়ী সংসদ নির্বাচন ১৮ই ডিসেম্বর ও উপজেলা নির্বাচন ২৮শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ৪ দলীয় জোটের নির্বাচন পিছানোর দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন কয়েকবার জাতীয় সংসদ ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের নতুন তফসিল ঘোষণ করে। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তফসিল ঘোষণা অনুযায়ী ২৯শে ডিসেম্বর, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সংসদীয় আসন ৩০০, মোট প্রার্থী ১৫৫২জন। ভোটার সংখ্যা ৮ কোটি ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৬৯৮জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৩ কোটি ৯৮ লাখ ২২ হাজার ৫৪জন এবং নারী ৪ কোটি ১২ লাখ ৩৬ হাজার ১৪৯জন।[৯০]

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সারণি ১.১৫ : নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল[৯১]

রাজনৈতিক দল	**নির্বাচিত আসন**
আওয়ামী লীগ	২৩০
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০
জাতীয় পার্টি (জাপা)	২৭
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ, রব)	৩
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	২
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১
জামায়াতে ইসলামী	২
বাংলাদেশ জাতীয় পাটি (বি.জে. পি.)	১
ইসলামী ঐক্য জোট	০
স্বতন্ত্র	৪
মোট	৩০০

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৩০টি আসন পেয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। সার্বিকভাবে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়। নির্বাচনে ৮৭ ভাগেরও বেশী ভোট পড়ে। ১২ই জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে স্থগিত (মহাজোট প্রার্থী নূরুল ইসলামের মৃত্যুতে) হওয়া আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী জয় লাভ করে। মহিলাদের জন্য যে ৪৫টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে ঐ আসনগুলো ৩৬টি আওয়ামী লীগ ও ৪টি জাতীয় পার্টি পায় এবং বিএনপি পায় ৬টি আসন। ৩৪৫টি আসনের সংসদে মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৫। বিএনপি ৩৭টি, জাতীয় পাটির আসন দাঁড়ায় ৩১টি।[৯২]

নির্বাচনে অনেক হেভিওয়েট রাজনীতিবিদ পরাজিত হন তন্মধ্যে– বিএনপির সাইফুর রহমান, আব্দুল মান্নান ভূইয়া, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সাদেক হোসেন খোকা, বিকল্পধারা বাংলাদেশের প্রফেসর এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মেজর (অব.) আব্দুল মান্নান, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, গণফোরামের মফিজুল ইসলাম কামাল ও কমান্ডার আব্দুর রউফ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পার্টির খালেকুজ্জামান চৌধুরীসহ আরও অনেকে।

পর পর পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় বিএনপির ভাবমূর্তি এ নির্বাচনে খারাপ ছিল। উপরন্তু দেশে জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রণে বিএনপির ব্যর্থতার নির্বাচনে তাদেরকে পিছনে ঠেলে দেয়। নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিএনপির কর্মকাণ্ড জনগণকে তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পিছনে তরুণ ভোটারদের জোরালো ভূমিকা ছিল। তারা আওয়ামী লীগের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। এ ছাড়া দলটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সকল স্তরের ভোটারের সমর্থন পায়।

২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮-এ ঐতিহাসিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত নবম জাতীয় সংসদের ঘটনাবহুল প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ২৫শে জানুয়ারি এবং ৭ই এপ্রিল শেষ হয়। ২৫শে জানুয়ারি শুরু হয়ে মাঝখানে বিরতিসহ এই অধিবেশন চলে ৩৯ দিন। সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জারী করা অধ্যাদেশগুলো অনুমোদন দেবে। সে লক্ষ্যে আইন বিশেষজ্ঞ এবং সংসদের বিশেষ কমিটি আলাদা আলাদাভাবে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয় ১২২টি অধ্যাদেশের ৫৪টিকে বৈধতা দেওয়ার। এ লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৪১টি বিল অধ্যাদেশ আকারে উপস্থাপন করা হয় যার মধ্যে ৩১টি পাস হয়। সেবার সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ৪৮টি স্থায়ী কমিটির সবগুলো গঠন করা হয়, যা সংসদীয় ইতিহাসে রেকর্ড। তা ছাড়া সাতটি কমিটির সভাপতি করা হয় ক্ষমতাসীন দলের বাইরে থেকে, যা এবারই প্রথম। এ ছাড়া প্রথম অধিবেশনেই যোগ দেন সংরক্ষিত আসনের ৪৫জন মহিলা সদস্য।[৯৩]

নবম জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের পেশার বিবরণ

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন পেশার নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে– সামরিক আমলা ৬%, বেসামরিক আমলা ৪%, ব্যবসায়ী ৫৭.৩৩%, আইনজীবী ১৪%, রাজনীতিবিদ ৪%, অন্যান্য ৪%।[৯৪] এইবারেও দেখা যায় নির্বাচনে ব্যবসায়ীদের সাফল্যের হার বেশী।

কয়েকটি কারণে ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮-এর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল দুই বছর আগে। কিন্তু ২০০৭ সালের ২২শে জানুয়ারির সেই ঘোষিত নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছিল চারদলীয় জোটের বাইরের সব রাজনৈতিক দল। পরিস্থিতি

এমনই সংঘাতময় হয়ে উঠেছিল যে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের ইস্তফা, জরুরী অবস্থা জারী ও সেই নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরপর নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও সংস্কার, নির্বাচনী আইন সংশোধনসহ নানা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, ছবিসহ শুদ্ধ ভোটার তালিকা তৈরী করা হয়েছে। এ সবের বাইরে চলেছে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান, রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তনের প্রয়াস। নতুন বিধানে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন হয়েছে। সব মিলিয়ে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যেই সামগ্রিক প্রয়াস ও প্রস্তুতি জনগণের মনে এমন একটি আশাবাদের সঞ্চার হয় যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি সুষ্ঠু, জনকল্যাণমুখী ও শান্তিকামী ধারা সূচিত হবে। গণতন্ত্র বিকশিত হবে, দেশ পরিচালিত হতে থাকে আইনের শাসনের ভিত্তিতে।[৯৫]

২০০১ সালে খালেদা জিয়ার শাসনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য জঙ্গীবাদের উত্থান এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করা। জঙ্গীবাদের উত্থানের ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ হয় এবং এই সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করা হয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল তারা যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না যায়। কারণ বিএনপি এবং জামায়াত ইসলামীর ধারণা সংখ্যালঘুদের ভোট আওয়ামী লীগ পায়। এটাও একটি কারণ তাদের উপর অত্যাচারে।

নির্বাচনী কাজে প্রভাব বিস্তার করার জন্য বিচারপতি কে এস হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা করার জন্য বিচারপতিদের বয়স ৬৭ বছরে উন্নীত করা হয়। জিয়া ও এরশাদের সময় নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করা হত খালেদা জিয়া তা থেকে বের হয়ে আসতে পারেন নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্কিত না হলে তা মেনে নেওয়া যেত কিন্তু জাল ভোটার অন্তর্ভুক্ত, দলীয় কমিশনার নিয়োগ ইত্যাদি কারণে মানুষ কমিশনের উপর আস্থা হারায় এবং অন্তিমে দেখা যায়– তত্ত্বাবধায়ক সরকার পর্যন্ত বিতর্কিত হয়ে যায়।

২০০৬-এর শেষের দিকে এবং ২০০৭ সালে প্রথম দিকে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং তা থেকে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সূচনা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দলীয়করণ করায়। ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয় এবং তিনি প্রতিটা ক্ষেত্রেই দলীয় আধিপত্য মেনে নেন। ফলে বেশ কয়েক জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। আর সেনাবাহিনী আবার ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ পায়। পূর্ববর্তী বিশৃঙ্খলতার জন্য সাধারণ মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মেনে নেয়। যা সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পাকিস্তানীদের মতো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং প্রথম দিক বিএনপি-জামায়াতের প্রতি সহনুভূতি দেখায়। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন হয় তত্ত্বাবধায়কের সময়ও তা শুরু হয় এবং সব দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ও সমর্থনে আন্দোলন হয়।

রাজনৈতিকদের রাজনীতি থেকে মাইনাস করার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সুশীলসমাজ এগিয়ে আসেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য। যে প্রক্রিয়া ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সময় দেখা গিয়েছিল।

তবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু করার জন্য যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে তাতে জনগণের সমর্থন ছিল। যে কারণে বহুদিন পর একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরী হয়। নির্বাচন কমিশনও পুনর্গঠন করা হয়। যার ফলে জনগণের আস্থা ফিরে আসে নির্বাচনের উপর।

২০০১ সালে সামরিক বাহিনী যেভাবে বিএনপিকে সমর্থন করেছিল, এবার সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে জনরোষের কারণে। এই জন্য নির্ভয়ে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ যে ইশতেহার দিয়েছিল মানুষ তা সমর্থন করেন।

তথ্যপঞ্জি

[১] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড , ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৮

[২] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০১

[৩] *সংবাদ*, ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০১

[৪] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০১

[৫] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৪৮

[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

[৯] *The Daily Star*, 2 0ctober 2001

[১০] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৪৮

[১১] তারিক হোসেন খান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৬৮

[১২] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৪৮-৪৯

[১৩] Abul Fazl Haq, *The Ninth Parliament Election:A Socio-Political Analysis*, 2009

[১৪] *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, পৃ. ৫০

[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১

[১৬] মোঃ এখলাছুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র : একটি বিশ্লেষণ*, (এম.ফিল অভিসন্দর্ভ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০

[১৭] http:// data worldbank.org/indicator/NY.GDP.MK…

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯

[১৯] এ কে এম শাহনাওয়াজ, *সমাজ-রাজনীতির এক দশক (২০০০-২০০৯)*, নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০১১, ঢাকা, পৃ. ২৮

[২০] *প্রথম আলো*, ৮ই নভেম্বর ২০০৬

[২১] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৮

[২২] *সংবাদ*, ১৪ই ডিসেম্বর ২০০৮

[২৩] *প্রাগুক্ত*, ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৮

[২৪] আবুল বারাকাত, *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত “ধর্ম ও রাজনীতি : দক্ষিণ এশিয়া” শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে পঠিত নিবন্ধ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.১৯-২১

[২৫] তারেক শামসুর রেহমান, *গণতন্ত্রের সংকট প্রসঙ্গে*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২০১

[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

[২৭] তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : সূচনা ও বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ*, কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৩

[২৮] *গণতন্ত্রের সংকট প্রসঙ্গে*, পৃ. ২০১

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২-২০৩

[৩০] *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: সূচনা ও বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ*, পৃ. ৬৯
[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩
[৩২] তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৭৯
[৩৩] মুনতাসীর মামুন, *দুঃসময়ের দিনগুলি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৭৪
[৩৪] *দুঃসময়ের দিনগুলি*, পৃ. ১৭৫
[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫-১৭৬
[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭
[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৬
[৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮
[৩৯] *সমাজ-রাজনীতির এক দশক (২০০০-২০০৯)*, পৃ. ২৯
[৪০] *সংবাদ*, ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৮
[৪১] *প্রাগুক্ত*
[৪২] *দুঃসময়ের দিনগুলি*, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯
[৪৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯
[৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯-৩৭০
[৪৫] *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : সূচনা ও বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ*, পৃ. ৭৩-৭৪
[৪৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৪
[৪৭] *দুঃসময়ের দিনগুলি*, পৃ. ৩৮২-৩৮৩
[৪৮] মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, *১৪ দল ও মহাজোটের আন্দোলন*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪০
বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ জামায়াতের সংলাপে অংশ নেওয়া না নেওয়া প্রশ্নে দু'টো মত রাখছেন। তাদের নেতৃবৃন্দের একটি অংশ বলছেন, আলোচনায় সরকারপক্ষ থেকে কারা থাকবেন কি থাকবেন না সেটি বিরোধী দলের বিষয় নয়, তা সরকারের একান্ত বিষয়। আর যেহেতু জোটের অন্যতম শরিকদল হচ্ছে জামায়াত– তাই জামায়াতকে বাদ দেওয়ার বিরোধী দলের দাবী তারা মানতে যাবে কেন? তারা বিষয়টিকে বিরোধী দলের তাদের জোটের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপকৌশল হিসেবে দেখছেন এবং আখ্যায়িত করছেন। অপর একটি অংশ অবশ্য মনে করছেন, ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলো যদি এককভাবে আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারে– তাহলে ৪ দলীয় জোটের শরিকরা কেন বিএনপি'র ওপর আস্থা রাখবে না?
[৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১
[৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪
[৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৫
[৫২] *সমাজ-রাজনীতির এক দশক (২০০০-২০০৯)*, পৃ. ৩৯
[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০
[৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১
[৫৬] *যুগান্তর*, ২২শে অক্টোবর ২০০৬
[৫৭] *প্রাগুক্ত*, ২৮শে অক্টোবর ২০০৬
[৫৮] *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : সূচনা ও বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ*, পৃ. ৭৫-৭৬
[৫৯] *যুগান্তর*, ৩০শে অক্টোবর ২০০৬
[৬০] *বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, পৃ. ৭৯

---

[৬১] ২৮শে অক্টোবর ২০০৬ তারিখে বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। ২৯শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সংবিধানের ৫৮(গ-৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের জন্য শপথ গ্রহণ করেন। ৩১শে অক্টোবর তিনি ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। উপদেষ্টাগণ হলেন : বিচারপতি মোঃ ফজলুল হক, ড. আকবর আলি খান, লে. জে. (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী, সিএম শফি সামি, ধীরাজ কুমার নাথ, মাহবুবুল আলম, এম আজিজুল হক, ডা. সুফিয়া রহমান, ইয়াসমিন মুর্শেদ ও সুলতানা কামাল।

[৬২] ১১ই ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে পদত্যাগী ৪ উপদেষ্ট হলেন : ড. আকবর আলি খান, সিএম শফি সামি, লে. জে. অব. হাসান মশহুদ চৌধুরী ও এডভোকেট সুলতানা কামাল।

[৬৩] এ পর্যায়ে সেদিনই নিয়োগ পাওয়া নতুন ৪ উপদেষ্টা হলেন : ড. শোয়েব আহমদ, প্রফেসর এম মঈনউদ্দীন খান, সফিকুল হক চৌধুরী ও মেজর জে. অব.রুহুল আলম চৌধুরী।

[৬৪] *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : সূচনা ও বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ*, পৃ.৭৬

[৬৫] *প্রথম আলো*, ৬ই জানুয়ারি ২০০৭

[৬৬] *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : সূচনা ও বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ*, পৃ.৭৬-৭৭

[৬৭] *প্রথম আলো*, ৫ই জানুয়ারি ২০০৮

[৬৮] *প্রাগুক্ত*, ৬ই জানুয়ারি ২০০৮

[৬৯] *বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, পৃ. ৭৭

[৭০] ড. ফকরুদ্দীন আহমদ ১৩, ১৬ ও ১৮ই জানুয়ারী-এ তিন ধাপে ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। এ উপদেষ্টাগণ হলেন : ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, ড. এ বি মির্জ্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম, মেজর জে. অব. এম এ মতিন, বেগম গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী, তপন চৌধুরী, ড. আইয়ুব কাদরী, মেজর জে. অব. ডা. এ এস এম মতিউর রহমান, আনোয়ারুল ইকবাল, ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী ও ড. চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম।

প্রথম আলো, ১৩ই জানুয়ারি ২০০৭

[৭১] ৮ই জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে পদত্যাগী ৪ উপদেষ্টা হলেন : ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, তপন চৌধুরী, মেজর জে. অব. ডা. এএসএম মতিউর রহমান ও গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী। তবে দাবী করা হয়, এ ৪ উপদেষ্টা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন নি বরং তাদের পদত্যাগে বাধ্য বা চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। এর আগে ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে ফ্রান্সের গিমে জাদুঘরে বাংলাদেশের পুরাকীর্তি প্রেরণ কেলেঙ্কারীর নৈতিক দায় স্বীকার করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা ড. আইয়ুব কাদরী পদত্যাগ করেছিলেন।

৯ই জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে নিযুক্ত ৫ উপদেষ্টা হলেন : ড. এএসএম শওকত আলী, মেজর জে. অব. গোলাম কাদের , এডভোকেট এ এফ হাসান আরিফ ও ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।

[৭২] ১২ই জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় নিযুক্ত ৩জন 'প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী' হলেন: চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, ব্রিগেডিয়ার অব. ডা. এম এ মালেক, ড. ম. তামিম। এরপর ২১ই জানুয়ারি মন্ত্রীর মর্যাদায় মাহবুব জামিলকে এবং প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় মানিক লাল সমাদ্দারকে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী নিয়োগ করা হয়।

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : সূচনা ও বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ, পৃ. ৭৮

[৭৩] *বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, পৃ. ৭৭

[৭৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০৫, পৃ. ৪০-৪৬

[৭৫] *বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, পৃ. ৭৭-৭৮

[৭৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

[৭৭] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৮০-৮১
[৭৮] ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ডেসপটিক রাষ্ট্র*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩৫
[৭৯] *বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, পৃ. ৮১
[৮০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২
[৮১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, [সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত], ২০১১, পৃ. ৪৩
[৮২] সৈয়দ আতিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকরের কার্যক্রম ১৯৯৬ এবং ২০০১ : একটি বিশ্লেষণ*, (পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ২৩১
[৮৩] ecs.gov.bd/English/index.php
[৮৪] *প্রথম আলো*, ২রা ডিসেম্বর ২০০৮
[৮৫] *সংবাদ*, ১৪ই ডিসেম্বর ২০০৮
[৮৬] *প্রাগুক্ত*
[৮৭] *প্রাগুক্ত*
[৮৮] *প্রাগুক্ত*
[৮৯] বদিউল আলম মজুমদার (সম্পাদিত), *সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন*, সুজন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২০০-২০৫
[৯০] *প্রথম আলো*, ২৯ই ডিসেম্বর ২০০৮
[৯১] নির্বাচন কমিশন, ২০০৯
[৯২] *প্রথম আলো*, ৩১ই ডিসেম্বর ২০০৮
[৯৩] তারেক শামসুর রেহমান, পৃ. ৮২-৮৩
[৯৪] Abul Fazl Haq, *The Ninth Parliament Election:A Socio-Political Analysis*, 2009
[৯৫] *প্রথম আলো*, ২৯ই ডিসেম্বর ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশে গণতন্ত্র নতুন কিছু নয়। গণতন্ত্রের ঐতিহ্য আগে ছিল, তারপর মাঝে হারিয়ে গেছে; এখন আবার ফিরে এসেছে। এ ভূ-খণ্ডের মানুষের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র কখনই দীর্ঘজীবী বা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতেই তারা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারায় নি। গণতন্ত্রের এই আকাঙ্ক্ষা রাজপথের রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে বার বার, এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এমনকি স্বৈরাচারী শাসকদেরও হটিয়েছে। কিন্তু এটাও সত্য যে যথার্থ গণতন্ত্র যেন বাংলাদেশের মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে।[১] 'বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র; ১৯৯১-২০০৮' শিরোনামটি মূলত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরের সময়। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা হয় তা কতটুকু গণতান্ত্রিক বা গণতন্ত্রের পথে আমাদের অগ্রযাত্রা কতখানি কিংবা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা কতটুকু তা উপর্যুক্ত অধ্যায়গুলোতে উপস্থাপিত তথ্য উপাত্ত, ব্যাখ্যা অভিমত ইত্যাদির আলোকে পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

১৯৫৪-এর নির্বাচনে সরকারী দল মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। কিন্তু নির্বাচনে তৎকালীন সরকার কারচুপির প্রচেষ্টা করে নি। পূর্ব বাংলায় নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগ বার বার নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েছে। একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট বন্ধ হতে পারে না, একটি নির্দিষ্ট সময় থাকবে তারপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর সব দেশেই নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ থাকে অর্থাৎ সময় অতিবাহিত হবার পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে একটি ব্যতিক্রমী বিষয় হল সরকারী দল মুসলিম লীগ বলছে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নি। এবং কারচুপির অভিযোগ করছে সরকারী দল। ১৯৫৪ সালের ঘটনাই আমরা দেখি ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আঁতাত করছে কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য দেখা দেয়। এখনো একই ধরনের বিষয় আমরা লক্ষ্য করি যে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থে কীভাবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বা পাকিস্তান সরকার পূর্ব বঙ্গে কোনো দলীয় রাজনৈতিক সরকার স্বাধীনভাবে কাজ করুক তা তারা চায় নি। বাংলাদেশ আমলেও এই ধারাটি অব্যাহত থাকে, রাজনৈতিক সরকার যাতে শাসন করতে না পারে সে ব্যাপারে আমলারা বিশেষ করে সামরিক আমলারা পাকিস্তান আমলকে অনুকরণ ও অনুসরণ করছে। এখনকার রাজনীতিতেও এই বিষয়টি বিরাজমান। সামরিক বাহিনী সুযোগ পেলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির উপর হস্তক্ষেপ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে রাজনৈতিক ইতিহাস তাতে আমরা ২টি বিষয় লক্ষ্য করি। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী নানা অজুহাতে বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে শাসন করতে দেয় নি। তার প্রমাণ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ক্ষমতাসীন দল ও রাজনীতিবিদরা দুই পক্ষই বিতর্কিত করে তোলে। আইয়ুব খান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের শাসন কার্য চালিয়ে নেন, রাজনীতিবিদদের শাসন করতে না দেওয়ায় ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু নির্বাচন না হলে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্ন ওঠে তাই আইয়ুব খান মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনের আয়োজন করত। নির্বাচনের ফলাফল যাতে পক্ষে যায় তাই 'হ্যাঁ-না' ভোট করেছে। অর্থাৎ নির্বাচনী প্রক্রিয়া তিনি ধ্বংস করেন। গণতান্ত্রিক ধারা যাতে না থাকে সে উদ্দেশ্য তিনি 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রবর্তন করেন– যা এক ধরনের অভিনব গণতন্ত্র । সে সময় রাজনৈতিক সমাজ এর প্রবল বিরোধিতা করতে পারত কিন্তু তা তারা করে নি। বরং তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়া বিনষ্ট করতে রাজনৈতিক সমাজ আইয়ুব খানকে সহযোগিতা করেছে। অন্তিমে তা রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধেই গেছে।

আইয়ুব খানের পরে আমরা দেখি দাবী আসছে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচন বিষয়টি যে মূল সে বিষয়টি আবার প্রতীয়মান হয়। ওই সময় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংস্কারে দাবী উত্থাপিত হয়। ফলে ১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনা হয়। যেমন : সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোটদান পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র বাতিল যার মাধ্যমে সর্বজনীন ভোটাধিকার সীমিত করা হয়েছিল। ফলে এক দিক থেকে বলা যেতে পারে ১৯৫৪-এর নির্বাচনের পরে ১৯৭০ সালেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অধীনে। এবং এই দুইটি নির্বাচনেই বাঙ্গালীরা তার মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে। এবং তা ছিল কেন্দ্রীয় দুশাসনের বিরুদ্ধে। বাঙ্গালীর গণতন্ত্রের প্রতি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তা ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেন। তারা নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করে অথবা সেই প্রক্রিয়াটি বিতর্কিত করে তোলার চেষ্টা করে। যাতে মানুষের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা আসে এবং পরে সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ দেখায়।

এইভাবে পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংসের ব্যবস্থা করে যা বাংলাদেশে পরবর্তীকালে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং যাকে আমরা বলা হয় 'গণতন্ত্রের পাকিস্তানীকরণ'।

বঙ্গবন্ধু আমলে ১৯৭৩ সালে নির্বাচন হয় নির্বাচিত সরকারের অধীনেই। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে কোনো অভিযোগ ওঠে নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তার কারণে তখন কোনো বিরোধী দলের বড় ধরনের সফলতা পাবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ১৯৭৫-এর পর নির্বাচন প্রক্রিয়া আবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়। উল্লেখ্য, জিয়া এবং এরশাদ রাষ্ট্রকে পাকিস্তানীকরণ করতে প্রচেষ্টা চালায়। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সামরিক ও আমলাতন্ত্রের

শাসন এবং নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ ও কারচুপির ব্যাপক প্রচলন হয়। জিয়া 'হ্যাঁ-না' ভোটের প্রচলন করেন এবং আইয়ুব খানের মতো ভোট কারচুপির চালু করেন। বিরোধী দলগুলো প্রতিবাদ ও আন্দোলন না করে সহযোগিতা করে সামরিক স্বৈরশাসককে। ফলে পাকিস্তানী ধারা আবার প্রতীয়মান হয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে নির্বাচনকে মূল্যহীন করার প্রচেষ্টা করা হয়। এরশাদ ও জিয়া একইভাবে একই প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা করায়াত্তের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন আইয়ুব খানের মতো। ১৯৪৭-১৯৯০ সালের মধ্যে এরশাদ আমলে নির্বাচনকে যেভাবে প্রহসন ও প্রভাবিত করা হয়েছিল তা আর কখনও হয় নি। এরশাদের স্বৈরশাসন প্রতিরোধে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল কারণ ওই দুঃশাসন আর বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনের বিকল্প নেই। অথচ আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশনকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াতেই দেওয়া হয় নি।

১৯৭৫-এর পর আর একটি বিষয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উঠে আসে, তা হল নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব নয়। রাজনীতিবিদরা ওই শাসকদের সহযোগিতা করেছিল, তারাই আবার ঐকমত্যে পৌঁছেন নির্বাচিত সরকার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না। ১৯৯০ সালে সেই জন্যই প্রথমবারে মতো অন্য ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা হল যা পরবর্তী সময়ে তত্ত্বধায়ক সরকারের বীজ বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এই ধরনের সরকার রাজনীতিবিদ ও রাজনীতির প্রতি যে অনাস্থা তা তারা সে সময় বুঝতে পারেন নি।

১৯৯১ সালে নির্বাচনের পর মানুষ আশা করেছিল যে বহুদিন পর একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কের অবসান হবে। ৯১ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করলেও যেহেতু সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছিল রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষ তা মেনে নেয়। কিন্তু বিএনপি রাজনীতিতে জিয়াকে অর্থাৎ পাকিস্তানী ধারা ব্যবহার করে এবং সব পক্ষই রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করে। ফলে ধর্মের ব্যবহার রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে শুরু হয়। লক্ষণীয় কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী আইন করা হবে না বলে– বিএনপি, আওয়ামী লীগসহ সব দলই এমন ওয়াদা করে। এইভাবে ধর্মের ব্যবহার তারা রাজনীতিতে নিয়ে আসে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ নির্বাচন কমিশনের ভিত শক্ত করতে চেয়েছিল যাতে জনগণের আস্থা ফিরে আসে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি নির্বাচন কমিশনের উপর নির্বাচিত সরকার প্রভাব বিস্তার করে। তা নির্বাচনই শুধু নয়; নির্বাচন কমিশনকেও বিতর্কিত করে। খালেদা জিয়া সরকারের সময়ের উপ-নির্বাচনগুলো এরশাদের সময়কে মনে করিয়ে দেয়। সেই কারণে বিএনপি আমলের (১৯৯১-১৯৯৬) শেষের দিক নির্বাচন নিয়ে সংশয় হয় এবং সরকার তার সূচনা করে। যার কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিবর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়, যারা তিনমাসের জন্য সরকার পরিচালনা করবে। কিন্তু এই প্রশ্ন তখন কেউ করে নি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য যারা হবেন তারাও সবাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক, যার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয় রাজনীতিবিদগণ তাদের নিজেদের প্রতি আস্থা না রেখে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপর আস্থা রাখেন যা গণতন্ত্রের বিপরীত। নির্বাচন নিয়ে এই বিতর্কের পরেও ওই নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার সফলভাবে নির্বাচন সম্পূর্ণ করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের সময় সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে যা ইতিবাচক দিক। সংসদ গণতন্ত্রের প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে একটা সংসদ প্রতিষ্ঠা হয়, যার প্রধান হন প্রধানমন্ত্রী– যা সংসদীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তত্ত্ববধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করে এটা প্রমাণিত হয় পাকিস্তান আমলে গণতন্ত্রের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে রাজনৈতিক নেতা বেরিয়ে আসতে পারে নি।

১৯৯১-এর নির্বাচন আর একটি বিষয় তুলে ধরে তা হল– রাজনীতিতে কালোটাকার ব্যবহার এবং কালোটাকার অধিকারী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য। পাকিস্তান আমলে নির্বাচনে কালোটাকার ব্যবহার দেখা যায় নি। তবে রাজনীতিতে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রাধান্য ছিল। বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানের সময় রাজনীতিতে কালোটাকার ব্যবহার ও ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ততার শুরু হয় এবং এরশাদের সময় তা চরম আকার ধারণ করে। আমরা দেখি ১৯৯১ সালে তা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পায়। ওই নির্বাচনে বিজয়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ী ছিলেন ৩৮.৬৭%। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে কালোটাকার ব্যবহার রুদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। কেননা রাজনীতি তখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে ব্যবসায়ীদের। এটি গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক দিক নয়।

১৯৯৬ সালে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানে নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পরেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৃঢ়তার কারণে তা সম্ভব হয় নি। এ সময় রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বাড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মের প্রতি দুর্বলতার কারণে জঙ্গীবাদের উত্থান হয়। নির্বাচনী আচরণবিধি ৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধণ করে তৈরী করা হয়। তাই পূর্বের আচরণবিধির সাথে খুব বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। নির্বাচন কমিশন কঠোরভাবে নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ করতে পারলে যে-কোনো সময় সুষ্ঠু নির্বাচন এই বিধির অধীনে অনুষ্ঠান করা সম্ভব। নির্বাচন কমিশন ভোটাদের সচেতন করার জন্য নতুন পদক্ষেপ নেয়। তারা প্রায় ৯ লাখ কপি আচরণবিধি সারা দেশে বিতরণ করে। ওই নির্বাচনেও কারচুপির অভিযোগ ওঠে।

১৯৯৬-এর নির্বাচনেও ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ব্যবসায়ী ৩৮.৬৭% নির্বাচিত হয় এবং ১৯৯৬ সালে ব্যবসায়ী ৪৩.৬৭% যা ১৯৯১ তুলনায় ৫% বেশী। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নির্বাচনে শঙ্কা না থাকায় নারী ভোটাগণ বেশী পরিমাণ ভোট প্রয়োগ করে।

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে বিরোধী দলসমূহের সংসদ বর্জন করা একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বিএনপি সরকারের সময় শেখ হাসিনা সংসদ বর্জন করেন। এবং শেখ হাসিনা সরকারের সময় খালেদা জিয়া সংসদ বর্জন করেন। ফলে সংসদ থাকছে কিন্তু ক্রমেই তা সরকার দলীয় সংসদে পরিণত হচ্ছে। তবে শেখ হাসিনার সময় তুলনামূলকভাবে রাজনীতি স্থিতিশীল থাকায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লীগ চেষ্টা করেছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কিন্তু পারে নি। এই সময়ে জঙ্গীবাদের উত্থান হয় এবং যার সাথে বিএনপি ও জামায়াতের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া যায়।

২০০১ সালে খালেদা জিয়ার শাসনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য জঙ্গীবাদের উত্থান এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করা। জঙ্গীবাদের উত্থানের ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ হয় এবং এই সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করা হয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল তারা যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না যায়। কারণ বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর ধারণা তাদের ভোট আওয়ামী লীগ পায়। এটাও একটি কারণ তাদের উপর অত্যাচারের।

নির্বাচনী কাজে প্রভাব বিস্তার করার জন্য বিচারপতি কে. এম. হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা করার জন্য বিচারপতিদের বয়স ৬৭ বছরে উন্নীত করা হয়। জিয়া ও এরশাদ নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করেছিল খালেদা জিয়া তা থেকে বের হয়ে আসতে পারেন নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্কিত না হলে তা মেনে নেওয়া যেত কিন্তু জাল ভোটার অন্তর্ভুক্ত, দলীয় কমিশনার নিয়োগ মানুষ কমিশনের উপর আস্থা হারায় এবং অন্তিমে দেখা যায়– তত্ত্বাবধায়ক সরকার পর্যন্ত বিতর্কিত হয়ে যায়। এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সাথে সাথে তা নিয়ে বিতর্ক ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দলীয়করণ করায় ২০০৭ সালে বিতর্ক এবং প্রচণ্ড সংঘর্ষের সূচনা হয়। ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করা হয় এবং তিনি দলীয় আধিপত্য মেনে নেন। ফলে বেশ কয়েক জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। আর এ বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে সেনাবাহিনী আবার ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ পায়। পূর্ববর্তী বিশৃঙ্খলতার জন্য সাধারণ মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মেনে নেয়। যা সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পাকিস্তানীদের মতো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং প্রথম দিক বিএনপি জামায়াতের প্রতি সহনুভূতি দেখায়। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন হয় তত্ত্বাবধায়কের সময়ও তা শুরু হয় এবং সব দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ও সমর্থনে আন্দোলন হয়। রাজনৈতিকদের রাজনীতি থেকে মাইনাস করার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সুশীল সমাজ এগিয়ে আসেন

তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য। যে প্রক্রিয়া ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সময় দেখা গিয়েছিল।

তবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু করার জন্য যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে তাতে জনগণের সমর্থন ছিল। যে কারণে বহুদিন পর একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরী হয় এবং নির্বাচন কমিশনও পুনর্গঠন করা হয়। যার ফলে জনগণের আস্থা ফিরে আসে নির্বাচনের উপর।

২০০১ সালে সামরিক বাহিনী যেভাবে বিএনপিকে সমর্থন করেছিল, এবার সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে জনরোষের কারণে। এই জন্য নির্ভয়ে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ যে ইশতেহার দিয়েছিল মানুষ তা সমর্থন করেন।

সার্বিক বিষয় আলোচনা করে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হল যে, বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখনও ভঙ্গুর। এই ভঙ্গুর গণতন্ত্রের কারণসমূহ কি?

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ঠিক করতে না পারার কারণেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকটের তৈরী হয়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নির্বাচনই একমাত্র বৈধ পন্থা, যার মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। সূচিত হয় ক্ষমতার পালাবদল। এর দ্বিতীয় কোনো পন্থা এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নি। কাজেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচনই দিতে পারে সরকার পরিবর্তনের বৈধতা। নির্বাচন যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় সে ক্ষেত্রে সরকারের বৈধতাও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।[২] ১৯৭৩-এর পর প্রতিটি নির্বাচনই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এর কারণ শাসকরা নির্বাচন প্রক্রিয়া নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। ফলে এক সময় ওঠে এল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিপরীত একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের নিজেদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছে এক অনন্য পরিস্থিতিতে। এর পূর্বে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বেশ কয়েক বছর ধরে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। সে কারণেই একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নির্বাচনের ব্যাপারে জনগণের আস্থা ফিরে এসেছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাও প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, যে ব্যবস্থায় তিনটি নির্বাচন হয়েছে, সেটা দিয়ে আর নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না– এ রকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে।[৩] নির্বাচন সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন নিয়ে ২০০৬-২০০৭ সালে আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া সহিংস ঘটনা এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি এখনও আমাদের স্মৃতিতে ভাস্বর।[৪]

১৯৯১-এর পর থেকে কোনো নির্বাচনেই ভোট কারচুপির শক্ত কোনো অভিযোগ ওঠে নি। তবে নির্বাচন পূর্ব বিশৃঙ্খলা এই সময়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। কিন্তু বিরোধী দলসমূহ সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ তোলে। তাদের এ অভিযোগ তোলার কারণ এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র একটা শক্ত ভিত্তি না পাবার কারণ হল নির্বাচন কমিশন ও প্রক্রিয়ার প্রতি রাজনৈতিক দল ও

জনগণের আস্থার অভাব। নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলো চেষ্টা করেছে তাদের দলীয় অনুগত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার। যাতে তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। ফলে এই অবিশ্বাসের শুরু হয়ে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যারা নির্বাচনী নিয়মনীতি তৈরী করে এবং নির্বাচন পরিচালনা তথা ভোট গ্রহণ করে; যেহেতু নির্বাচন কমিশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিজস্ব কোনো জনবল নেই, তাদেরকে সরকারী কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই জেলায় ডিসি বা উপজেলায় ইউএনও বা কোনো সরকারী কর্মকর্তাকে রিটানিং অফিসার ও অন্যান্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। নির্বাচনকালীন সময়ে কাগজে-কলমে তারা নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তারা সরকারেরই আজ্ঞাবহ থাকে। শুধু তাই নয়, নির্বাচন কমিশন কাগজে-কলমে স্বাধীন হলেও দলীয় সরকারের আমলে তারা সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করে। ফলে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে নি বা পারে না। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভবও হয় নি।[৫]

ক্ষমতাসীন দলগুলো নির্বাচনী ফলাফল নিজেদের পক্ষে আনার জন্য তাদের অনুগত লোকদের দ্বারা একাধিক স্তরে প্রশাসনকে সাজায়। যাতে তারা যে-কোনো পরিস্থিতিতে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে। আর এটা 'ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং' নামে পরিচয় লাভ করে। 'ভোটে ইঞ্জিনিয়ারিং' ঠেকানোর জন্য বিরোধী দলগুলো আন্দোলন করে যাতে নির্বাচনে *লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড* তৈরী হয়। এই জন্যই নির্বাচনে আগে রাজনৈতিক অস্থিরিতা দেখা দেয়। রাজনৈতিক দলগুলোকেই এ সমস্যা থেকে বাংলাদেশকে বের করে আনার চেষ্টা করতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণে গণতান্ত্রিক বোধহীনতার প্রকাশ রয়েছে পদে পদে। গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ জনগণের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেওয়া, এর প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করা। অথচ বক্তৃতার মঞ্চ ছাড়া জনগণ উপেক্ষিত প্রকাশ্য রাজনৈতিক আচরণেও।[৬] বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ ২০০১-এর আগে কখনও পূর্ণ কার্যকাল শেষ করতে পারে নি। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এর প্রেক্ষাপটে ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ৭ই মার্চের নির্বাচিত সরকারের যবনিকা ঘটে। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ২৪ই মার্চ জেনারেল এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করায় ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাচিত সংসদের কার্যকাল শেষ হয়। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বাতিল করেছেন আরও দু'টো নির্বাচিত সংসদ একটি ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর এবং অন্যটি ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ই ফেব্রুয়ারি সম্পন্ন হয় ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২০০১ সালে কোনো সরকার মেয়াদ পূর্ণ করে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ২০০১ সালে ক্ষমতার হাত বদল হয় সংবিধানের নির্দেশ মতো। সংবিধান অনুযায়ীই সকল দলের অংশগ্রহণে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০১ সালে ১লা অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৭]

১৯৯১ সালে যে সরকার গঠন হয় তার বিরুদ্ধে নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবী নিয়ে বিরোধী দলগুলো যৌথভাবে আন্দোলন করছিল। এরই একটা পর্যায়ে বিরোধী দলসমূহ একযোগে পদত্যাগ করে। সরকার এক সাথে এতগুলো আসনে উপ-নির্বাচন না করে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আয়োজন করে। যার ফলে পঞ্চম জাতীয় সংসদ তার মেয়াদপূর্ণ করতে পারি নি।

সরকার বিরোধীদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী মেনে না নিয়ে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করে। ফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলসমূহ নির্বাচন বর্জন করে। ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিরোধী জোটের তীব্র আন্দোলনের মুখে সরকার সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে পদত্যাগ করে। ফলে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর সংক্ষিপ্ততম মেয়াদের সংসদ।

২০০১-২০০৬ সালের সরকার মেয়াদপূর্ণ করলেও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। নির্বাচন কমিশন সংস্কার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবে এই নিয়েই সমস্যার সূচনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল প্রধান বিচারপতিদের অস্বাভাবিক বয়স বৃদ্ধিকরণের কারণে। দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার শুরু হয়েছিল তার সুযোগ নিয়ে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭-২০০৮ পর্যন্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আবারও বাংলাদেশে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়।

ভোট কারচুপি করে ক্ষমতায় আসায় ১৯৯০ পূর্ববর্তী সরকারগুলো ক্ষমতার বৈধতাই পায় নি। ৯০ পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা যায়। তারা কোনো মতেই যেন পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে পারছিল না, আন্দোলন করছিল পরবর্তী নির্বাচনের জন্য এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবীতে।

নির্বাচনে ধর্ম ও কালোটাকার ব্যবহার ১৯৭৩-এর পর থেকে বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেক যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে আসেন নি। আর আসলেও বিজয়ী হতে পারেন নি। ফলে গণতন্ত্রের স্বচ্ছতাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। নির্বাচনী ব্যয় বিধি অনুযায়ী যতটা হওয়ার কথা প্রকৃত পক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশী হয়। এবং পরবর্তীকালে মিথ্যা স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশন এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)'র একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, ২০০৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিতদের মধ্যে ব্যবসায়ী ১৬৯জন এবং এদের মধ্যে কোটিপতি ১২৮জন, পেশাদার রাজনীতিবিদ মাত্র ১০জন।[৮] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ একটি রিপোর্টে প্রকাশ করেছে, যেখানে একজন প্রার্থীর নির্বাচনী খরচ ১৫ লক্ষের বিধান রয়েছে সেখানে ২০০৯-এর নির্বাচনে ৮৭% প্রার্থী গড়ে ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। ব্যক্তিগতভাবে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী ব্যয় করেছে ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ১৩% প্রার্থী যারা নির্বাচনী ব্যয়ের মাত্রা অতিক্রম করে নি, তাদের প্রায় সকলেই পরাজিত।[৯]

যদি স্থানীয় শাসনকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। তবে স্থানীয় প্রতিনিধিরা উন্নয়ন মূলক কাজ তদারকি করবে। সংসদ সদস্যদের যদি প্রশাসনিক ক্ষমতা না থাকে তাহলে ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে আগ্রহ হারাবে। ফলে রাজনীতি কালোটাকার হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু কোনো সরকারই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে আগ্রহ দেখায় নি।

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল ও গোষ্ঠী জনগণের কাছে করা প্রতিশ্রুতি বা যে নির্বাচনী ইশতেহার তারা প্রদান করে তা বাস্তবায়ন করে না। এই সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল আইয়ুব খানের সময় থেকে, আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেছিলেন বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিন্তু তা পালন করেন নি। জেনারেল জিয়াও ঘোষণা করেছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতায় তিনি উৎসাহী নন। তাঁর কাজ হচ্ছে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। পরবর্তীকালে দেখাগেল তার উল্টোটা। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে জিয়ার প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়নের জন্য একটি বৈঠক হয়। তাতে দেখা যায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক ও জনপথ বিভাগে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয় তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে প্রেসিডেন্টের প্রতিশ্রুতি এ দেশে বাস্তবায়নের ৬২ বছর সময় লাগবে। তবে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নিরিখে জেনারেল এরশাদকে ছাড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। তাঁর মতো প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী বাংলাদেশে খুবই কম জন্মেছে। তাঁর শাসনামলের ৯ বছর পুরোটাই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইতিহাস।

১৯৯০ সালের এরশাদ পতনের আগে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন দুইজোট ও বামপন্থী পাঁচদলীয় জোট এই তিনজোট একটি রূপরেখা তৈরী করেছিল। রূপরেখাটি ছিল জনগণের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ ক্ষমতায় যেই যাক এই রূপরেখা কার্যকর করবে। সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী মানুষ তাই এরশাদ হটানো আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

তিনজোটের রূপরেখার অন্যতম প্রতিশ্রুতি গণতন্ত্রায়ন। এ গণতন্ত্রায়নের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক ছিল–

১. সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ন, যার অর্থ ১৯৭৪ সালের বিশেষ আইন বাতিল থেকে গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন।

২. ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ উজ্জীবন ও

৩. সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব নিরসন

উল্লেখ্য, সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়নের কোনো প্রতিশ্রুতি নির্বাচিত বিএনপি সরকার রাখে নি। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক– *বিশেষ ক্ষমতা আইন* যা মৌলিক অধিকারের বিরোধী। সবদলই এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার সমালোচনা করেছে কিন্তু কেউ তা বাতিল করে নি। নির্বাচনের আগে সব মহল থেকে এটি বাতিলের দাবী উঠেছিল। এমনকি নির্বাচনের আগে বিএনপি এটিকে 'কালাকানুন' হিসেবে উল্লেখ করে তা বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রাখা হয় নি।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার বহুলাংশে নির্ভর করে শাসকদলের ওপর। বাংলাদেশের শাসকদলগুলো এ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে ছিল অপারগ। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার শক্তিশালী ভিত্তি রচনার শর্ত গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন। এ বিষয়ে সবাই সোচ্চার ছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে প্রস্তাব আনলে বিএনপি কণ্ঠভোটে তা নাকচ করে। উল্লেখ্য, প্রতিশ্রুত কোনো বিষয়ে বিএনপি ভ্রূক্ষেপ করে নি। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অনেক। ১৯৭৪ সাল আইন বাতিলে শেখ হাসিনার অনীহা ও মন্তব্য, সাধারণ মানুষ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হিসেবে দেখেছেন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। তবে জনগণ যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীকে প্রত্যাখ্যান করে তবে এই প্রক্রিয়া সুস্থ হয়ে উঠবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জাতির ভাগ্য নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র সংসদ। সাধারণ ভোটার তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন যাতে তারা সংসদে গিয়ে জনগণের জন্য কথা বলতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলো কখনও গণতন্ত্রকে শক্ত অবস্থানে দাঁড়াতে দেয় নি। সংসদে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব পালন ও তাদের দলীয় বক্তব্য শুনলে মনে হবে না ভোটারদের প্রতি তাদের কোনো কমিটমেন্ট আছে। দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তার বাইরে খুব একটা ভূমিকা রাখার পরিচয় পাওয়া যায় না।[১০] আর বিরোধী দলগুলো কারণে অকারণে সংসদ বর্জন করে সংসদকে বেশীর ভাগ সময়ই অকার্যকার করে রেখেছে।

বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহার বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচিত হলে দলগুলোর দায়িত্ব ও ভূমিকা কী হবে তা উল্লেখ করে না। এমনকি যে সব দল সরকার গঠন করার জন্য যত আসন প্রয়োজন তার চেয়ে কম প্রার্থী দাঁড় করায় তারাও সরকার গঠন করলে কি কাজ করবে তা ইশতেহারে যুক্ত করে। বিরোধী দলে থাকলে তারা কী করবে তা উল্লেখ করে না। এটাও একটা সমস্যা। কারণ সবাই ক্ষমতার অংশীদার হতে চায়। বিরোধী দলে থাকতে তারা একদমই পছন্দ করেন না। ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার মানসিকতা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে।

গণতন্ত্রে পরস্পরের প্রতি আস্থা রাখা ও বিরোধী দলকে গ্রহণযোগ্যতায় নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই মানসিকতার বড় অভাব সব সময়ই বাংলাদেশে বিরাজমান। এর ফলে দেশে একের পর এক সংকট তৈরী হয়েছে, যা দেশকে বার বার ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস আর ক্ষমতা ধরে রাখার প্রবণতা, বাংলাদেশের বিকাশমান গণতন্ত্রকে একটি ঝুঁকির মাঝে ঠেলে দিয়েছে।[১১]

১৯৯০ পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতা করায়ত্ত করার আকাঙ্ক্ষা, ৯০ পূর্ববর্তী সময়ে সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন জেনারেলদের উচ্চাভিলাষসহ রাজনীতিবিদদের আচরণ নানা কারণে এ দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে। গণতন্ত্রের এই গভীর সংকট একদিনে সৃষ্টি হয় নি। তাই একদিনে সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক রীতিগুলো চর্চার মাধ্যমে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক মানস অর্জন হবে। গণতন্ত্রও খুঁজে পাবে একটা শক্ত ভিত্তি।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। গণতন্ত্রকে টেকসই করতে হলে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে সব সরকারই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচন কমিশনের অপর হস্তক্ষেপ করেছে। নির্বাচন কমিশনে দলীয় অনুগত লোকদের বসানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও কর্মদক্ষ বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো গেলে নির্বাচনকেন্দ্রিক সমস্যা অনেকাংশেই দূর করা সম্ভব। এ জন্য নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া ও এর ক্ষমতা সম্পর্কে ঐকমত্য পৌঁছানো দরকার, যা সংসদেও আলোচিত হতে পারে। নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড খোলামেলা ও স্বচ্ছ হতে হবে। ভোটার তালিকা প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পরিষদে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে, যাতে জনগণ ভোটার তালিকার ভুল-ত্রুটিগুলো দূর করতে পারে। একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। যার একটা নিজস্ব সচিবালয় থাকবে। নির্বাচন কমিশন সরকারী বা বিরোধী কোনোদলকেই সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। জনগণের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে আস্থা গড়ে তুলতে হবে যে নির্বাচন কমিশন একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। নির্বাচন কমিশন নিজেদের বাজেট নিজেরা নিজেই তৈরী করবে এবং তা সংসদে পেশ করার সাথে সাথে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই পাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যারিস্টার রফিকুল-উল-হক ভারতের নির্বাচন কমিশনের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের তুলনা করে বলেন, "ভারতের নির্বাচন কমিশন অনেক এখতিয়ার রাখে আইনগতভাবে। আইন অনুযায়ী ভারতের কমিশন একজন মন্ত্রীকে কারাগারেও পাঠাতে পারে। আমাদের দেশের কমিশনের এমন কোনো এখতিয়ার নেই।"[১২] আমাদের দেশে দলীয় সরকার নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করার কথা বললেও নির্বাচন কমিশনকে এমন এখতিয়ার কখনও দেয় নি।

নির্বাচন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রসাশন ব্যবস্থার পেশাদারিত্ব নিয়ে কথা উঠেছে। প্রশাসনের জনবলকে নির্বাচিত সরকারগুলো অপব্যবহার করে। প্রশাসনের এই দুর্বল অবস্থা যে শুধু নির্বাচনে ক্ষেত্রেই তা নয়। তাদের পেশাদারিত্বের অভাবে দেশ আজ প্রতিটা ক্ষেত্রেই পশ্চাৎমুখী। একটি

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের অন্যান্য অগ্রগতি তরান্বিত করার পাশাপাশি নির্বাচনী ক্ষেত্রেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুস্ত করতে হবে যে তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। মানসিক দৃঢ়তা রেখে তাদের প্রজাতন্ত্রের জন্য কাজ করতে হবে।

আমাদের দেশে একদিনে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য যে সংখ্যক দক্ষ লোকবল দরকার তা নেই। যথেষ্ঠ লোকবল না থাকায় অদক্ষ, অপেশাদার ব্যক্তিদের ভোট গ্রহণের কাজে নিয়োজিত করতে হয়। ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। একই দিনে সারা দেশে নির্বাচন না করে এক সঙ্গে ১টি বা দু'টি বিভাগে ভোট গ্রহণ করার উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে নির্বাচনে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে কারচুপি কমবে। পরে তা এক সময় রীতিতে পরিণত হবে।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক দলের সংস্কার জরুরী হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেতৃত্ব বাছাইয়ের জন্য স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয় নেতা নির্বাচন করা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ কোনো দলেই স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়া নেই। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাপাসহ সব দলই এক ব্যক্তির নির্দেশে চলে– যা গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য সুসংবাদ নয়। ভারতে হাইকোর্টের নির্দেশে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে দলগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে যৌথ সুস্থ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্রায়ন এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়ে বলেন, "আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয়ক্ষেত্রে সুস্থ নির্বাচন চাইবে আর নিজ দলে নির্বাচন চাইবে না এ হিপোক্রেসি চলতে দেওয়া যায় না। নির্বাচনে দলগুলো বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেয় এবং নির্বাচনের পর তা পালন করে না। এভাবে বাংলাদেশে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের রাজনীতির প্রচলন হয়েছে এবং তা রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিশ্বাসহীন করে তুলছে। সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করা যাবে এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু কিছু তো পূরণ করা যায়।"[১৩]

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে হলে তার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদেরই নিতে হবে। নির্বাচন কমিশন শুধু নির্বাচন সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করতে পারে, যা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলতে পারে মাত্র। ব্যাপক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব। কাজেই দেশের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং দলের কাছে সচেতন নাগরিক ও ভোটারদের প্রত্যাশা অনেক।

রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সংবিধানের প্রয়োগ থেকে চেতনার প্রয়োগ আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য দু'টো মৌলিক জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকারের সংযম, অন্যটা হচ্ছে বিরোধী শিবিরের দায়িত্বশীলতা। ক্ষমতার ব্যবহারে সরকারের সংযম দরকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে নির্বাচন ও নির্বাচন-সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে।[১৪]

নির্বাচিত সরকারের অধীন সকল দলের অংশ গ্রহণে আমাদের দৃষ্টান্তমূলক নির্বাচন দরকার। যার মাধ্যমে আমাদের একটা স্টান্ডার্ড বা আদর্শ স্থির করতে হবে। যার নিচে আমরা নামতে পারব না এবং এর মধ্য দিয়ে এ দেশের জনগণ নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরে পাবে। নির্বাচন হল জনপ্রিয়তা প্রমাণের পরীক্ষা। একই সঙ্গে তা নেতৃত্বের সুবিবেচনারও পরীক্ষা। এর জন্য জরুরী পরীক্ষাটি হল ভোটের ফল মেনে নেওয়ার সদিচ্ছা ও সহনশীলতা প্রকাশের মাধ্যমে সব উদ্বেগের অবসান ঘটাতে সহায়তা করা।

১৯৯১ সাল থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে, সরকার ও প্রশাসন চাইলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব। অর্থাৎ সদিচ্ছার অভাবেই বাংলাদেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক সমস্যাসমূহ বিরাজ করছে। নির্বাচনকেন্দ্রিক সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না বলে রাজনীতিতে অস্থিরতা, হানাহানি, রাহাজানি ইত্যাদি বিদ্যমান। নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারলে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়। স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে কমিশন ভোটগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিশনের দৃঢ় অবস্থানের প্রতি সাধারণ মানুষ আস্থাশীল হওয়ায় ৮০%-এর উপর ভোটার ভোট প্রদান করেন; যা বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাস সব থেকে বেশী ভোট প্রদানের ইতিহাস।

শেখ হাসিনা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আদালতের নির্দেশে এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে তা বাতিল করে দেয়। যে কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে ২০১৩-২০১৪ সালেও বিএনপি আন্দোলন করে কিন্তু সংবিধান পরিবর্তন হওয়ায় এবং আদালতের রায়ের কারণে এ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি।

আন্দোলনের মাধ্যমে অনেক লোকক্ষয় হয়। কিন্তু এ সত্য বিরোধী দলসমূহ মানে নি নির্বাচিত সরকারের অধীনই নির্বাচন হবে। অথচ উপজেলা নির্বাচন ২০১৪-এ বিএনপি অংশ গ্রহণ করে এ প্রক্রিয়াকে মেনেই।

আমাদের দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সাংবিধানিক রূপ দিতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে বিরোধী দলসমূহকে আস্থায় নিয়ে তা করতে হবে। তাহলে সংশয়ের অবসান হবে। ফলে পরবর্তীকালে যদি কোনো দল সাংবিধানিক প্রক্রিয়া না মানে মানুষ তা যাচাই করতে পারবে। সংবিধানকে যে সব দল অবজ্ঞা করবে মানুষ তাদের বিরুদ্ধে ভোটের মাধ্যমে রায় দেবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোটের মাধ্যমে আদায় করে নিতে হবে।

পরিশেষে নির্দ্বিধায় বলা যায়, আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক তথা নির্বাচনী সংস্কৃতির উন্নতির যে ধারা সূচিত হয়েছে তা যেন ভবিষ্যতে আরও পূর্ণতা পায় তেমন আশাই আমরা করি। আমরা আশাহত হতে চাই না। দেশের মঙ্গলের জন্য রাজনীতির সুষ্ঠু ধারার মাধ্যমে গণতন্ত্র সুসংহত হোক এমনটাই আমরা আশা করি। বাংলাদেশের ভঙ্গুর গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য সুষ্ঠু

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তের সংস্কৃতি আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সরকার পরিবর্তনের পথ মসৃণ হলে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রথাগুলো চর্চার মাধ্যমে গণতন্ত্র পাবে একটা শক্ত ভিত্তি। একই সাথে বাংলাদেশে গণতন্ত্র হবে স্থিতিশীল এবং টেকসই। সমাজে রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই আমরা দ্রুত গণতান্ত্রিক স্থিতিশীল দেশ পরিণত হব এমন আশাও করা ঠিক হবে না। ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্রচর্চার মাধ্যমে একটি জাতি তা ধাতস্ত করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা আকড়ে থাকার মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। একই সাথে বিরোধী দলগুলোকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে– নির্বাচনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নির্বাচন কমিশন এবং পরোক্ষভাবে জড়িত প্রশাসন ও পুলিশকে দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

যদি নির্বাচন কমিশনকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তাহলে নির্বাচন নিয়ে যে অস্থিতিশীলতা তা– আর থাকবে না। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ না হলে সরকার ও বিরোধী দল সংসদে বসতে বাধ্য হবে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ফলে অর্থনীতিতে গতি আসবে, জঙ্গীবাদকে পৃষ্ঠপোষকতাদানকারী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিলোপ হবে। গণতন্ত্র ও সংসদীয় প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে। আর বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এটার উপর নির্ভরশীল।

তথ্যপঞ্জি

[১] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রচর্চা : প্রাতিষ্ঠানিক রূপ*, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), গণতন্ত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৮৮

[২] *যুগান্তর*, ২৮শে মার্চ ২০১২

[৩] *প্রথম আলো*, ১লা অক্টোবর ২০০৬

[৪] *যুগান্তর*, ২৮শে মার্চ ২০১২

[৫] সৈয়দ আতিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম ১৯৯৬ এবং ২০০১ : একটি বিশ্লেষণ*, (পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ২২৭

[৬] এ কে এম শাহনাওয়াজ, *সমাজ-রাজনীতির এক দশক (২০০০-২০০৯)*, নভেল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৯৫

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

[৮] মোঃ এখলাছুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র : একটি বিশ্লেষণ*, (এমফিল অভিসন্দর্ভ অপ্রকাশিত) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০

প্রথম আলো, ২রা জানুয়ারি ২০০৯

[৯] প্রাগুক্ত

[১০] *সমাজ-রাজনীতির এক দশক (২০০০-২০০৯)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

[১১] *যুগান্তর*, ২৮শে মার্চ ২০১২

[১২] *প্রাগুক্ত*

[১৩] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রক্রিয়া ও ঐকমত্যের উপাদান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৯

[১৪] *প্রথম আলো*, ১লা অক্টোবর ২০০৬

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা ভাষায় রচিত বই

অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., চট্টগ্রাম, (সাল নেই)

আবুল মাল আবদুল মুহিত, *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাতাশ মাস*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫

আবুল হোসেন, *শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্থপতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০১১

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *গণতন্ত্র ও নিরঙ্কশ ক্ষমতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯

আমানুল্লাহ কবীর, *সংঘাতের রাজনীতি*, জ্ঞান বিতরণ, ঢাকা, ২০০২

আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯

আসলাম সানী, *বিএনপি জোটের দুর্নীতির খতিয়ান*, অরনী, ঢাকা, ২০০৯

এ এস এম সামছুল আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১*, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যাণ্ড পাবলিকশন, ঢাকা, ২০০৩

এ কে এম শাহনাওয়াজ, *সমাজ-রাজনীতির এক দশক (২০০০-২০০৯)*, নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০১১

এমাজউদ্দীন আহমদ, *তুলনামূলক রাজনীতি : রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৮

এমাজউদ্দীন আহমদ, *সমাজ ও রাজনীতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ১৯৯০

তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, শিখা প্রকাশনী , ঢাকা, ২০০৮

তারিক হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৩

তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা : সূচনা ও বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ*, কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯

তারেক শামসুর রেহমান, *গণতন্ত্রের সংকট প্রসঙ্গে*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩

তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০
তালুকদার মনিরুজ্জামান, *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ*, শুভ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩
তালুকদার মনিরুজ্জামান, *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ*, শুভ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩
ফরহাদ মজহার, *সংবিধান ও গণতন্ত্র*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯
ফিরোজা বেগম, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২
বদরুদ্দীন উমর, *বাঙলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র*, সাহিত্যিক, ঢাকা, ২০০৩
বদিউল আলম মজুমদার, *গণতন্ত্র নির্বাচন ও সুশাসন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯
বেবী মওদুদ, গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা, আগামী প্রাকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ডেসপটিক রাষ্ট্র*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১০
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, *১৪ দল ও মহাজোটের আন্দোলন*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০
মাহমুদুর রহমান, *আওয়ামী লীগের একাল ও ভবিষ্যৎ*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯
মিজানুর রহমা চৌধুরী, *রাজনীতির তিনকাল*, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০১
মুনতাসীর মামুন, *গণতন্ত্রের ক্রান্তিলগ্নে*, খান ব্রাদার্স, ১৯৯৩
মুনতাসীর মামুন, *দুঃসময়ের দিনগুলি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০
মুনতাসীর মামুন, *নতুন শতকের রাজনীতি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৫
মুনতাসীর মামুন, *বন্দুকের ছায়ায় গণতন্ত্র*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩
মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রক্রিয়া ও ঐকমত্যের উপাদান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮
মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯
মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমান রায়, *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০
মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫
মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩
মুস্তাফা মজিদ, *রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র*, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০০১*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

মেজর জেনারেল মন্‌জুর রশীদ খান (অব.), *এরশাদের পতন ও সাহাবুদ্দীনের অস্থায়ী শাসন কাছে থেকে দেখা*, অঙ্কুর, ঢাকা, ১৯৯৬

মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনীতি ওয়ান ইলেভেন এবং তারপর...*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৯

মেহেদী হাসান পলাশ, *সংখ্যালঘু রাজনীতি*, বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা, ২০০১

মো. কামাল উদ্দিন, *বাংলাদেশে নির্বাচন ও নির্বাচনী তথ্য-উপাত্ত*, শৈলী প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১০

মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

মো. শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন, বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৮

শেখ হাসিনা সম্পাদিত, *বিএনপি'র দুঃশাসন উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের নমুনা*, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা, ১৯৯৬

শেখ হাসিনা, *বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

শেখ হাসিনা, *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

সজল আশফাক, *সংবাদ মাধ্যমে নির্বাচন ২০০১*, জাতীয়তাবাদী প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০২

সঞ্জয় চাকী, *ওয়ান ইলেভেন এবং অস্বাভাবিক সরকারের গল্প*, নির্বাচিতা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশ ১৯৯৬ : রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১

হাসানউজ্জামান, *সামরিক রাজনীতির চালচিত্র বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৩

সম্পাদিত গ্রন্থ

এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন*, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩

এ্যান্থণি ম্যাসকার্ণহাস, (অনুবাদক : মোহাম্মদ শাহজাহান), *বাংলাদেশ রক্তের ঋণ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০

নীল কমল বিশ্বাস (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতি : একাত্তর থেকে আটানব্বই*, এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০৭

পান্না কায়সার (সম্পাদিত), *গণতন্ত্রের সংগ্রাম ছিয়ানব্বই*, কৃষ্টি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭

বদিউল আলম মজুমদার (সম্পাদিত), *সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন*, সুজন, ঢাকা, ২০০৮

মতিউর রহমান সম্পাদিত, *গণতন্ত্রের ১৫ বছর*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭

মুহম্মদ জাহাঙ্গীর সংকলিত, *এরশাদের পতন : বিবিসিসহ বিদেশী গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে*, মাওলা, ঢাকা, ১৯৯২

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ : দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পটভূমি, ১৯০৫-১৯৫৮ (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২)

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১*, (ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২)

মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণ*তন্ত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬

বাংলাদেশের সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, [সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত], ২০১১

২. ইংরেজি ভাষায় রচিত বই

A Rigged Election An Illegitimate Government Bangladesh Election 2001, Centre For Research and Information, 2002

Ahmed, Moudud, *Bangladesh A Study of the Democratic Regimes*, UPL, Dhaka, 2012

Baxter, C., Bangladesh : *A Parliamentary Democracy, If they can keep it*, Current History, March 1992

Harun, Shamsul Huda, *Parliamentary Behavior In Multi-National State 1947-58 Bangladesh Experience*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1984

Hasan, Zoya (ed.), *Democracy in Muslim Societies, The Asian Experience*, Sage Publications, New Delhi.

Hasanuzzaman, Al Masud, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, UPL, Dhaka, 1998

Haq, Abul Fazl, *The Ninth Parliament Election:A Socio-Political analysis*, 2009

Khan, Shamsul I, Islam, S. Aminul & Haque, M. Imdadul, *Political Culture, Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh*, UPL, Dhaka, 1996

Manor, James (ed.), *Rethinking Third World Politics*, Longman, London and New York.

Rahaman, A.T. Rafiqur, *Bangladesh Election 2008 and Beyond Reforming Institions and Political Culture for a Sustainable Democracy*, UPL, Dhaka, 2008

Rahman, Masihur, *Democracy in Crisis*, UPL, Dhaka, 2008

Ziring, Lawrence, *Bangladesh from Mujib to Ershad:An Interpretive Study*, Dhaka : UPL, 1992

৩. বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্র

আজকের কাগজ, ১লা জানুয়ারি ১৯৯৬
আজকের কাগজ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
আজকের কাগজ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
আজকের কাগজ, ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই নভেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯০
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে জানুয়ারি, ১৯৯১
দৈনিক ইনকিলাব, ৭ই মার্চ ১৯৯৬
দৈনিক ইনকিলাব, ৯ই মার্চ ১৯৯৬
দৈনিক ইনকিলাব, ৭ই মার্চ ১৯৯৬
দৈনিক ইনকিলাব, ৯ই মার্চ ১৯৯৬
দৈনিক ইনকিলাব, ২০শে মার্চ ১৯৯৬
দৈনিক ইনকিলাব, ২২শে মার্চ ১৯৯৬
দৈনিক ইনকিলাব, ৩১শে মার্চ ১৯৯৬
দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০১
দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০১
দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০১
দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০১
প্রথম আলো, ৬ই জানুয়ারি ২০০৭
প্রথম আলো, ৫ই জানুয়ারি ২০০৮
প্রথম আলো, ৬ই জানুয়ারি ২০০৮
প্রথম আলো, ১৩ই জানুয়ারি ২০০৭
প্রথম আলো, ২রা ডিসেম্বর ২০০৮
প্রথম আলো, ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮
যুগান্তর, ২২শে অক্টোবর ২০০৬
যুগান্তর, ২৮শে অক্টোবর ২০০৬
যুগান্তর, ৩০শে অক্টোবর ২০০৬
সংবাদ, ১লা জানুয়ারি ১৯৯১
সংবাদ, ১০ই জানুয়ারি ১৯৯১
সংবাদ, ১লা মার্চ ১৯৯১
সংবাদ, ২রা মার্চ ১৯৯১
সংবাদ, ১৪ই ডিসেম্বর ২০০৮
সংবাদ, ১৪ই ডিসেম্বর ২০০৮
সংবাদ, ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৮
সংবাদ, ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৮
সংবাদ, ১৪ই ডিসেম্বর ২০০৮
The Daily Star, 2 0ctober 2001

৪. ব্যবহৃত ওয়েবসাইটসমূহ

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ।
নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা
ecs.gov.bd/English/index.p
file:///C:/Users/User/Documents/ElectionResultFact.php.htm
http:// data worldbank.org/indicator/NY.GDP.MK…

ব্যবহৃত অভিসন্দর্ভ

মোঃ এখলাছুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রঃ একটি বিশ্লেষণ*, (এম.ফিল অভিসন্দর্ভ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০
সৈয়দ আতিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম ১৯৯৬ এবং ২০০১ : একটি বিশ্লেষণ*, (পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১

ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধ

Dr. Syed Anwar Husain, Democratization in South Asia: Trials, Tribulations and Triumph?, Paper present at the 14th International Association of Historians of Asia(IAHA) Conference held in Bangkok From 20 through 24 May, 1996.

আবুল বারাকাত, *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত“ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া” শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে রচিত, ঢাকা, ২০১৩